মনোরম বনভূমি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

পিনাকী সরকার
ও
অরুণা সরকারকে

সাহিত্যম্ প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

এখন মধুমাস

সহেলি

দ্বিচারিণী

হানস ও সাদা জাহাজ

কিশোর গল্প সমগ্র

তখন হেমন্তকাল

—তাহলে কে যাবে?

—আমি যেতে পারছি না। কমল বলল। ছুটি সব শেষ।

সুবল তবে তুমি যাও। আনন্দদা চোখ তুলে সুবলের দিকে তাকালেন।

সুবল লাজুক মানুষ। খুব মুখচোরা স্বভাবের মানুষ সুবল। সে কমলের মত মুখের উপর বলতে পারল না—যেতে পারিছ না, কাজের চাপ আমারও কম নেই। একা মানুষ। মা অসুস্থ। কলেজের পরীক্ষা আরম্ভ হতে দেরি নেই। প্রশ্ন-পত্র জমা দিতে হবে। কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। আনন্দদার মুখের দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে থাকল।

—কি, কিছু বলছ না যে?

—কেউ না গেলে একজনকে তো যেতেই হবে। সুবল যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে যাচ্ছে এমন একটা ভাব দেখাতে চাইল।

পাশের ঘরে ইতু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। সে আয়নায় নিজের মুখ দেখছিল। লম্বা মুখ—ডিমের মত আকার মুখে, চোখ দুটো শুধু ড্যাব ড্যাব করছে। ইতু লম্বা। এবং ইতুর চুল কোঁকড়ানো। চোখের নিচে সামান্য ভাঁজ। গালে হাসলে ভাঁজ পড়ে। শরীর পল্কা, দেখলে মনে হয় বড় ঝড়ের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা ইতুর নেই। সামান্য ঝড় উঠলেই যেন কাত হয়ে পড়বে। ইতুকে এজন্য অনেকবার পাত্র-পক্ষ অপছন্দ করেছে। একবার ইতুর হোস্টেল পর্যন্ত পাত্র-পক্ষের লোক ধাওয়া করেছিল—গোপনে খোঁজখবর নিয়ে জানতে চেষ্টা করেছে ইতুর কোন দুরারোগ্য ব্যাধি আছে কি-না।

ইতু যেই শুনল সুবল যাচ্ছে—নিজের মনেই সে হেসে দিল। তাহলে শেষে ইতুকে সুবল ওদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে।

ইতুর বাবা লিখেছে পাত্রের ঠাকুমা আসবে ইতুকে দেখতে। ঠাকুমাই সব। কলকাতায় সবাই থাকে। কেবল ঠাকুমা থাকেন হাজারিবাগ শহরে। ইতুদের বাড়ি হাজারিবাগ রোডে। সুতরাং ইতু বাড়ি গেলে তিনি আসিবেন দেখতে। তাঁর পছন্দ হলে কথা নেই। মাঘেই বিয়ে। এমন একটা সময়ে ইতুর দাদা এবং বৌদি—কে নিয়ে যাবে ইতুকে, কমল যেতে পারে, নির্মল যেতে পারে এবং অন্য অনেক ভক্তজনের অভাব নেই। সুতরাং আনন্দ সুবলকে কৈফিয়তের সুরে বলল, আমিই

যেতাম। কাল পরশু দু-দুটো ফাংশান—তারপর আমি গেলে তোমাদের বৌদি, ছেলেমেয়েরা সব যাবে—এত লটঘট বাপু আমার ভাল লাগে না।

সুবল বলল, কাল ক'টায় রওনা হতে হবে?

—এগারোটায় একটা ট্রেন আছে। শেয়ালদা-পাঠানকোট। তুমি সকাল-সকাল চলে এস। এখানেই বৌদির হাতে রান্না দুটো খেয়ে নেবে।

সুবল এবার উঠে পড়ল। ঘর থেকে সব দেখা যায়। ইতু আয়নায় দেখতে পেল সুবল অন্য ঘরে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে, বোধহয় আয়নায় ইতুকে দেখছে। অথবা ইতুর প্রতিবিম্ব দেখে এখন ইতু কি ভাবতে পারে, এই যে এক কথায় রাজী হয়ে যাওয়া—সব জরুরী কাজ ফেলে এক কথায় নিয়ে যাওয়া হাজারিবাগ রোডে—সব কেমন বেহায়া মানুষের মত মনে হয়—ইতু আড়চোখে মানুষটাকে দেখে চুলের গোড়া সাফ করার ভান করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল।

সুবল এদিকে এল না।—বৌদি, বৌদি সে চৌকাঠে পা দিয়ে ডাকতে থাকল। সুবলের খুব চিৎকার চেঁচামেচি করে কথা বলার অভ্যাস নয়। তবু মুখচোরা মানুষ সুবল বৌদির সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি করে কথা বলতে ভালবাসে। সে বৌদির সাড়া না পেয়ে ছোট্ট মেয়ে টুকুনকে দুহাতে লুফে নিল। এবং কাতুকুতু দিয়ে হাসাতে লাগল। ইতু ঘর থেকে সব দেখতে পাচ্ছে। সুবল দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, বৌদি কোথায়?

—কি জানি কোথায়? বলে বোধহয় ভাবল খুব রূঢ় শোনাল কথাটা, সামান্য সংশোধন করে বলল, দেখুন না, রান্নাঘরে থাকতে পারে। ইতুর এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব সুবলের কেমন অসহ্য লাগে। বিশেষ করে ইদানিং যেন ওর এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাবটা বেড়ে গেছে। বড়লোকের বউ হবে—স্বপ্ন দেখছে বুঝি ইতু। আমি এক সামান্য মানুষ—তার কিবা স্বপ্ন, তার কিবা আশা—সুতরাং ইতুর এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সে আদৌ গায়ে মাখল না। অথচ প্রাণের ভিতরে ছোট্ট এক মৌমাছির ঘর আছে, সেখানে সামান্য ঢিল পড়লেই মৌমাছিরা গুঞ্জন করতে থাকে। ইতু কিছুদিন আগেও যখন কথা বলত, গল্প করত, তখন মনেই হত না ইতু অন্য মানুষের স্বপ্ন দেখতে পারে। দু-পা ছড়িয়ে ঘাসের ওপর বসে ইতু কতদিন কতভাবে সুবলের পাশে বসে হা হা করে হেসে উঠেছে।

একবার দীঘা যাবার পথে ইতুর কি জ্বর। সুবল ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আনন্দদা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সে একা ইতুকে নিয়ে ফিরে এসেছিল এবং দিন নেই রাত নেই সেবা-শুশ্রূষায় ইতুকে ভাল করে তুলেছে। যখন আনন্দদা এবং বৌদি ফিরে এলেন তখন ইতু সুস্থ এবং সবল যুবতীর মত স্যুটকেশ ট্রাঙ্ক ছুটে ছুটে নিচে থেকে দোতলায় নিয়ে তুলেছিল। বৌদি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, সুবল;

তুমি ওকে এত তাড়াতাড়ি ভাল করে তুললে কি করে!

বৌদি মাঝে মাঝে ইতুকে নিয়ে সুবলের সঙ্গে ঠাট্টা করার লোভে বলতেন, সুবল তুমি আস না কেন! তুমি না এলে ইতু আমাদের মুখ গোমড়া করে রাখে। যেন তারপর বলার ইচ্ছে—তুমি এলে ইতু, দরজা-জানালা খুলে দিলে সহসা ভেতরের অন্ধকার যেমন সরে যায়, তুমি এলে ইতুর ভেতরের সব অন্ধকার তেমনি দূর হয়ে যায়। তখন ইতু ফুরফুরে বাতাসে পাখি হয়ে উড়তে চায় শুধু। অথবা এই ইতু এক রুগ্ন মেয়ে যার কেবল দুই চোখ সম্বল এবং যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়া অতিক্রম করার জন্য বার দুই চেষ্টা করে অকৃতকার্য, যার এখন একমাত্র বিলাস স্বপ্ন দেখা—সেই যুবতী তুমি এলে ভোরের নরম রোদের মত নির্মল হয়ে ওঠে।

সুবল দরজা থেকে চলে যাচ্ছিল। ইতু আয়নার দিকে মুখ করে চিরুনি দিয়ে সেই চুলের গোড়া সাফ করার মত ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে সুবলের সব লক্ষ্য রাখছে। সে ভেবেছিল সুবল এখন এ-ঘরে ঢুকে ওর পাশে বসবে এবং কথা বলবে। কিন্তু দরজা থেকে সরে এল না বলে সে মুখ না ঘুরিয়েই বলল, সুবলদা তবে তুমিই শেষ পর্যন্ত যাচ্ছ?

—দাদা আমাকে যেতে বললেন।

—আপনি যাবার জন্য পা বাড়িয়ে রেখেছিলেন।

—বাড়িয়ে রেখেছিলাম বেশ করেছি।

এবার ঠোঁট উল্টে দিল ইতু। বলল, আপনি গেলেই হয়েছে!

সুবলের বলার ইচ্ছে হল, কেন, আমি তোমাকে কোথাও কি পৌঁছে দিতে পারি না! আমার ওপর এত অবিশ্বাস কেন তোমার? কিন্তু মুখে সে অন্য কথা বলল, তোমার কোন অসুবিধা হবে না ইতু। বলে, সে দরজা থেকে এবার যথার্থই চলে যাবার জন্য পা বাড়াতে চাইলে ইতু তেমনি আয়নার দিকে মুখ রেখে বলল, খুব সকাল সকাল আসবেন। আপনার জন্য আবার ট্রেনটা ফেল না করি।

পাত্র পক্ষের বৃদ্ধা ঠাকুমা—তাঁর কলকাতা পর্যন্ত ছুটে আসা কষ্টকর, সুতরাং কন্যাপক্ষ হাজারিবাগ রোডে চলে যাচ্ছে। ট্রেন যেন ফেল না হয়, সুবল হাঁটতে হাঁটতে কথাটা মনে করতে পারল। ট্রেন ফেল হলে বুঝি ইতুর স্বপ্ন ভেঙে যাবে। বোধহয় ইতু এখন অন্য স্বপ্ন দেখতে শিখে গেছে। স্বপ্নে সেই মানুষের মুখ, বরের মুখ এবং ইতুর এই স্বপ্ন বিফলে গেলে তার জন্য দায়ী হবে সুবল। অথচ সুবল এক সামান্য মানুষ এবং লাজুক—প্রাণে যার এই যুবতীর জন্য কোমল এক ভালবাসা নিরন্তর ঘুরে বেড়ায়—এই যুবতী বুঝি কোনদিন তা টের পায় না। সুতরাং ট্রেন ফেল হলে সে দায়ী হবে এই ভেবে খুব সকাল সকাল সে উঠে

পড়ল, বাড়ির বাজার করে রাখল দুদিনের। টিউশনি থেকে ছুটি নিল। কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে ন'টা না বাজতেই সে ইতুদের বাড়ি হাজির হল।

ইতু স্নান করার জন্য বাথরুমে যাচ্ছে। ঢোকার মুখে ইতু দরজায় সুবলকে দেখতে পেল। মুখে ইতু ব্রাশ রেখে হাতে ব্লাউজ, কাপড়, ব্রেসিয়ার আর চুলে তার সেই গন্ধটা—কি একটা তেল মাখে ইতু যার গন্ধ বড় রহস্যজনক—কতদিন সুবল বলেছে, ইতু তুমি কি তেল মাখ মাথায়? তোমার তেলের গন্ধটা তুমি যখন কাছে থাক না, অনেক দূরে থাক, অথবা যখন তোমাকে আমি অনেক দিন দেখি না তখনও চুপচাপ চোখ বুঝলে, তোমার মুখ-চোখ দেখতে পাই, তোমার তেলের গন্ধটা নাকের ওপর লেগে থাকে, তুমি তখন আমার বড় কাছের মানুষ শুধু এই মনে হয়। তোমার এই তেলের গন্ধ ইচ্ছা করলেই টের পাই, তখন আমি আমার বালিশে মুখ গুঁজে দিই, গন্ধটা বুঝি সব সময় নাকে লেগে থাকে। তোমার তেলের নাম কি?

ইতু হাসত। বলত, তেলের নাম ভালবাসা।

—এমন তেল তো বাজারে নেই! এমন তেলের নাম তো বাজারে আছে বলে জানি না।

—মাথায় তেল না মাখলে নাম জানবেন কি করে?

তেলের নাম ভালবাসা। এ আবার কেমন নাম। সে মনে করার চেষ্টা করল—এমন নামের তেল বাজারে আছে কিনা, সে বিজ্ঞাপনে তেলের নাম থাকলেই উপুড় হয়ে দেখত ভালবাসা নামে কোন তেল আছে কিনা। সে প্রায় কোন অভিযানকারী মানুষের মত অনুসন্ধানে ছিল—কিন্তু নামটা সে আবিষ্কার করতে পারেনি। সে রাগে-দুঃখে বলেছিল, তুমি সত্য কথা বলনি ইতু।

ইতু বলেছিল, সংসারে কেউ সত্য কথা বলে না।

—কেউ না বলুক, তোমার বলতে আপত্তি কি?

—সবাই না বললে আমার বলতে বয়ে গেছে।

দরজার সামনে ইতুকে দেখে এবং পরিচিত তেলের গন্ধটা পেয়ে সে সব কথা একে-একে মনে পড়ছিল। দরজা থেকে সুবল নড়ছে না। ইতু দরজাটা বন্ধ করে দেবে, সুবল ভিতরে ঢুকে পড়লে সদর বন্ধ করে দিতে হবে সেই আশায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সুবল বুঝি ইতুর চুলের গন্ধটা নিচ্ছে অথবা এই সাজে ইতুকে কেমন দেখায়, দেখতে বড় মনোরম লাগছে—সে বুঝি নড়তে পারছিল না। যেন অবসর বুঝে ইতুর সবটা দেখে নেবার চেষ্টা করছে।

—কী হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন! ভেতরে আসুন, দরজা বন্ধ করব।

সে তাড়াতাড়ি উঠে এল ভেতরে। ইতুর মুখে সে সামান্য আবেগ পর্যন্ত

দেখতে পেল না। ইতুর অনেক সম্বন্ধ এসেছে, ভেঙেও গেছে, সুবল ভেবেছিল এও শেষ পর্যন্ত তাই হবে। কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে—পাত্র-পক্ষ ধনী এবং ইতুর কোমল চোখ দেখে সেই ধনী মানুষটি—বয়স আর কত হবে, সুবলেরই সমবয়সী, খুব চালাক-চতুর যুবক, বহু শ্রমিকের সে মা-বাপ এবং বিশেষ করে আনন্দদা এত বড় শিল্পী মানুষ, তার পরিচিতিরও একটা বিশেষ করে দাম আছে এক্ষেত্রে—সব মিলে-মিশে কেমন এবার যেন সম্বন্ধটা টিকে যাবে। যত টিকে যাবে মনে হচ্ছে তত সুবলের প্রতি ইতু ক্ষেপে যাচ্ছে। দেখলেই যেন হাত-পা জ্বালা করছে ইতুর। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। সে সুবলকে দেখিয়ে প্রফুল্ল থাকছে। যেন বলার ইচ্ছে—তুমি বাপু আর বাধ সেধো না। অথবা মনে হয় দেখে এখন ইতুর হাতে আর সময় নেই। ইতুকে আজ বড় বেশি প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। ইতু এবার গান গাইবে, বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের জল ছেড়ে ইতু রা-রা করে গান গাইবে। সে সুতরাং গান না শোনার জন্য অথবা এও হতে পারে ইতুর এই উচ্ছল ভাব ওর পক্ষে পীড়াদায়ক। ইতু ইচ্ছে করে ওকে কষ্ট দিতে ভালবাসে বিশেষ করে বাড়িতে ঢোকার মুখে এমন মুখ করে ধমকে উঠল যে সে যেন ইতুর কম বয়সী বন্ধু অথবা ইতুর ছোটভাই থাকলে যেমন ব্যবহার করা চলত প্রায় তেমন ব্যবহার। সে আর ইতুকে দেখল না। সে সোজা রান্নাঘরের দিকে ঢুকে বলল, বৌদি, একগ্লাস জল দিন।

—এখন জল খেলে ভাত খাবে কি? একবারে খেতে বসে যাও।

—ইতুকে তো দেখলাম এইমাত্র স্নান করতে যাচ্ছে।

—ওর খেতে স্নান করতে বেশি সময় লাগে না। বরং তোমার দেরি, তুমি বড় খুঁটে খুঁটে খাও। তুমি তাড়াতাড়ি খেতে পার না। দেরি করলে তুমি পেট ভরে খেতে পারবে না। বলে বৌদি টেবিলে জল এবং থালা নিয়ে এলেন।

বস্তুত এই স্বভাব সুবলের। তাড়াতাড়ি সে কিছু করতে পারে না। সব ব্যাপারেই ভেবে-চিন্তে কাজ করার মানুষ সুবল। সুবলের খাওয়া দেখলেই টের পাওয়া যায় সে কি স্বভাবের মানুষ। বড় খুঁটে খুঁটে খাবার স্বভাব। ধীর স্থির, বেছে বেছে, খাবে কি খাবে না এমন করে খায়। অথচ খাবার লোভ ষোলআনা। একটু সুস্বাদু খাবার হলে গলা পর্যন্ত খাবে। বৌদির পর্যন্ত এমন মানুষকে জানতে বাকি নেই। তিনি সেজন্য ওকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিতে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারেন। ভাত ডাল থালায় এবং বাটিতে রাখতে রাখতে এমন একটা ভাব দেখালেন তিনি।

ঘরে টুকুন নেই। সংসারের এই ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব সুবলের। সুবলের, ছোট্ট মেয়েটির সাদা ফ্রকের ভিতর কোমল সতেজ মুখ, ঠিক

ফুলের মত ফুটে থাকা মুখ কোলে তুলে আপ্রাণ বিভোর হয়ে থাকার ইচ্ছা। সে টুকুনকে খুঁজল। টুকুন বাগানে একটা ঝুমকোলতার নিচে বসে আপন মনে গাছের সঙ্গে অথবা পাখির সঙ্গে গল্প করছে এখন। সুবল বাগানের ভিতর ঢুকে বলল, টুকুন, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

টুকুন বলল, গাছে একটা পাখি দ্যাখো।

সুবল গাছে একটা পাখি খুঁজল। সে একটা পাখি, দুটো পাখি দেখতে পেল। তারপর ডালে ডালে অনেক পাখি দেখতে পেল। ফুল-ফলের গাছ এই বাগানে অনেক। টুকুন তার ছোট্ট বাগানের ভিতর নিজের মনে বিভোর হয়ে আছে। সুবল পাশে বসে বলল, এখন কি করবে টুকুন?

—রান্না করব।

—রান্না হলে আমাকে খেতে দেবে?

—হোক, তখন দেব।

—কি রান্না করবে?

—অনেক। ডাল রান্না করছি, ভাত রান্না করছি।

কিছু খেলনার হাতা-খুন্তি এবং হাড়ি-উনুন, ছোট্ট একটা ঝুমকোলতার নিচে। গাছটা এত ছোট্ট যে মনে হয় এ-গাছ টুকুনের খেলনার গাছ। ছাতার মত ওর শাখা-প্রশাখায় নরম সবুজ পাতা। টুকুন ছায়ায় বসে রান্না করবার সামগ্রী যোগাড় করছে। কিছু বেলফুল সংগ্রহ করছে। টুকুন রান্না করবে, পুজো করবে। টুকুন নাচবে। টুকুন আপন মনে খেলবে এবং গান করবে। টুকুনের এই জগৎ সুবলের বড় ভাল লাগল। সুবল চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল টুকুনের পাশে এবং টুকুনের নিবিষ্ট মনে খেলা দেখতে দেখতে কেমন ইতুর সব অবহেলার কথা ভুলে গেল।

তখন ইতু ডাকল, সুবলদা, আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে। তাড়াতাড়ি খাবেন। সময় হাতে বেশি নেই কিন্তু।

সুবল উঠে পড়ল।—আর একদিন এসে খাব টুকুন। তোমার রান্না হোক, পুজো হোক, তোমার পুজোর প্রসাদ আমার জন্য রেখে দেবে, কেমন? ছেলেমানুষের মত ঘাড় কাত করে কথা বলল সুবল। সুবল সুতরাং আর দেরি করল না। সে তাড়াতাড়ি খাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বিষম খেল। বৌদি ছুটে এলেন কিন্তু ইতু ছুটে এল না। বৌদি বললেন, জল খাও। জল খেলেও বুকের কাছের কষ্টটা কমছিল না। সুবল ভিতরে ভিতরে বড় কষ্ট পাচ্ছিল।

—তুই সবটাতে এত তাড়াতাড়ি করিস ইতু!

—আমি কোথায় আবার তাড়াতাড়ি করলাম।

—বাব্বা! দেখছি তোদেরই বিয়ে হবে। কি আদেখলেপনা করছিস না! যেন আর কেউ যায় না ট্রেনে। পাছে ট্রেন ফেল হবে ভেবে ভোর থেকেই তুই সুবলকে তাড়া করছিস।

—হয়েছে, কথা বল না বৌদি। এমন একটা লোককে সঙ্গে দিয়ে খুব তামাশা দেখছ। সারাটা পথ তো আমাকে আগলে নিতে হবে।

—কি বলছে শুনছ? বৌদি সুবলকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বললেন।

—বলতে দিন। ওটা ওর স্বভাব বৌদি। কিছুতেই ওর মন পাওয়া যায় না।

ইতু চুলে ক্লিপ আঁটছিল। আয়নায় মুখ দেখছিল। সুবলদা খেতে খেতে কি সব বলছেন, সে শুনতে পাচ্ছে না। শুনতে পেলে ইতু কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিত। সে সাজ-গোজ করে থাকল। কেবল শাড়িটা পাল্টাল না। টেবিলে খেতে বসলে সুবল মুখ তুলে তাকাল! দেখল ইতু খোঁপা টেনে বেঁধেছে। পিঠের দিকটা ব্লাউজের কাটিংয়ের জন্য অর্ধেকটা ফাঁকা। মসৃণ পিঠ ওর চক্‌চক করছে। সিল্কের হলুদ রঙ ব্লাউজে। ইতুকে হলুদ রঙে বড় মানায়। সে দইটুকু চুমুক দেবার সময় চোখ ভেড়চা করল।

তারপর ইতু খেতে খেতে মুখ তুলে তাকাল।

সুবল বলল, একেবারে রাজকন্যার মত দেখাচ্ছে।

—আপনাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না। লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে উঠে ট্যাক্সি ডেকে আনুন।

ট্যাক্সি ডাকার কথা উঠতেই সে পেটে হাত দিয়ে বসল। —ও বড্ড বেশি খাওয়া হয়ে গেছে! বৌদি এত করে খাওয়ান!—বলে সে যেন খুব কষ্টে উঠে দাঁড়াল। খেয়ে উঠে হাত চাটার স্বভাব সুবলের—সে দুবার হাত চাটল, যেন সে নড়তে পারছে না। ইতু লক্ষ্য করে দেখছিল এবং রেগে যাচ্ছিল। এবার ইতু সহ্য করতে না পেরে ডাকল, বৌদি, দেখেছ কাণ্ড!

—সুবল তুমি আবার কি করলে?

—কিচ্ছু করিনি বৌদি।

—কিচ্ছু করেন নি! বলে ইতু ফুঁসে উঠল। খেয়ে উঠে পেটে হাত দিচ্ছেন না! বলছেন না, খুব খাওয়া হয়ে গেছে!

—তাতে কি হয়েছে? একটু বেশি খেয়েছি বলে কি অন্যায় করে ফেলেছি? আমার পেটে আমি হাত দেব তাতেও তোমার রাগ?

—যা দেখছি, সারাটা পথ আপনি জ্বালাবেন সুবলদা। এত খেলেন কেন? রাস্তায় যদি কোন হাঙ্গামা বাধান তবে বলে রাখছি আপনাকে ফেলে চলে যাব। বলে সে বৌদিকে দেখল না, সুবলকে দেখল না। নিজের মত ঝোল-ভাত খেতে

থাকল। তারপর কি মনে পড়তেই সুবলের দিকে মুখ তুলে তাকাল। এবং বলল, সেবারের মত কাণ্ড করলে বলছি সুবলদা, আমি কিছু করতে পারব না।

সেবারের মত বলতেই সুবল একটু টেঁসে গেল। বলল, আরে না না, তেমন বেশি আমি খাইনি।

কবে একবার সুবল, ইতু এবং অন্য দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবীরা মুর্শিদাবাদ গিয়েছিল। ট্রেন ধরতে বিলম্ব। সুবল সেবারেও খেয়ে উঠে পেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল বড্ড বেশি খাওয়া হয়ে গেছে। তারপর ট্যাক্সিতে উঠে পেট-ব্যথা, ট্রেনে উঠে বমি। ইতুকে দুহাতে সেই বমি কাচতে হয়েছিল। ইতু বুঝি ভয়ে মুখ গোমড়া করে খাচ্ছে। বুঝি সেই ট্রেনের দৃশ্য ওর মনে ভেসে উঠেছে।

ইতু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল।

সুবলের ভাগ্য ভাল, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতেই ট্যাক্সি পেয়েছে। কলকাতার যা স্বভাব। একটু তাড়াতাড়ি রওনা না হলে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গেলে আর রক্ষা থাকবে না। সারাটা পথ তবে ইতু গালাগালি করে ওর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে। সুতরাং ট্যাক্সি মিলে যেতে আর যেন কোন ভয় থাকল না। এবারে সময়মত, সময়মত কেন সময়ের অনেক আগেই স্টেশনে পৌঁছনো যাবে।

ট্যাক্সি নিয়ে ফিরলে সে দেখতে পেল বৌদি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। সুবল ছোট দুটো লেদার অ্যাটাচি তুলে নিল হাতে এবং ট্যাক্সিতে রেখে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকল।

টুকুন তখন ছুটে এসেছে। সে সুবলকাকাকে খেতে বলল। সুবল ভয়ে ভয়ে চোখে ইশারা করে ইতুকে দেখাল—আজ আর না টুকুন। সে টুকুনকে আদর করল। বলল, দেখছ না তোমার পিসি কেমন মুখ গোমড়া করে রেখেছে। একটু বেশি খেলেই গাল ফুলে থাকে। তোমার রান্না খেলে আর রক্ষা থাকবে না।

বৌদি বললেন, যাবার মুখে ঝগড়া! সারাটা পথ তোমরা যাবে কি করে!

ইতু বলল, তুমি তো বল বৌদি আমিই শুধু সুবলদার পিছনে লাগি।

—সুবল! বৌদি ডাকলেন। সুবল ভিতরে ঢুকলে বললেন, শোন তোমার দাদা বলে গেছেন দেখানো হয়ে গেলে সঙ্গে নিয়ে আসবে। ওর বড় স্বভাব খারাপ। বাড়ি গেলে কিছুতেই ফিরতে চায় না।

—আরে না না! আমি সঙ্গেই নিয়ে আসব। আপনি কিছু ভাববেন না।

ইতু শুনে বলল, আসতে আমার বয়ে গেছে। আমি কিছুদিন মা-র কাছে থেকে আসব বৌদি।

—তোমার পরীক্ষা সামনে।

—পরীক্ষা দিয়ে আর কি হবে। বিয়েও হবে, পরীক্ষাও দেব—দুটো একসঙ্গে

হয় না বৌদি। বলে ইতু ব্যাগ থেকে দুটো সুপুরীর কুচি মুখে ফেলে দিল। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে নিজেকে ফের আয়নায় দেখে নিল একবার। টেনে টেনে পেছনের শাড়ি একটু নিচে নামিয়ে দিল। সায়া বের হয়েছিল পায়ের পাতার কাছে, সেটা যাতে দেখা না যায় তার জন্য শাড়ি আর একটু নামিয়ে দিল। মুখের ওপর সামান্য পাউডার এবং কিছু গন্ধযুক্ত সাবানের ফেনার মত ক্রিম ঘষে দাঁড়িয়ে থাকল—নিজেকে দেখে যেন ইতু তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

ইতু খুব লম্বা নয়, বেঁটেও নয়। ইতুর রঙ দুধে-আলতায় নয়, আবার শ্যামলা রঙ বললে মন্দ কথা বলার মত শোনাবে। কি যে রঙ ইতুর শরীরে, বোঝা দায়। ছেলেবেলাতে ইতুর রঙ শ্যামলা বললে মন্দ কথার মত শোনাত না। কলকাতার জলবায়ুতে কি যেন লাবণ্য আছে, যে জলে ইতুর রঙ শ্যামলা থাকল না—একটা উজ্জ্বল চাকচিক্যময় অথবা লাবণ্য বলা চলে ইতুর রঙে লেপ্টে আছে। সুতরাং ইতুকে ট্যাক্সিতে ওঠার আগে বড় সুন্দর দেখাল। যেন ফুলের সৌরভ নিয়ে ইতু সবসময় প্রজাপতি সেজে আছে। পাশে এক পদ্মফুল। সৌরভ মাখানোর জন্য প্রজাপতি পদ্মফুলে উড়ে গিয়ে বসল।

ট্যাক্সি থেকে মুখ বাড়িয়ে ইতু বলল, কোন ক্লাসের টিকিট কাটব বৌদি?

—ভিড় থাকলে ফার্স্ট ক্লাসে চলে যাবে।

সুবল বলল, আরে বৌদি আপনি যে কি না। শেয়ালদা-পাঠানকোটে একেবারেই ভিড় থাকে না।

—আপনি রোজই শেয়ালদা-পাঠানকোটে হাজারিবাগে যান—ইতু বিদ্রূপ করতে চাইল।

—না গেলে বুঝি জানা যায় না?

—জানা যাবে না কেন? ইচ্ছা করলে সবই জানা যায়। বলতেই ট্যাক্সিটা হুস করে ছেড়ে দিল।

সুবল ঠিকঠাক হয়ে বসল। বলল, তবে?

—তবে আবার কি, তবে সব গাড়ি-ঘোড়া।

—গাড়ি-ঘোড়া মানে?

—ছেলেবেলাতে পড়েননি, পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি।

—পড়েছি।

—ছেলেবেলার গল্প মনে করুন।

সুবল বুঝতে পারল না ইতু ছেলেবেলার কথা মনে করতে বলল কেন। ছেলেবেলাতে সে ছোট্ট এক নদী, নদীর নাম বালুনদী, সোনার মত বালির রঙ সে নদীর, নদীর তীরে পুরনো এক প্রাচীন মঠ—ওর পূর্ব পুরুষের ওপর সেই মঠ

ছিল। মঠের চূড়ায় হাজার হাজার টিয়াপাখি উড়ে এসে বসত, ডিম পাড়ত। এবং ভোরবেলাতে সেই টিয়াপাখিরা নদী অতিক্রম করে কোথায় এক বেতফলের জঙ্গল রয়েছে তার উদ্দেশ্যে উড়ে যেত। সে সেই নদীর পারে মঠের চূড়ায় এখন হাজার হাজার নীল রঙের পাখি উড়তে দেখছে।

ইতু একপাশে শহরের ট্রাম-বাস-লোকজন দেখতে দেখতে বলল, কি ভাবছেন?

—ছেলেবেলাকার কোন গল্পই মনে করতে পারছি না ইতু। শুধু মনে পড়ছে আমাদের একটা মঠ ছিল। মঠটা এত পুরনো ছিল অথবা কি ছিল মঠের ভিতর বলতে পারব না—হাজার পাখি হবে প্রায়, টিয়াপাখি, মঠের খোঁদলে এসে রাত কাটাত। ডিম পাড়ত। আমাদের পেয়াদার নাম ছিল রামসুন্দর। সে একবার একটা মঠ থেকে টিয়াপাখির ছানা ধরে এনেছিল। রামসুন্দর আমাকে দিয়েছিল পোষার জন্য। আমি ওকে খেতে দিতাম। আমার বাবা পাখিটা দেখে বলেছিলেন, সুবল তুমি ইচ্ছা করলে পাখিটাকে কথা শেখাতে পার।

—পাখিকে কথা শেখাতে পারেন আপনি?

—আমাদের পাখিটা কথা শিখেছিল।

—সে নিশ্চয়ই আপনার গুণে নয়?

—তবে কার গুণে? পাখি আমার। খাঁচা আমার। পাখিটা নিশ্চয়ই বাবার নয়?

—আপনার পাখিকে নিশ্চয়ই অন্য কেউ কথা শিখিয়েছে। আমরা মানুষ দেখলে চিনতে পারি সুবলদা—কে কোন্ পাখিকে কথা শেখাতে পারে—মানুষ দেখলেই চেনা যায়।

—তুমি তবে মানুষ দেখলেই চিনতে পার।

—তা পারি।

সুবল কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওরা এবার গাড়ি-ঘোড়া পার হয়ে গেল। ওরা এবার জল-কল পার হয়ে গেল। গাড়ির ভিতরে সুবল এবং ইতু—দুদিকে এখন তাকিয়ে আছে: যেন ওরা পরস্পর কেউ কাউকে চেনে না। ওরা ট্যাক্সির দুপাশের জানলাতে দুজনে মুখ রেখেছে। দোকান, শো-কেস, এবং বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে একসময় স্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা। পরস্পর আর কিছু না বলে গুম হয়ে থাকল।

ইতুর লেদার স্যুটকেসটা বেশ বড়। যেন কত পরিশ্রম করে সে স্যুটকেসটা নিয়ে এই স্টেশনে এসে পৌঁছেছে। একটু আয়াস করে বসা যাক। সে তার লেদার স্যুটকেসটার ওপর বসে দু'পা ছড়িয়ে দিল। সে শুধু লক্ষ্য রাখছে সুবলদা কি

করছে। ঘড়িতে সময় দেখল। গাড়ি প্ল্যাটফরমে দিতে প্রায় এখনও পনেরো মিনিট বাকি। এখন সবকিছুই তাড়াতাড়ি করা দরকার। কোথায় প্রথম শ্রেণীর টিকিট পাবার কথা অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর, ইতু জানে ভাল। অথচ সুবলদা ইতুকে কিছু না বলে এনকোয়ারিতে চলে গেল। মনে মনে সুবলদার অভিমান দেখে ইতু হেসে বাঁচছে না। সে যেন ভিতরে ভিতরে আনন্দই পাচ্ছিল। চোখ-মুখ সজাগ রেখে ইতু সব লক্ষ্য রাখছে। যা মানুষ, হয়তো টিকিট কাটতে গিয়েই হারিয়ে যাবে। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকতে পারল না। এনকোয়ারি থেকে সুবলদা উল্টো দিকে কোথায় যাচ্ছে ! সে ভেবেছিল, সুবলদা কথা না বললে সে আর কথা বলবে না, কিন্তু মানুষটা যাচ্ছে কোথায়? সে চিৎকার করে ডাকল, সুবলদা! সুবল মুখ ফেরাল। এবং ছুটে গিয়ে বলল, অত চিৎকার করে ডাকছ কেন?

সুবলদা খুবই রেগে গেছে ভেবে বলল, কাউন্টার ওদিকে নয়। আপনি ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? বলে ইতু আর বসে থাকতে পারল না। স্যুটকেসটা হাতে নেবার চেষ্টা করলে সুবল বলল, হয়েছে। দাও দিখি। ফিরে গিয়ে তো আবার বৌদিকে নয় দাদাকে নালিশ দেবে। বলে সে স্যুটকেসটা টেনে নিজের হাতে নিলে ইতু বলল, সুবলদা, নালিশ নালিশ করেন, আমি কবে নালিশ দিয়েছি বলুন তো?

সুবল হাঁটতে হাঁটতে বলল, দাওনি, বাকি রেখেছ কি! বলে সে উত্তর দেবার অবকাশ দিল না ইতুকে। কাউন্টারের দিকে হন হন করে হেঁটে গেল।

একটা ট্রেন এসে গেছে। স্টেশনটা আর ফাঁকা ফাঁকা থাকল না। লোক এখন গিজ গিজ করছে। এর ভিতর ইতু কোথায় যেন মিশে গেল। সুবল ইতু কোথায় গেল দেখল না। সে কাউন্টার থেকে দুটো টিকিট কেটে কাউন্টারের এক পাশে দাঁড়িয়ে ইতুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

ট্রেন ছাড়বার কথা এগারোটায়। এখন বাজে দশটা ত্রিশ। কোথায় ইতু? ইতু কি সময় বুঝে লুকোচুরি খেলছে এই ভিড়ের ভিতর! সে ভিড়ের ভিতর ইতুর মুখ আবিষ্কারের জন্য কাউন্টার থেকে একটু সরে এল। প্ল্যাটফরমে গাড়ি দিয়ে দিয়েছে। এখন যত সত্বর ভিতরে ঢোকা যাবে তত ভাল জায়গা নিতে পারবে ওরা। প্রথম শ্রেণীর টিকিট, ভিড়ের আশঙ্কা নেই, তবু কি জানি—কতদূরে যেতে হবে, সময় হাতে নিয়ে ঢুকে পড়াই ভাল। সে একটু মন্দ কথা বলেছে, মেয়েদের কতরকমের অভিমান, সুবলের প্রায় ভয় ধরে গেল। সারাটা পথ এই নিয়ে না ইতু মান-অভিমান করে চুপচাপ বসে থাকে। সেই সকাল থেকে ইতু ওর পিছনে লেগেছে। যাচ্ছ বাপু তুমি দোলায় চড়ে, বর আনতে যাচ্ছ, আমি তো বাপু সামান্য

যুবক, আমাকে তোমায় কিছুতেই মনে ধরে না, যেখানে যতবার তোমাকে নিয়ে যাতায়াত করেছি, ততবার তুমি আমাকে ছোট করেছ। যেন তুমিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছ। তখনই মনে হল কাউণ্টারের ও-পাশটায় ইতু দাঁড়িয়ে আছে।

—দেখ তো, দেরি করে ফেললে!

—দেরি কোথায় দেখলেন আবার। এখনও তো পঁচিশ মিনিট সময় হাতে।

—তাড়াতাড়ি না গেলে পছন্দমত জায়গা পাওয়া যাবে না।

—অত পছন্দমত জায়গা দিয়ে কি হবে?

—কিচ্ছু হবে না।

সুবল দাঁড়াল না। সে সোজা প্ল্যাটফরমে ঢুকে পড়ল। ইতু পিছনে পিছনে আসছে। যেন ইতু মজা করছে, অথবা ইতুর চলনে-বলনে এক হালকা মেজাজ। সে উড়ে উড়ে বেড়াতে চাইছে।

—আরে তুমি!

সুবল প্ল্যাটফরমে থমকে দাঁড়াল।

—কি চিনতে পারছ না?

সুবল আমতা আমতা করতে থাকল।

—আমি অবিনাশ।

—তুমি অবিনাশ! অঃ! বল কেমন আছ?

—মা মা! সে চিৎকার করে এক প্রৌঢ়াকে ডাকল।—দেখো এসে। এস না।

একটু দূরে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। ছেলের এমন উচ্ছ্বাসে তিনি প্রথমে কেমন হকচকিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, কি হয়েছে?

—এস না!

সুবল বলল, তোমার মা? তাঁকে আর এখন চেনা যায় না।

কাছে এলে অবিনাশ তার মাকে বলল, চিনতে পারছ?

তিনি চিনতে পেরেও কেমন অবিশ্বাসের মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

—আমাদের বড়বাবুর ছেলে সুবল।

—বড়বাবুর ছেলে! তুমি কোথায় যাচ্ছ সুবল, তুমি আমাদের চিনতে পারছ তো?

সুবল ঘাড় নাড়ল।—আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?

—আমরা হাজারিবাগে যাব।

—আমরা যাচ্ছি হাজারিবাগ রোডে।

—আরে তবে তো একই সঙ্গে যাওয়া যাবে।

—তা যাবে।

—তোমরা মানে! তোমার সঙ্গে আর কে আছেন?

—আমার সঙ্গে ইতু আছে।

—ইতু, সে আবার কে! তোমার বোনেদের নাম তো ইলু বিলু।

সুবলের বলার ইচ্ছা ছিল, ইতু আমার সব অবিনাশ। বলতে পারত, তবে তার আমি সব নয়। তাকে নিয়ে যাচ্ছি হাজারিবাগ রোডে। আমি তার এখন অভিভাবক বলতে পার। কিন্তু সে অন্য কথা বলল। বলল, ইতু আমার আত্মীয়া। ওদের বাড়িতে আমি বেড়াতে যাচ্ছি। একটু থেমে বলল, হাজারিবাগে তোমাদের কে আছেন?

—মামারা সেখানে বাড়ি করেছেন।

কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে সুবল ঘড়ি দেখল। অবিনাশ সুবলের ঘড়ি দেখা দেখে মাকে বলল, চল, তাড়াতাড়ি উঠে বসা যাক।

সুবল ভাবল, এই অবিনাশ তার গ্রামের ছেলে। সমবয়সী এবং ওরা একই সঙ্গে স্কুলে একসঙ্গে পড়ত। ওর বাবা ওদের ইছাপুরার কাছারি বাড়ির নায়েব ছিল, অনেক ছোট বয়সের এসব কথা।

পূজার সময় প্রতিমা নিরঞ্জনের মত সুবলের মায়ের মুখ দেখতে। সংসারে তখন এত জাঁকজমক ছিল, এত বেশি উদ্দীপনা ছিল যে ভাবলে সুবল কেমন বিস্মিত হয়। এক যুগের বিনিময়ে ওরা কোথা থেকে কোথায় নেমে এল। সে সিঁড়িতে পা দেবার সময় মনে মনে বলল, ইতু আমাদের বড় একটা কালো রঙের ঘোড়া ছিল, বাবা নদীর পাড়ে পাড়ে সেই ঘোড়া ছুটিয়ে—কি তার বিত্ত-বৈভব, কি তার আভিজাত্য এবং অশ্বের খুরের মত চক্‌চকে সব বিলাস সামগ্রী—ইতুকে বললে এখন আর হয়তো তা বিশ্বাসই করবে না।

সে উঠে দেখল কামরা একেবারে ফাঁকা। সে উঁকি দিল বাইরে। অবিনাশ এবং তার মা আর সঙ্গে এক সুন্দরী, প্রায় অবিনাশের মত লম্বা, সে এতক্ষণ কোথায় ছিল, এমন যুবতী যেন প্রায় লাখে এক, সে উঁকি দিলে ইতু হাত ধরে টানল, কি দেখছেন এত। যেন একেবারে গিলে ফেলবেন!

—কি দেখলাম আবার!

—কিছু দেখলেন না?

—দ্যাখো ইতু, তুমি সকাল থেকে আমার পিছনে লেগেছ!

—ওরা উঠে আসছে, ইতু ঠোঁটে আঙুল রাখল।

সুবল আর ইতুকে কিছু বলল না। সে বলল, আসুন কাকীমা। অবিনাশকে বলল, তুমি কুলি কুলি করছ কেন? চল, আমি তোমাকে সাহায্য করি।

—আরে না না! আমি নিজেই নিয়ে আসছি। তোমার আর কষ্ট করতে হবে

না। বলে অবিনাশ আর দাঁড়াল না। সে তার লেদার অ্যাটাচিটা হাতে করে চলে এল। কুলি মাথায় লটবহর নিয়ে আসছে। সঙ্গে অন্য একজন, বোধহয় অবিনাশের বন্ধু-বান্ধব কেউ হবে।

সুবল দরজায় দাঁড়িয়ে ওদের জিনিসপত্র তদারক করতে থাকল। কোথায় কি রাখলে নিরাপদে পৌঁছানো যাবে, কি ভাবে বসলে সবাই মুখোমুখি বসা যাবে, এবং একসঙ্গে লটবহর নিয়ে হৈ-চৈ করে প্রায় চলে যাওয়া যাবে—এসব স্থির করার সময় দেখল—এক কোণে মুখ গোমড়া করে ইতু বসে আছে।

সুবল ভাবল, সব কাজ হয়ে গেলে অবিনাশ এবং তার মার সঙ্গে ইতুর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। অবিনাশকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে, ওরা দেশভাগের পর এদেশে এসে খুব উন্নতি করেছে। একবার বলার ইচ্ছা হল, অবিনাশ তুমি এখন কি করছ? কিন্তু ইতুর গোমড়া মুখ দেখে, যাত্রীদের হল্লা এবং ছুটোছুটি দেখে আর কালো চশমার ভিতর সেই লম্বা যুবতীকে দেখে সে সব গোলমাল করে ফেলল।

যখন ধীরে ধীরে ট্রেন ছাড়ল, যখন গার্ড সবুজ পতাকা উড়িয়ে দিল, তখন সুবল দরজা ছেড়ে এসে ইতুর পাশে বসে বলল, কাকীমা, এই আমাদের ইতু। বড় ভাল মেয়ে। এমন মেয়ে একালে পাওয়া ভার।

কাকীমা ইতুকে দেখলেন না। তিনি সুবলের দিকে মুখ করে বসে থাকলেন, পাশের সেই কালো চশমার ভিতরে যে মেয়ের চোখ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দীপু, এই আমাদের সুবল। বড়বাবুর ছেলে। সুবল, তোমার বাবা কেমন আছেন?

—তিনি তো নেই। বেঁচে নেই।

কেমন হতাশ দেখাল মুখ। কাকীমা হতাশ মুখে সুবলকে দেখলেন। তারপর বললেন, তোমরা তো শুনেছি বাগমারির দিকে বাড়ি করেছ।

—এই ছোট্ট বাড়ি।

—দিদিকে খুব দেখতে ইচ্ছা হয়। একদিন নিয়ে এস না আমাদের বাড়িতে। পার্ক অ্যাভিনিউতে বাড়ি।

—মা আর এখন কোথাও যান না।

—কতবার ভেবেছি একবার তোমাদের দিকটাতে যাব। তিনি কতদিন হল মারা গেছেন?

—এদেশে এসে তিনি বেশিদিন বাঁচেননি। সুবল একটু থেমে বলল, না বেঁচে ভাল করেছেন।

কাকীমা বললেন, কেন, তোমাদের জমিদারীর আয় না থাকুক, কিছু তো খাস

ক্ষেত-খামার ছিল। নদীর পাড়ে পাড়ে ঘোড়া ছোটালে যতদূর যাওয়া যায় সব তো তোমাদের।

সুবল একবার কি ভেবে ইতুর দিকে তাকাল, মনে হয় ইতু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে। মেয়েটির চোখে কালো চশমা, চোখ দেখা যায় না মেয়ের, সেজন্য ভালভাবে তাকানো যায় না। অন্ধকারের ভেতর কি চোখ, কেমন চোখ, ভালবাসার কি উদাসীনতার চোখ, কে টের করতে পারবে। সুতরাং না তাকানোই ভাল।

সে এবার কাকীমার দিকে মুখ তুলে দেখল, তিনি কেমন মুটিয়ে গেছেন। অবিনাশ ওকে চিনতে না পারলে সুবল অবিনাশকে চিনতে পারত না, কারণ সুবল সেই এক সুবলই আছে। চোখ বড় এবং অকপট চোখ। চোখের মণিতে কিছুটা সোনালী রঙ। ঠিক বেড়ালের চোখ বলা যায় না। রঙটা আরও উজ্জ্বল হলে সমুদ্রপারের মানুষ ভাবতে কষ্ট হত না। সে হাতে পায়ে লম্বা বেশি। অবিনাশ যেন সেই অবিনাশ নেই, কাকীমা যেন সেই কাকীমা নেই। দুঃস্থ এবং অসহায় অবিনাশ এদেশে এসে এমন কি ব্যবসা করল বোঝা দায়। অবিনাশ কথায় কথায় ওর বড় গাড়ি, ছোট গাড়ি অথবা দারোয়ান এবং শিল্পে শান্তি বজায় রাখা দায়, বোধ হয় লক-আউটই করতে হচ্ছে এসব পাশের যুবকটিকে বোঝাচ্ছিল। পাশের যুবকটিকে না সুবলকে এসব প্রাচুর্যের কথা শোনানো হচ্ছে বোঝা দায়। সে যেজন্য মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তুমি অবিনাশ এত প্রাচুর্য সংসারে কি করে আমদানি করলে!

সে ইচ্ছা করেই কাকীমার সঙ্গে বেশি করে কথা জুড়ে দিল। যেন সে আদৌ আমল দিচ্ছে না অবিনাশকে, অবিনাশের প্রাচুর্যকে অবহেলার চোখে দেখছে। ওর লটবহর তুলে দেবার জন্য লোক এসেছিল। ওদের সে কি কারণে ছেড়ে দিয়েছে এবং কথায় কথায় তুমি যত চেষ্টাই কর সুবল, তোমাদের সেই আভিজাত্য আর নেই, আমি কুলি কুলি করেছি শখের দরুন, আমি একাই সব বহন করে নিতে পারি, অবিনাশ কথায় কথায় তাও প্রমাণ দেবার চেষ্টা করছিল।

সুবল বলল, বাবা শেষ পর্যন্ত মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। বাবা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত চলে আসেন।

—তুমি তবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেই পড়াশুনা করেছ?

—উপায় কি বল।

—এখানে তো সে সব ডিগ্রির দাম তেমন দেওয়া হয় না।

—আমার দুর্ভাগ্য অবিনাশ।

ইতু সুবলদার এমন একটা চরিত্র যেন এই প্রথম দেখছে। মানুষটা [illegible]

অনুগত। দাদা ওকে কিছু সুখ-সুবিধা করে দিয়েছেন। মানুষটার গানের বাতিক। ভাল গায়। তবে তেমন গাইয়ে নয়, দাদার চেষ্টাতেই সে দু-একবার সুযোগ পেয়েছে। এবং দাদার এত বেশি অনুগ্রহভাজন যে নিজের চরিত্রের আসল দিকটা কোনদিন প্রকাশ করেনি। প্রায় দীন-হীনের মত সব সময় ব্যবহার। যত এমন দীন-হীনের মত ব্যবহার দেখেছে, তত ইতুর গা-জ্বালা করেছে। এমন কি এই মানুষ ভাল গাইলেও চরিত্রে কাপুরুষতার লক্ষণ। গান ইতুর প্রাণকে ভরে দিতে পারেনি।

অবিনাশ বলল, তুমি এখন শিক্ষকতা করছ। তোমার এমন একটা পেটি জব ভাল লাগছে?

—উপায় কি বল?

কাকীমা বললেন, তোমাদের কথা আমরা ভুলতে পারি না সুবল। একদিন তোমার গান শুনতে পেলাম। তুমি তখন কত কাছের মানুষ বলে মনে হল।

অনেকক্ষণ পর যেন কাকীমার কথাটা মনে হল, আরে দীপু তুমি সুবলকে প্রণাম করলে না?

সুবলেরও যেন অনেকক্ষণ পর মনে হল, ইতু, এরা আমার আত্মীয়। আমাদের একই গ্রামে বাড়ি।

ইতু বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল। ট্রেনটা বেগে চলছে। দক্ষিণেশ্বরে একবার থামবে। এখন দুধারে মাঠ। নিচু জমি। সে জানলা দিয়ে প্রথম দক্ষিণেশ্বরের মঠ দেখতে পেল। এবং চূড়ায় দেখল কি যেন এক নীল মেঘ ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। সে কাকীমাকে নুয়ে প্রণাম করল। অবিনাশকে প্রণাম করতে গেলে বলল, না না, আমি কারো প্রণাম নিই না। ইতু বাধা পেয়ে বসে গেল। কিন্তু দীপু, সে তার চশমা খুলে এবার ভাল করে মুখ মুছল। সে সুবলের কাছে এসে প্রণাম করল। চশমা চোখ থেকে খুলে নিলে সুবল দেখতে পেল—না, তেমন শক্ত অথবা অবহেলা করার মত চোখ নয়। মাধুর্য আছে চোখে। বরং কালো চশমার ভিতর যে গাম্ভীর্য ছিল, সাদা চোখে তাকে যথার্থই দীপু মনে হল। পূর্ববঙ্গের সেই আটচালা ঘরের ছোট বালিকা দীপুকে সে আবিষ্কার করে বলল, অবিনাশ তোর বোন?

—তবে কে? তুমি কি ভেবেছ?

কাকীমা বললেন, তুমি তবে চিনতে পারনি?

—না, কি করে চিনব। আমাদের সেই মেয়ে যে এমন সুন্দর হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি।

দীপু বলল, সুবলদা আপনি কিন্তু এতটুকু বদলান নি। চৌদ্দ-পনেরো বছর

আগে যেমন লম্বা ঢেঙ্গা ছিলেন এখনও ঠিক তেমনি আছেন।

ইতু মনে মনে বিরক্ত হচ্ছে। লম্বা ঢেঙ্গা কি! তুমি মেয়ে কথা বলতে পর্যন্ত জান না। তখনই ট্রেনটা ধীরে ধীরে থেমে গেল।

—তোমাদের সঙ্গে জল আছে? কাকীমা বললেন।

সুবল বলল, না।

—যা যা অসুবিধা হবে আমাদের বলবে।

দীপু বলল, সুবলদা আঁসার সময় টিয়াপাখিটা নিয়ে আসতে পেরেছিলেন?

—না। আসার সময় কোনরকমে প্রাণ হাতে করে এসেছি।

—এখন দেখলে সুবল, তোমার বাবা কত বড় ভুল করেছিলেন। তিনি যদি দেশ-ভাগের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতেন, তবে তোমাদের কি প্রাচুর্যই না থাকত!

—সে সব ভেবে কি লাভ কাকীমা?

কাকীমা যেন ইতু এই কম্পার্টমেন্টে আছে টেরই পাচ্ছেন না। সহসা যেন ইতুকে দেখে ফেললেন, এবং সুবল যে ইতুর খুব কাছাকাছি মানুষ টের পেয়ে বললেন, হাজারিবাগ রোডে তোমাদের বাড়ি?

ইতু খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ।

—খুব ভাল হয়েছে।

মনে মনে সুবল তারিফ করল। এরা না থাকলে গোটা পথ ইতু জ্বালাতন করে মারত।

—তোমার দাদারা বুঝি সেখানে বাড়ি-ঘর করেছেন?

—দাদারা কেউ থাকে না। মা আছেন ওখানে।

—আমার দাদার একমাত্র ছেলে. বলে তিনি ডাকলেন, অমল এদিকে এস।

অমল উঠে এসে কাকীমার পাশে বসল। —এই অমল। বুঝলে সুবল, দাদার একমাত্র ছেলে অমল। আমার দাদা কলকাতায় এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যবসা করেন। এখানে তিনি চিনেমাটির খনি কিনেছেন। অমলের ওপর দেখাশুনা করার ভার। খড়্গাপুর থেকে মাইনিং পাস করেছে। ভাল ছেলে। ওর জন্য দাদা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার মাকে নিয়ে তোমাদের হাজারিবাগ রোডেই ফের ফিরে আসতে হবে।

ইতুর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে দেখাল। এই গাড়িতে সেই মানুষ। সে তাড়াতাড়ি কেমন চোখের ওপর সব দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকল।

—আর এই আমাদের সুবল। তোর পিসেমশাই ওদের জমিদারীতে কাজ করতেন। আমাদের সুখে-দুঃখে বড়বাবু ছিলেন দেবতার মত। বড়বাবুর ছেলে সুবল। আমাদের সঙ্গে ওদের কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, অথচ যেন পরম

আত্মীয়।

অবিনাশ বলল, তোমাদের সেই মঠটা এখনও আছে?

—জানি না। তিন-চার বছর হল আমরা চলে এসেছি। জানি না আমাদের সেই মঠ এখন আর আছে কি না। না, নদীতে ভেঙে নিয়েছে।

সুবলের প্রতি ইতুর এখন অবজ্ঞা লেশমাত্র নেই। বড় বেশি লক্ষ্মীমেয়ে হয়ে গেছে। ট্রেন নদীর ওপরে এখন। নদীতে ষ্টিমার এবং ক্রমে ট্রেন ছুটছে। নদী পার হয়ে ট্রেন গ্রাম মাঠের ওপর দিয়ে চলতে থাকল। ইতু গ্রাম মাঠ দেখল, ফসল দেখল। শীতের দিনে যব গমের গাছ চারিদিকে, বেশ শীত করছিল ইতুর। সে সেই মানুষ, অমল যার নাম, কারণ অমল এবং অবিনাশ এই দুই নাম সে বার বার বাবার কাছে শুনেছে। একবার ওদের মানে অমল এবং অবিনাশের দেখে যাবার কথা ছিল—কি কারণে ওদের আসা হয়নি। এখন আর মনে পড়ছে না—ইতু কথা বলতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। সে অমল এবং অবিনাশকে চিনে ফেলেছে।

অমল বলল, আপনাদের গল্প পিসিমার কাছে এত শুনেছি। বলে অমল দীপুর দিকে তাকাল। দীপুর ছেলেবেলার কোন শপথের কথা মনে হতে পারে। অথবা সুবলকে দেখে বোধহয় অমলের মনে পড়ল—কথা ছিল দীপু এই যে যুবক, যে এখন ধুতি পরে আছে, যার গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবী, যে দামী শাল শরীরে জড়িয়ে শীত থেকে আত্মরক্ষা করছে, যে যুবকের চোখ সোনালী অথবা অনেকক্ষণ তাকালে যে যুবকের চোখ মনে হয় নীল, আর নীলরক্ত যথার্থই যার শরীরে মনে—শৈশবে দীপু যার পাণীপ্রার্থী ছিল, সংসারে পিসেমশাইয়ের স্বপ্ন, যদি তার দীপু এমন রাজপুত্রের মত বরের গলায় মালা দিতে পারে—আরো কত কথা মনে হতে পারে অমলের—যার জন্য অমল অনেকক্ষণ দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল, কি রে, তুই সুবলবাবুকে চিনতে পারছিস না?

—চিনতে পারব না কেন?

—তবে কথা বলছিস না কেন?

কাকীমা বললেন, আমাদের দীপু বড় কম কথা বলে।

সুবল বলল, দীপু তুমি কি করছ?

কাকীমা জবাব দিলেন, গত বার আর্ট কলেজ থেকে বের হয়েছে। তোমাদের ঠিকানা জানা নেই, কেবল জানি বড়বাবু বাগমারির দিকে বাড়ি করেছেন, জানলে তোমাকে দীপু নিশ্চয়ই একটা কার্ড পাঠাত। তুমি ওর এগজিবিশানে এলে সুবল, ওর হাতের ছবি দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারতে না। আমাদের দীপু কি সুন্দর ছবি আঁকে।

সুবল ভাবল, এই সেই দীপু যার চোখ বড়, ঘাড় গলা মসৃণ, যে জলের তরঙ্গের মত উচ্ছল ছিল, এবং যাদের বাড়ির দুপাশে সুপারীগাছ, গাছে গাছে কত ফল, ফলের জন্য একবার দীপু গাছতলায় দাঁড়িয়ে পাখি ওড়াচ্ছিল—আর সুবল হাতে বন্দুক নিয়ে, সঙ্গে রামসুন্দর পেয়াদা ছিল, সেই পাখির বুকে গুলি ছুঁড়ে দিলে কি কান্না দীপুর।

সুবল বলল, তোমার মনে পড়ে দীপু, একবার আমি একটা পাখি মেরে ফেলায় তুমি খুব কেঁদেছিলে?

দীপু বোধ হয় লজ্জা পেল। সে মুখ নিচু করে রাখল।

ইতু তখনও মাঠ এবং ফসলের ক্ষেত দেখছে। অমল এবং অবিনাশ দুদিন বাদে তাদের বাড়িতে আসবে। ওকে দেখবে। মাইনিং পাস, কোলিয়ারির দেখাশোনা করে, নাম অমল গাঙ্গুলি—এমনই সে শুনেছে। ওদের পদবীটা জানার ইচ্ছা হল ইতুর। যেন পদবীটা জানলে সে স্থির করে ফেলতে পারবে ওরা কারা, ওরাই হাজারীবাগ রোডে পাত্রী দেখতে আসছে কিনা, এই সেই অমল গাঙ্গলি কি না, না অন্যদল, কি সব ভেবে ইতু কথাবার্তা একেবারেই বন্ধ করে দিল।

সুবল বলল, তুমি জান ইতু, অবিনাশ এখন ব্যবসা করে কত বড় হয়েছে?

ইতু চোখ তুলে অবিনাশকে দেখল!

অবিনাশ বলল, আপনি এত আড়ষ্ট কেন? একেবারে চুপচাপ। কোন কথা বলছেন না।

সুবল বলল, তোরা ভাই আছিস, খুব ভাল হয়েছে। তোরা না থাকলে সারাটা রাস্তা আমাকে কি যে জ্বালাতন করত এই মেয়ে—বলে সুবল সামান্য হাসার চেষ্টা করল।

দীপু বলল, সুবলদা, আপনাকে বুঝি উনি খুব জ্বালায়!

—আর বল না, ভীষণ। কাল দাদা বললেন, সুবল, তুমি ইতুকে নিয়ে যাও। ওর পরীক্ষা হয়ে গেছে। একবার দেশ থেকে ঘুরে আসুক। মেয়ের কি চিৎকার চেঁচামেচি!

অমল বলল, তাই বুঝি?

—ভীষণ।

—কি রকম ভীষণ? অবিনাশ মুখ বাড়াল।

—আমি পথ-ঘাট চিনি না, আমাকেই নিয়ে যাবার লোকের দরকার, আমি ইতুকে নিয়ে যাব কি!

—তোমার ওপর নির্ভর করতে পারছে না?

—একেবারেই না।

—তা তুমি যা মানুষ। নির্ভর করা দায় বৈকি!

—তুমি যে কি বল অবিনাশ! তার জন্য হাজারিবাগ রোডে আমি নিয়ে যেতে পারি না।

—পারবে না কেন। বলে অবিনাশ দীপুর দিকে তাকাল।

—আজকালকার মেয়েদের নিয়ে তুমি যেখানেই যাও দেখবে ওরাই তোমাকে লিড করছে। দীপুকে দেখিয়ে বলল, তুমি না থাকলে দেখতে কেমন মাতিয়ে রাখত আমাদের। গান গেয়ে সারা কামরাতে বন্যা ছুটিয়ে দিত।

—তাহলে বল আমরা বাদ সাধলাম।

দীপু বলল, দাদা, তুই আমার পিছনে লাগছিস কেন? সুবলদা, আমি গান একেবারেই জানি না।

সুবল বলল, কে-ইবা তেমন জানে।

ট্রেন এখন ছুটছে। কাকীমা চাইছেন সুবলদের বর্তমান খবর নিতে। পুরনো কথা মনে আসছে। সুবল এবং দীপুকে কেন্দ্র করে কি যেন কথা হয়েছিল নায়েব এবং বড়বাবুর ভিতর। তিনি ইচ্ছা করেই যেন সেই সব পুরনো কথা মনে করতে পারছেন না। সুবলদের সেই জাঁক-জমক, এমনকি এখন কলকাতার বাইরে বাগমারি অঞ্চলে একটা বাড়ি বাদে আর কোন সম্বল নেই। দুই বোন অবিবাহিতা। সামান্য শিক্ষক এই সুবল। তার একবার বলার ইচ্ছা হল—কত কাঠার ওপর বাড়ি করে গেছেন বড়বাবু? ক'তলা? তিনি সেজন্য ওদের এমন উচ্চকিত হাসি এবং এত সত্বর মেতে ওঠাতে সামান্য বিরক্ত হচ্ছিলেন। দীপু সুবলের জবাবে কি বলতে যাচ্ছিল, তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন, নিচে-ওপরে মিলে ক'টা ঘর?

সুবল বলল, কাকীমা, ওপর পাবেন কোথায়? একতলা বাড়ি। তিনখানা কোঠা। কোনরকমে থাকা।

কাকীমা বললেন, অঃ।

সুবল বুঝল অঃ নয় কাকীমা, আমি আপনার অহঙ্কার ধরে ফেলেছি। কি নসিব আমার দেখুন, সে মনে মনে গাড়ির জানলাতে মুখ রেখে ভাবছিল, দীপুর সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে ট্রেনেই দেখা। দেশে থাকতে শুনেছিলাম, আপনারা কিসের ব্যবসা করে খুব বড়লোক হয়ে গেছেন। বাবা দুঃখ করে বলতেন, এত জাঁক-জমক শশী দেখে যেতে পারল না। শশীর ছেলে অবিনাশ, মেয়ে দীপু—শশী ইছাপুরা কাছারিতে নায়েবি করে বড় বেশি সুখ পায়নি। শেষ দিকে অর্থাৎ তখন দেশ-ভাগের মুখে শশী আদায়পত্র একেবারেই কিছু করতে পারত না। দেশ-ভাগের সঙ্গে সঙ্গে শশী গ্রামের সবাইকে ফেলে সামান্য সঞ্চয় নিয়ে কলকাতার কোথায় টিনপ্লেটের খুচরো বিক্রি-বাটার ব্যবস্থা করতে গিয়ে কুবেরের ধন

আবিষ্কার করে ফেলেছিল। ছেলে অবিনাশ তখন ছাত্র। কি হবে স্কুলে এ প্লাস বি হোলস্কোয়ার শিখে? সে অবিনাশকে ব্যবসাতে ঢুকিয়ে দিল। এখন অবিনাশ বড় ব্যবসায়ী। শশীকাকা আর বাঁচল না।

দীপু বলল, সুবলদা আপনি আমাদের বাড়িতে কবে আসছেন বলুন?

—যাব একদিন।

—কোথায় আর তুমি যাচ্ছ। তিন চার বছর হয়ে গেল তোমরা এসেছ, অথচ বড়দিকে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়িতে এলে না।

—যাব কাকীমা।

—এত তাড়াতাড়ি সম্পর্কের কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

সুবল এবার মনে মনে বিরক্ত না হয়ে পারল না। পথে দেখা, কেন বাপু, খবর তো তোমাদেরও জানা। তোমরা তো জানতে আমরা কোথায় আছি, কিভাবে বেঁচে আছি, সব খবর জানতে, অথচ একদিন সবাইকে নিয়ে এলে নিশ্চয়ই খুব ছোট হয়ে যেতে না।

অবিনাশ মনে মনে বলল, যাইনি সে অন্য কারণে। বিত্ত-বৈভবের কথা নয়। এত ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে গেলে তোমাদের অসম্মান করা হত। জেঠিমাকে আমি জানি, অথবা তোমরা এবং ইলু বিলু ভাবতে পারত, আমাদের বৈভব দেখানোর জন্য গায়ে পড়া ভাব দেখাতে গেছি।

অবিনাশ জানলায় মুখ রেখে এখন মাঠ-ঘাট দেখছে। অমলবাবু একপাশে বসে একটা ইংরেজী বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। দীপু তার আঁচল সামলাচ্ছিল। নীল রঙের দামী বেনারসীর মত শাড়ি, হয়তো দাম আরো বেশি। চুল ওর বব করা। প্রসাধনের জন্য চোখে মুখে মনে হয় সব সময় একটা কাঁচপোকা উড়ছে। খুব ঝলমলে শাড়ি পরে, বিদেশী কোন প্রকাশনার দামী সব আর্ট প্লেটে বাঁধাই বই, সে যেন নুয়ে নুয়ে কি দেখছে এখন। আর আমাদের ইতু, সরল বালিকা বনে গেছে। কোন চেঁচামেচি নেই। সুবল একবার বলল, তুমি চা খাবে ইতু? কাকীমা কফি করে এনেছেন, কত সব ব্যবস্থা ওদের। এবং সঙ্গে চাকর আছে, বর্ধমানে এসে বোঝা গেল। সে এসে কি লাগবে না লাগবে, সব জেনে গেল। অবিনাশ এত আপনজনের মত ব্যবহার করছে এবং সুবলকে এত বেশি সমীহ করে কথা বলছে যে ইতু এখন আর কিছুতেই বলতে পারছে না, এটা এনে দিন, জল দিতে বলুন, কলা কি সব কিনেছেন, সব পচা—আপনি যে কি না সুবলদা! সে কিছুই বলতে পারছে না। সে চুপচাপ সুবলের দিকে সামান্য সময়ের জন্য তাকাল। তারপর বলল, সুবলদা।

কাকীমা বললেন, একটু কফি খাও।

ইতু বলল, আমরা দশটায় ভাত খেয়ে রওনা হয়েছি।

অবিনাশ বলল, কফি চা যে-কোন সময়ে চলে। এনি টাইম টি টাইম।

ইতু আর কথা বাড়াল না। সে চুপচাপ থাকল। কারণ উপায় নেই চুপচাপ থাকা বাদে—বোধ হয় এরাই, সে ফিসফিস করে বলল, অমলবাবুরা কি গাঙ্গুলি?

—আমি তো ঠিক জানি না, ইতু! জিজ্ঞেস করব?

—না না! তুমি কিছু বলতে যেও না। আমি এমনি বললাম।

ইতু ক্রমে বরফ বনে যাচ্ছিল। এমন আড়ষ্ট সে কোনদিন ইতুকে দেখেনি। যতবার ওরা কোথাও না কোথাও গেছে, আনন্দদার সঙ্গে, কলেজের অধ্যাপকদের সঙ্গে এবং বন্ধু-বান্ধবীতে মিলে যতবার পুরী, দেওঘর, দীঘা এবং মুর্শিদাবাদে গেছে ততবার সে দেখেছে গোটা পথ ইতু একাই একশো। সে বসার ব্যবস্থা করেছে, সেকেণ্ড ক্লাসে অথবা ফার্স্ট ক্লাসে উটকো লোক এসে ভিড় করলে এই ইতু প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে চেকার অথবা গার্ডকে বলে কামরা খালি করে দিয়েছে। এই সেই মেয়ে, মনেই হয় না এখন মেয়ের বুকে প্রাণ আছে। ইতু একটু কফি খেয়ে বাকিটা জানলা দিয়ে ফেলে দিল। দূরের মাঠে এবং নদীর পাড়ে পাড়ে, একটা দুটো তিনটে, বোধ হয় অনেকগুলো গোরুর গাড়ি সার বেঁধে যাচ্ছে। এই গাড়ি দেখলে ওর সবুজ এক দ্বীপের ছবি চোখের ওপর ভাসতে থাকে। নির্জন সেই দ্বীপে সে যেন একটা মানুষকেই চেনে, সে তার প্রিয় সুবলদা। যার সঙ্গে নির্ভয়ে সে এতদিন যে-কোন অঞ্চলে রাত যাপন করে এসেছে। মানুষটা যেন কি! কোন ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নেই। এই যে দীপু, কি সুন্দর মুখ, কি সবল চেহারা, কি যে মেয়ে—ইতু নিজের গায়ের রঙ দেখল, শ্যামলা মনে হয় এই রঙ, আর দীপুর মুখে এখন যেন লাবণ্য ঝরে পড়ছে। দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে দেখলেই বোঝা যায়। এমন সুন্দর মুখ আর কোথায় পাওয়া যাবে? অথচ সুবলদার কোন আবেগ নেই। যেন এমন কি মেয়ে দীপু! দেখা হয়ে গেছে এই পর্যন্ত, পথের এই পরিচয় ঘরে গিয়ে শেষ হবে না। অন্য কোন স্টেশনে নেমে গেলেই যেন সব শেষ।

অবিনাশ বলল, তুমি এদিকটায় আর এসেছ?

সুবল বলল, ট্রেনে আরও দুবার গেছি। একবার দেওঘর গিয়েছিলাম। অন্যবার এলাহাবাদে।

—ট্রেন থেকে নামনি?

—না, নামবার সুযোগ হয়নি।

এসব অঞ্চলে নেমে দূরের কোন কোলিয়ারিতে রাত কাটানোয় বেশ একটা

রোমাঞ্চ আছে।

দীপু বলল, একবার মনে আছে তোর দাদা, আমরা নিমতাতে নেমে গেছিলাম। গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার কি আদর-যত্ন করেছিল!

ট্রেন ক্রমে দুর্গাপুর এসে যাচ্ছে। দু ধারে ফসল এবং মাঠ ফেলে ট্রেন সেই যে ছুটছে আর থামছে না। দু ধারে শীতের ফসল, ফুলকপি-বাঁধাকপির জমি কোথাও; আর মনে হয় এই সব নিরিবিলি গ্রামের ভিতর কত না সুখ—সুবল এখন কথা বলছিল না, দীপুর কথা শুনছিল, এই মেয়ে দীপু; দীপু একবার জলে ডুবে গেছিল। ঘোড়ায় চড়ে সুবল। সুবলের আর তখন বয়েস কত, এই চৌদ্দ-পনেরো, দীপুর আর বয়েস কত, এই আট-দশ, সে ঘোড়ায় চড়ে সড়ক ধরে ফিরছিল, সঙ্গে রামসুন্দর পেয়াদা সুবলকে ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছিল। দীপুদের পুকুর পাড়ে লম্বা এক সুপারীর বাগান, হাজার হাজার গাছ, সেই গাছগুলির ছায়া থেকে সে প্রথম দীপুকে দেখল সিঁড়ি ধরে নামছে, নামতে নামতে নিচে নেমে জল তোলার সময় পুকুরপাড়ে বনজঙ্গলের ভিতর বুঝি ঘোড়ার মুখ দেখে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তারপর গভীর জলে পা পিছলে ডুবে গেল। ক্রমে সে হাত-পা এবং মাথা তলিয়ে যেতে দেখল। সে দু লাফে ঘোড়া ফেলে রামসুন্দর পেয়াদাকে ফেলে—চিৎকার করে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল ; বুঝি বলেছিল, দীপু জলে ডুবে যাচ্ছে।

সুবল বলল, দীপু তোমার মনে পড়ে তুমি একবার জলে ডুবে গেছিলে?

দীপু সুবলকে দেখল না। কাকীমার পাশে দীপু, কাকীমা মোটা মানুষ দীপু সেজন্য ভাল করে সুবলকে দেখতে পাচ্ছে না। সে একটু নুয়ে সুবলকে দেখতে চাইল। এখন আর তেমন এই সুবলদার জন্য কষ্ট হয় না, তবু অনেকদিন পরে দেখা, এবং সেই দৃশ্য মনে হলে, কারণ দৃশ্যটা পরবর্তী সময়ে মুখে মুখে ফিরেছে। সুবল, যার চোখ বড় এবং নীল, গায়ের রং যার সাগরপারের মানুষদের মত, যেন প্রায় সুন্দর দীপুকে পাঁজাকোলা করে জল থেকে তুলে এনে ঘাসের উপর শুইয়ে কি আপ্রাণ চেষ্টা সুবলদার। দীপু বলল, সেদিন আপনি আমার সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন। আপনি না থাকলে টুপ! জলের নিচে মাছ হয়ে যেতাম। মা পুকুরপাড়ে বসে কেবল কাঁদত, দীপু আমার মাছ হলি, জলে গেলি দুঃখী মায়ের দুঃখ বুঝলি না।

কাকীমা ধমক দিলেন, দীপু তুই বড্ড ফাজিল।

সুবলের বোধ হয় এই করে একটা হক জন্মেগেছিল দীপুর উপর। শশীকাকার বড় শখ ছিল, বড়বাবুর বড় শখ ছিল দীপু যার চোখ তখন নীল ছিল না, বেত-ফলের মত কালো চোখ, নাক লম্বা, দুর্গাপ্রতিমার মত মুখ, সব সময় যেন ডিমের কুসুম মেখে রাখত মুখে দীপু—সেই দীপুর সঙ্গে এতদিন পরে দেখা। অথচ দীপুর

কোন আড়ষ্টতা নেই. অবিনাশের চেয়ে দীপু আপন প্রাণ উচ্ছল করা মেয়ে। সে দীপুকে বলল, একদিন এস আমাদের বাড়িতে। কাকীমা, দীপুকে নিয়ে একদিন আসুন!

—আপনি না এলে আমরা যাচ্ছি না।

সুবল বলতে পারত, তা যাবে কেন! সময় মানুষের সমান থাকে না দীপু। সব মেয়ে, এই ধর ইতু, সে তো কিছু বললে বিশ্বাস করতে চায় না—আমাদের একটা মঠ ছিল বললে সে হাসে, আমার একটা টিয়াপাখি ছিল বললে সে রসিকতা করে। আমার এখন দুর্দিন। তোমাদের সকলের এখন সুদিন। আমি কোথাও যাই না। আমার সামান্য গান-বাজনা সম্বল। আনন্দদা এখন আমার সব। ওর এই বোন ইতুকে আমি বড় ভয় করি। এত করে মন পাই না। তুমি তো দেখেছ ওর যাতে কোন অসুবিধা না হয়—কি না করছি, কারণ আনন্দদা আমার জীবনে ফুল ফোটাবার সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখছেন। ফলে বড় সমীহ করি মানুষটাকে। সমীহ করে চললেই নিজেকে নিরীহ করে রাখতে হয়। ইতুকে আমি বড় ভয় পাই দীপু। আরও কি সব মনে পড়াতে সুবল বিমর্ষ হয়ে থাকল। সে দীপুকে বলতে পারল না, তুমি না এলে আমি যাচ্ছি না। সে শুধু দীপুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শৈশবের দীপুকে খুঁজতে থাকল।

দুর্গাপুর আসতেই ওরা বলল, আমরা এখানে নেমে যাব সুবল। এখানে আমাদের একটা গেষ্ট হাউস আছে। আজ আমরা দুপরের আহার এখানেই করব। লোকজন আছে। খবর দেওয়া আছে। গেলেই পাত পেতে বসে খাওয়া। চল না তোমরা। বিকেলের গাড়ি করে আমরা চলে যাব আসানসোল। তারপর ট্রেনে।

সুবল ইতুর দিকে তাকাল। ইতু কোন জবাব দিচ্ছে না দেখে সে বলতে কিছু সাহস পেল না। সে বলল, কাকীমা আমরা খেয়ে রওনা হয়েছি। তা ছাড়া এই ট্রেনে না পৌঁছলে ওর বাড়ির লোকেরা খুব চিন্তা করবে। সুবল বলতে পারত, বাড়ির লোকদের বিশেষ ভয় নেই, কিন্তু এই মেয়ে পান থেকে চুন খসলে আনন্দদাকে দু হাত নেড়ে বলবে, কি মানুষ সঙ্গে দিয়েছিলে দাদা! খাবার লোভে মাঝ-স্টেশনে নেমে গেল মানুষটা। আমার সুবিধা-অসুবিধা বুঝল না।

তবু কি যেন আকর্ষণ এই যুবতীর প্রতি। সারাক্ষণ মুখ তেতো করে রাখবে, সুবিধা-অসুবিধা মায়ের মত বুঝবে। খেতে, উঠতে বসতে, সব সময় পাহারা—কোথায় কি ভুল করছি, কোন্‌টা করলে অসমীচীন, এসব দেখা ওর যেন ধাতে রয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ধ্যাত্তেরি ছাই বলে সব ছেড়ে-ছুড়ে গান-বাজনা লাটে তুলে দিয়ে প্রণিপাত করে চলে আসি—কিন্তু এই মেয়ে দুদিন যেতে না যেতেই বিকেলে এসে হাজির হবে। দাদা আপনাকে ডেকেছে সুবলদা। গেলে পর

আনন্দদা হেসে বলবে, কি, তুমি আবার ইতুর সঙ্গে ঝগড়া করেছ?

—আমি কোথায় করলাম।

—ইতু যে বলল।

—ইতু বড্ড মিছে কথা বলে দাদা।

—বেশ, আমি মিথ্যে কথা বলি, আপনি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির!

আনন্দদা হয়তো তখন বলবেন আজ তোমাকে একটা ফাংশানে সেতার বাজাতে হবে। আমি, তুমি এবং সুবোধ যাচ্ছি! এই করে আনন্দদা আছে তার জীবনে, গানে-বাজনায় যে সামান্য প্রতিষ্ঠা সব সেই মানুষটার জন্য।

দীপু নামার সময় বলল, খুব ইচ্ছা ছিল সুবলদা আপনার বাজনা শুনি। আপনি কবে আসছেন?

—যাব। হাতে সময় পেলেই একদিন হুট করে গিয়ে হাজির হব।

অমল বলল, আপনি আসুন একবার হাজারিবাগ শহরে। বলে সে একটা কার্ড দিল।

অবিনাশ বলল, আমাদের ঠিকানা তোমার কাছে আছে?

—তোমাদের বাড়িটা আমি দেখেছি।

—কে দেখাল?

—মাকে একদিন তোমাদের ঐ দিকটাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি দেখালেন, ওটা তোর শশীকাকার বাড়ি। তিনি বাড়িটা কি করে চিনে রেখেছেন জিজ্ঞাসা করিনি।

দীপু ইতুর দিকে তাকাল। ইতু দীপুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। দীপুর এখন প্রায় সাতাশ হবার কথা, এই মেয়ের বিশ-বাইশ। সুবলের সঙ্গে বয়সের ফারাকটা চোখে পড়ার মত।

সুবল বলল, ইতু, ওরা চলে যাচ্ছে।

ইতু উঠে ওদের প্রণাম করল। কাকীমা ইতুর চিবুক ধরে আদর করলেন।

অবিনাশ বলল, সুবলের সঙ্গে আপনারও নিমন্ত্রণ থাকল আমাদের বাড়িতে। আসা চাই কিন্তু।

ইতু এত আড়ষ্ট যে উত্তর দিতে পর্যন্ত পারল না।

সুবলই ওর হয়ে বলল, নিয়ে যাব।

সেই স্টেশনে ওরা নেমে গেলে, ইতু উঁকি দিয়ে দেখল ওরা হেঁটে হেঁটে প্ল্যাটফরম পার হয়ে যাচ্ছে। কামরা প্রায় ফাঁকা। হাতে যেন স্বর্গ পাওয়ার মত—ইতু এবার এক কোণে চুপচাপ বসে জানলার বাইরে চোখ মেলে দিল। এই কামরায় অন্য কেউ আছে সে যেন টের পাচ্ছে না। অথবা থাকলেও ভুলে গেছে।

সুবল বুঝতে পারল ব্যাপার বিশেষ সুবিধার নয়। সে একটু চা খাবে ভেবেছিল, তাও সে বলতে সাহস পেল না।

সুবল ভাবল এখন ইতুকে কিছু বলা দরকার। ইতু তুমি যেন কনে দেখা মেয়ের মত এতক্ষণ বসে ছিলে আর ওরা চলে যেতেই দজ্জাল মেয়ের মত মুখ নিয়ে জানলায় বসে আছ।

ট্রেন স্টেশন ছেড়ে মাঠে পড়লে ওরা কিছু সোনালী রঙের যবের গাছ দেখতে পেল।

সুবল বলল, কি ফসল হয়েছে দেখেছ।

—ফসল হয়েছে তো আমি কি করব?

—তোমাকে কিছু করতে বলিনি। ইতু তোমার সঙ্গে দেখছি কথা বলা দায়।

—আমি তো বলিনি কেউ আমার সঙ্গে কথা বলুক।

সুবল তার রাগ আর চেপে রাখতে পারল না—আচ্ছা, তুমি এমন অবুঝ হলে কি করি বল তো!

ইতুর মুখে এখন কি যেন এক রঙ। সুবল বলতে পারত, আর না মেয়ে, ঘাট হয়েছে। তোমাকে আর কোথাও নিয়ে যাচ্ছি না। আজ থেকে, কাল চলে আসব। যদি ওরা তোমাকে দেখতে কাল না আসে, তবে পরশু। সে চুপচাপ ঠিক ইতুর মত মুখ উঁচু করে বসে থাকল।

ট্রেন যাচ্ছে। কামরা ফাঁকা। খুব একটা ভীড় নেই। মনে হল ফাঁকায় ফাঁকায় বেশ চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু আসানসোল আসতেই হিতে বিপরীত। ফার্স্ট ক্লাসে যাত্রী নেই একটি, অথচ কিছু কলেজের যুবক এবং উটকো লোক এসে উঠে পড়ল। ক্রমে এত ভীড় যে সুবল পর্যন্ত না উঠে পারল না।

এতক্ষণ পর ইতু কথা বলল, আপনি উঠে পড়ছেন কেন?

—দেখছ না এক ভদ্রমহিলা কেমন চেপটে যাচ্ছেন।

—যাক। আপনি উঠবেন না বলছি. কে ওদের উঠতে বলেছে ভীড়ে!

সুবল বসে পড়ল। ভীড়টা বেশিক্ষণ না। পরের স্টেশন আসতেই ভীড় পাতলা হয়ে গেল।

এবার ইতু বলল, আপনি সুবলদা জীবনে কিচ্ছু করতে পারবেন না। আপনি নিজের জায়গা ছেড়ে অন্যকে বসতে দেন!

—হবে।

—দীপুকে আপনি কত ছোট দেখেছেন?

—অনেকদিন পর দেখা। দীপুর সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল।

—ওর সঙ্গে বিয়ে হবে কি হবে না কিছু জানতে চেয়েছি?

—না। সুবল ঠিক জায়গায় আঘাত করতে পেরেছে ভেবে খুশি হল।

—তবে? গায়ে পড়ে কথা বলার অভ্যাস আপনার বড্ড বেশি।

—কিন্তু এখন আর হবে না।

—কেন? ইতু যেন হাতে আকাশ ছুঁতে পেল।

—বুঝতেই পারছ, ওরা এখন চাঁদ ধরার স্বপ্ন দেখছে।

—আপনি কম কিসে?

—ঠিক বলছ? ইতু আমি কম কিসে, ঠিক বলছ?

ইতুর মুখ কেমন রাঙা হয়ে উঠল। সে সুবলদার এই সামান্য অসম্মানটুকু বুঝি সহ্য করতে পারেনি।

—ইতু, তুমি এই প্রথম আমার প্রশংসা করলে। আমি কম নই কিসে বল? আমার অর্থ নেই, প্রতিপত্তি নেই। সামান্য শিক্ষক আমি। তোমার মত মেয়ের ধমক খেতে খেতে আমার কলকাতার চার বছরের জীবন কাটছে। দীপুকে বিয়ে করলে মানাবে কেন।

—দেখ, কি মানাবে না মানাবে আমরা বেশ ভাল বুঝি। ইতু সুবলকে সহসা 'তুমি' বলে ফেলে কেমন লজ্জিত বোধ করল। যেন কত আপন করে নেবার জন্য এই 'তুমি' সম্বোধন। আপন প্রাণে কি যেন কেবল বাজে, সংকোচে অথবা লজ্জায় যার প্রকাশ, সব সময় বদ্ধ দুয়ারের মত আগল তুলে থাকে। ইতু বোধহয় আর তেমনভাবে কথা বলতে পারবে না, সে সরল এবং শান্ত বালিকার মত চোখ নিয়ে ট্রেনের চাকার শব্দ শুনতে থাকল।

—দীপুর বাবা আমাদের ইছাপুরার কাছারী-বাড়ির নায়েব ছিল, ওদের স্বচ্ছলতা বাবা খুব যত্ন দিয়ে রক্ষা করতেন। আমাদের বাড়ির সামনে একটা বড় নদী ছিল, নাম বালুনদী। বড় একটা বালির চর ছিল—আমি এবং দীপু নাম দিয়েছিলাম রূপালীর চর। পাশে কাশবন ছিল, শরতে কাশফুল ফুটত। আমি, দীপু আর অবিনাশ শরৎকালে ঝি অন্নদার সঙ্গে সেই কাশবনে লুকোচুরি খেলতে চলে যেতাম। দীপু ছেলেবেলায় বড় ভীতু মেয়ে ছিল। দীপুকে দেখে এখন আর চেনাই যায় না।

—সুবলদা। ইতু ডাকল। —তুমি দীপুকে ভালবাস?

সুবল বলল, আরে না না ভালবাসাবাসির বয়েস এখন আর নেই। আমার মা-র খুব অহঙ্কার। জান, মা কিছুতেই শশীকাকার বাড়ি যায়নি। আমরা এখানে আসার পর শশীকাকা বেঁচেছিলেন, তিনি এসে বললেন, বৌদি, একবার গরিবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দাও। তখন মাত্র ওদের নতুন বাড়ি উঠেছে। গাড়ি কেনার কথা চলছে। মা গেলেন না। কারণ শশীকাকা পুরনো শপথের কথাটা ইচ্ছা করেই

এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সপ্তাহ বাদে আমরা শশীকাকার মৃত্যু সংবাদ পাই। তারপর দুপক্ষই কথাটা ভুলে যাবার চেষ্টা করেছে।

ইতু বলল, সুবলদা, অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

সুবল ইতুর মুখে এমন কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। কতটুকু মেয়ে কি সাহস ভরে উজ্জ্বল সব কথা বলে!

সে ইতুকে বলল, আচ্ছা ইতু, তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমাকে কে সব সময় তিরস্কার করবে?

—কেন, দীপু।

—তুমি দীপুকে নিয়ে কথা বললে আমাকে রসিকতা করা হবে বুঝব।

ট্রেন ক্রমে পরেশনাথ স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বরাকর নদী আমরা দেখে ফেলেছি। দুধারে নদীর সেই অনন্ত বালুরাশি, আমার চোখের ওপর এক মরুভূমি সদৃশ ছবি ভেসে উঠছে—আমি কি করব ইতু, মনের ভিতর আমার অনন্ত এক কালপ্রবাহ ভেসে বেড়ায়। আমি আমার ইচ্ছার কথা কোনদিন কাউকে বলতে পারি না। সুবল চুপচাপ বসে বসে সেই অনন্ত কালপ্রবাহের সামান্য আঁচ ইতুর চোখে আবিষ্কারের চেষ্টা করল।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিল। দুপাশে পাহাড়ের ছবি। পলাশফুল ফুটে আছে চারধারে। পাহাড়ের মত টিবিগুলোতে হাজার হাজার পলাশ গাছ, গাছে গাছে লক্ষ লক্ষ ফুল আবিরের মত সমস্ত আকাশের ভিতর আগুনের জাফরি হয়ে আছে। সুবল চোখ বুজে থাকল।

শৈশবের সেই সব দিন, বাবা গান-বাজনা খুব পছন্দ করতেন। বাবার পুরনো এস্রাজ ছিল একটা। বাবা রাতে যখন কেউ জেগে থাকত না, তখন চুপচাপ বসে থাকতেন জলসাঘরে। ঝাড়-লণ্ঠনে হাজার মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হত সেই জলসাঘরে। বাবা একা তান এবং লয়ের ভিতর ডুবে পারাপারের সেতু তৈরি করতেন—এখনও যেন চোখ বুজলে সুবল সব টের পায়। ক্রমে এই সংসার দীন থেকে দীন হয়ে যেতে থাকল, বাবা হতাশায় মারা গেলেন, বন্ধু-বান্ধবহীন এই কলকাতা নগরীকে দুঃস্বপ্নের ছবির মত মনে হল। তখন সুবল কেমন একেবারে ভালমানুষ হয়ে গেল। তবু বুঝি রক্তে সেই নীল অহঙ্কার রয়েছে সে কোনদিন খোসামোদপ্রিয় ছিল না। যা বিদ্যা, সে তাতে করে উঁচু পদের একটা চাকরি সংগ্রহ করে নিতে পারত। কিন্তু সম্মানের সঙ্গে এবং ভালবাসার সঙ্গে সে শিক্ষকতার কাজ করতে পেরে সুখী। বাকি সময়টা বাবার গান-বাজনার সাধ-আহ্লাদকে রক্তের ভেতর বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

সুবল ইতুর দিকে তাকিয়ে বলল, এই আমার ভাল।

ইতু পা তুলে বসেছিল। কাপড়টা একটু উঠে গেছে। ইতু দু আঙুলে আলগোছে কাপড় টেনে পা ঢেকে দিল। তারপর বলল, আচ্ছা সুবলদা, তুমি আমাকে দেশের এত কথা বলেছ, দীপুর কথা তো কিছু বলনি।

—বললে তুমি তখন বিশ্বাস করতে? সুবল বুঝল, এই ট্রেনে ইতু আজ বড় বেশি কাছের হয়ে গেছে। তুমি তুমি করছে।

—কেন করতাম না বল?

তুমি তো আমাদের একটা মঠ ছিল বললে হাসতে, আমার একটা টিয়াপাখি ছিল বলাতে তুমি আজ মুখ-চোখ কেমন করে ফেললে।

সুবলদা, সবটা সত্য ভাবতে! ইতু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

নির্জন এই ছোট স্টেশনে ওরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এখন ট্যুরিস্টদের আসার সময় নয়। সামান্য যাত্রী স্টেশনে নামল। বাড়ি থেকে হ্যারিকেন নিয়ে ভোলা এসেছে। সে দিদিমনিকে দেখতে পেয়ে দাঁত বের করে হেসে দিল। সুবল এবং ইতু স্টেশন থেকে নেমে নির্জন পথ ধরে হেঁটে চলল। সুবল ভেবেছিল, হাজারিবাগ রোড শহর হবে। কিন্তু এখন মনে হল একেবারে গ্রাম্য জায়গা। ইলেকট্রিক এসেছে। ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। সাজানো ঘর-বাড়ি—সবই খালি পড়ে আছে। সুন্দর সাজানো-গোছানো সব বাড়ি। এইসব বাংলো প্যাটার্নের বাড়ির ভিতরে এখন নানারকমের ফুল ফুটে আছে। বাড়িগুলোতে কোন মানুষজন নেই। কোথাও কোন আলো জ্বলছে না। কেবল আউট-হাউসে আলো আছে। মালি অথবা দারোয়ানদের ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে।

সুবল যেতে যেতে বলল, কি নিরিবিলি জায়গা!

ইতু বলল, এখন শীতের শেষ। ট্যুরিস্টরা নেই। পুজোর পর এলে দেখতে পেতে এইসব বাড়িগুলোতে মানুষজনে কি গম গম করছে।

ওরা কাঁকুরে মাটির পথ ধরে হাঁটছিল। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই, কারণ শীতের আকাশ। মাসটা বোধ হয় ফাল্গুন মাস। যতটা ঠাণ্ডা পড়ার কথা ঠিক ততটা ঠাণ্ডা নেই। সুবলের এমন একটা নিরিবিলি জায়গা বড় ভাল লাগছিল। গ্রাম ছেড়ে আসার পর এই কলকাতার ঘিঞ্জি গলি ওকে বিব্রত করত। এই সন্ধ্যায় ইতু পাশে আছে, দূরে ট্রেনের শব্দ, গাছের ছায়া মাথার ওপর এবং দুপাশের বড় বড় খালি বাড়ি থেকে ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছে।

সুবল বলল, বড় ভাল লাগছে ইতু।

ইতু বলল, পৃথিবীতে এর চেয়ে প্রিয় জায়গা আমার নেই।

—তুমি এখানে বড় হয়েছ। ভাবতে ভাল লাগছে।

—এসব জায়গায় বিকেলে আমরা সুন্দরমামার সঙ্গে ছুটে বেড়িয়েছি। দু

পাশে কি গাছের পর কোন্ গাছে আছে, গাছের নাম কি, ফুলের নাম কি, আমি সব বলে দিতে পারি। এই যে গাছটা দেখছ, বলে ইতু হাত তুলে বলল, এখানে একবার দুজনে জোড়ায় গলায় দড়ি দিয়েছিল।

সুবলের গা-টা কেমন ছম ছম করতে থাকল। পাশেই মাঠ পার হলে একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ি। ওরা ইঁটখোলা বাঁয়ে রেখে দ্রুত হাঁটতে থাকল।

আমার কিন্তু কোন ভয় করে না সুবলদা। ওরা কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসে এমন একটা ভালবাসার গাছে ঝুলে পড়েছিল।

—গাছটা কি গাছ।

—গাছটা বকুলফুলের গাছ। ইতু সুবলের পাশে পাশে হাঁটছে। কি ভেবে বলল—জান সুবলদা, গাছটায় আমরা কোন-কালে ফুল ফুটতে দেখিনি। কিন্তু এই অপমৃত্যুর পর গাছটা সব সময় ফুল ফোটাতে থাকল।

সুবল কোন কথা বলল না। সে শুধু পিছন ফিরে গাছটা দেখল। গাছটার ডালপালা মাটির খুব কাছাকাছি ছড়িয়ে আছে।

ইতু বলল, এখানে আগে ট্যুরিস্টরা মাঠ পার হয়ে দূরের সব পাহাড়ে চলে যেত বেড়াতে। অথবা বালির যে মাঠ দেখছ সামনে—দেখ কি সাদা দেখাচ্ছে, কি ধবধবে, এমন জ্যোৎস্না তুমি আর কোথাও দেখবে না সুবলদা। আশ্বিনের শেষে এলে দেখতে পেতে যুবক-যুবতীরা এই গাছটার নিচে ভিড় করেছে। একটা ফুল গাছ থেকে উড়ে এসে পড়বে, আর ওরা সেই ফুল ধরার জন্য কি হুটোপুটি। গাছটা সেই থেকে ভালবাসার গাছ হয়ে আছে।

—বিয়ের পর তুমিও তোমার ভালবাসার মানুষটিকে নিয়ে বসতে পারবে। ফুলের জন্য তোমরাও গাছের নিচে ছুটে বেড়াতে পারবে।

ইতু বলল, এত পরিচ্ছন্ন আকাশ আমার সহ্য হয় না জানো!

সুবল বলল, আর কতদূর হাঁটতে হবে ইতু?

—আমরা এসে গেছি।

ভোলা কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল বলে মোড়টায় দাঁড়িয়ে পড়ল। সুবল এবং ইতু একটু পিছনে পড়ে গিয়েছিল। বাড়ি ঢুকে সুবল মাসিমা এবং মেসোমশাইকে প্রণাম করল।

বাড়িটা বড় বাড়ি। একসময় ওদের পিতৃদেব রায় বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন। বাড়িটা দেখলেই প্রাচীন সব ইংরেজ আমলের কুঠির মত মনে হয়। ভিতরে একটা বড় দিঘি আছে, এত বড় বাড়ি ইতুদের, সুবল আন্দাজ করতে পারেনি। এত বড় বাড়িতে এই যুবতীকে কেমন অসহায় মনে হতে থাকল। বাড়ির একটা অংশই ব্যবহার করা হয়। খাবার-দাবার হয়ে গেলে ইতু

বলল, চল, তোমাকে বাড়িটা দেখাই।

সুবল বলল, কাল দেখব। সারাদিনের ট্রেন-জার্নি, শরীর সায় দিচ্ছে না। তুমিও তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়। নয়তো শরীর খারাপ করবে।

ইতু পাশের ঘরে ঢুকে দরজা-জানালা খুলে দিল। একমাত্র চাকর ভোলা। মা এবং বাবার ঘর পাশে। কাল মাসিমারা হাজারিবাগ থেকে চলে আসবেন। কাকা-কাকীমারা আসবেন অণ্ডাল থেকে। তখন এই বাড়ি এত নির্জন মনে হবে না। বাবান্দায় বসে বাবা এখন তামাক খাচ্ছেন, গড়গড়ায় শব্দ হচ্ছে গুড়ুক গুড়ুক। নির্জন এই রাত্রিতে সেই শব্দ প্রায় নৈঃশব্দের প্রতীক যেন।

ইতু বলল, জানলাটা খুলে রাখব।

—রাখো।

—এখানে জল থাকল। ডানদিকের দরজা খুললে বাথরুম পাবে। বলে ইতু দরজা ভেজিয়ে চলে গেল।

সুবলের কিন্তু ঘুম এল না। জানালা দিয়ে মাঠ দেখা যায়। কিছু গাছগাছালি চোখে পড়ছে। পাশের ঘরে ইতুর গলা পাওয়া যাচ্ছে। সে ইতুর পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সারা বাড়িময় যেন এখন ইতু ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে আজ ইতুর দিকে যতবার তাকিয়েছে, ইতু ততবার কেন জানি সংকোচে এবং লজ্জায় ভালভাবে তাকাতে পারেনি সুবলের দিকে। সুবল ইতুর এমন চোখ কোনদিন আবিষ্কার করতে পারেনি। দীপুরা চলে যাওয়ার পর থেকে ইতুর কি যেন পরিবর্তন, বেশ মনে আসছে ছবিটা। প্রথম আনন্দদা যেদিন ইতুর সঙ্গে পরিচয় কবিয়ে দিচ্ছিলেন, ইতু বড় বড় চোখে সুবলকে দেখছিল। নিরীহ মাছের মত চোখ নিয়ে তাকে দেখছে। সেই ইতু কেমন ধরা গলায় বলল, তুমি আমার সবটাই সত্য ভাবতে।

ভোরবেলা বেশ হৈ-চৈ করে কেটে গেল। সুবল এ-বাড়ির আপনজন। সে দু-বার স্টেশনে গেছে। বাজারে গেছে। ইতুকে বলেছে, তুমি বাপু আজ বেশি ছোটাছুটি করবে না। ধীর স্থির বালিকার মত বসে থাকবে।

কাকা-কাকীমারা এসেছেন। ইতুর মাসিমা এসেছে। ওদের ছেলেপুলেরা এসেছে। বাড়িতে বড় মাছ এসেছে, মাছটা ভোলা বারান্দায় ফেলে কাটছে। সুবল ছেলেপুলেদের নিয়ে বড় বড় সব পেয়ারাগাছে উঠে সবাইকে পেয়ারা পেড়ে দিয়েছে। ইতু দুবার এসেছিল পেয়ারাতলায়। সুবল বলেছে, রোদ লাগাবে না মুখে। মুখের রঙ তবে কালো হয়ে যাবে। এমন সুন্দর মুখ কালো দেখালে বুড়ী ঠাকুমার পছন্দ হবে না।

ইতু বলেছে, সুবলদা, কোন্ শাড়ি পরব?

—লাল রঙের শাড়ি পরবে।

—যা! লাল রঙ মানাবে কেন?

—ওরা বিকেলে আসবে। তখন সূর্য অস্ত যাবার সময়। মুখের রঙ তবে তোমার তাজা দেখাবে। তারপর সুবল থেমে বলেছে, এখানে ভাল রজনীগন্ধা কোথায় পাওয়া যাবে?

—অসময়ে রজনীগন্ধা দিয়ে কি হবে?

—বাঃ, তুমি খোঁপায় পরবে না?

—আমার ভাল লাগছে না সুবলদা, ভয় করছে।

—আরে আমি তো আছি। ভয় কি তোমার! কোথায় ফুল পেতে পারি বল তো?

—ফুল তুমি আর এখানে পাবে না।

—আমি পাব না সে হয়! বলে সে দু লাফে গাছ থেকে নেমে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। যেন সে এ-গাঁয়ের ছেলে। সকলেই তার পরিচিত। সে যে দিকে ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে এবং যে পথের দুপাশে বড় বড় সব বাড়ি, কেয়ারি-করা ফুলের বাগান, বাগানের চারপাশে বোগেনভেলিয়ার ঝাড় আর দুপাশে কি সুন্দর সুন্দর সব মার্বেল পাথরের সব স্ট্যাচু—সে সব ফেলে কিছু রজনীগন্ধার জন্য ছুটতে থাকল। একটা কি গাছ যেন, মেহগনি হবে অথবা জলপাইগাছ হতে পারে, সে চিনতে পারছে না, তার পাশে ছোট গেট—বাড়ির নাম 'গুপ্ত নিবাস', নিবাসের মালি মাটি খুঁড়ে জল দিচ্ছে, পাশে বাগানের ভিতর মোতি ফুলের গাছ এবং তার পাশেই কিছু রজনীগন্ধার ঝাড়। শীতের জন্য ফুল তেমন ফোটেনি, তবু কিছু ফুল আছে যা তুলে নিলে ইতুর পছন্দ হয়ে যাবে। সে মালিকে বকশিশ দিয়ে, একটা কলাপাতায় ফুল তুলে নিল। কিছু ফুল এনে মাসিমাকে দিয়ে বলল, ইতুর জন্য এনেছি। ইতুর এক মাসতুতো বোন অচলা, ইতুর চেয়ে বয়সে বড় হবে, তার কাছে গিয়ে বলল, কত সুন্দর মালা গাঁথতে পারেন দেখা যাবে।

এই বাড়ি প্রায় প্রাসাদের মত। সদর গেটে ভোলা বসে আছে। গাড়ির শব্দ পেলেই সে এসে খবর দেবে। সুবল বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসেছিল। সারা বিকেল সে ইতুকে দেখেনি। ফুল এনে দেবার পর থেকে ইতু যেন এই বাড়ির কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। সে বার বার এধার ওধার খুঁজেও ইতুকে দেখতে পায়নি। দুবার দুটো ছেলেকে ডেকে বলেছে—হ্যাঁরে, তোদের দিদি কোথায় রে? উত্তরে বলেছে ওরা—জানি না তো সুবলদা। দেখে আসব?

সুবল বলছে, না থাক। তোরা বরং ক্যারামটা বের কর। বসে বসে খেলা যাবে। ঠিক সেই সময় গাড়ির শব্দ। সুবলের বুকটা কেমন কেঁপে উঠল। কি ভয়

যেন ভিতরে। কারা যেন ওর আপনার জনকে কেড়ে নিতে এসেছে। কিন্তু সে মুখ সহাস্য রাখল। সে এ বাড়ির বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। আনন্দদার অগাধ বিশ্বাস তার ওপর। ঘরের চোর ননী চুরি করে খেলে কে কাকে আর রক্ষা করে। সুতরাং মুখে-চোখে সব সময় এমন একটা ভাব—যারা আসছে ইতুকে দেখতে, তাদের সুখ-সুবিধা, তাদের মান-সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব তার। কোথায় বসানো হবে, কোথায় মেয়ে দেখানো হবে এবং কখন দেখানো হবে উঠে গিয়ে প্রায় ঠিক করে ফেলবে। এমন সময় দেখল দীপু ছুটে ছুটে আসছে। সে প্রথম বিস্মিত হল! দীপু এখানে কেন? তারপর সে অবিনাশকে দেখতে পেল। তারপর কাকীমা ধরে ধরে একজন বৃদ্ধাকে আনছেন। অমল আসছে সকলের পিছনে। সুবল কথা বলার সুযোগ পেল না। সকলেই প্রায় হতবাক। সুবল ছুটে গিয়ে বলল, আপনারা ভিতরে যান কাকীমা। আমি দিদিমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

কাকীমা বললেন, তুমি এখানে?

সুবল বলল, আপনারা এখানে?

—আমরা এখানে অমলের জন্য পাত্রী দেখতে এসেছি।

—আমি এখানে পাত্রীকে দেখাতে এনেছি।

কাকীমা বললেন, কে সেই মেয়ে?

—আমার সঙ্গে যে মেয়ে এসেছে। নাম তার ইতু।

—কিন্তু আমরা তো দেখতে এসেছি শ্যামলীকে।

—ওটা ওর কলেজের নাম।

বৃদ্ধা বললেন, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস রে?

—তুমি চেন না মা। আমাদের বড়বাবুর ছেলে সুবল।

—ওরা তো শুনেছিলাম পাকিস্তান থেকে আসবে না।

—চার পাঁচ বছর আগে রায়ট হল না, সেই রায়টের সময় বড়বাবু এক জামা-কাপড়ে চলে এসেছেন।

—ও মা, তুমি আমাদের বড়বাবুর ছেলে সুবল! কি আমার ভাগ্য! বলে তিনি সুবলের মুখে চিবুক ধরে আদর করতে থাকলেন। ইতু দোতালার জানলার শার্সি খুলে সব দেখছিল। দীপুকে দেখে এবং অবিনাশকে দেখে সে তার সন্দেহ যে ঠিক তা টের করতে পেরে কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল। সুবলদা ওদের প্রণাম করছেন। সে সুবলদাকে পেটি এক অধ্যাপক ভেবেছিল। ভালমানুষ এই সুবলদা—ওর প্রতি কি যেন এক খেলা ছিল ইতুর, সময়ে-অসময়ে সুবলদা কাছে না থাকলে ভাল লাগত না, দু'দিন দেখতে না পেলে, ওদের সেই বাগমারি অঞ্চলে ছোট তিন কোঠার প্রায় পায়রার খোপের মত বাড়িতে যেত। কিন্তু কোনদিন স্বপ্ন দেখতে

শেখেনি সুবলদাকে নিয়ে। বরং সুবলদার বড় বড় কথা, ওর ঠাকুর্দা হাতি পুষত, ওর বাবার বড় কালো রঙের একটা ঘোড়া ছিল, ঠাকুর্দার চিতায় মঠ প্রতিষ্ঠার সময় দু পরগণার মানুষ ভোজ খেয়েছে, হ জার লক্ষ টাকা—দাস-দাসী প্রায় সবই স্বপ্নের মত—সুবল কিছু বলতে গেলে হাসত ইতু। যেমন রিফুজিরা বলে, দুটো বাগান ছিল আমের, নদীর চর ছিল একটা, তরমুজের জমি ছিল কানি খেত জুড়ে, আর ছিল দিঘির মত পদ্মদিঘি। সব রিফুজিদের এক কথা। কিন্তু এই সুবলদা এখন যেন রাজার মত। এই বৃদ্ধা ওর নসিবের মালিক। চারটে কলিয়ারীর একমাত্র উত্তরাধিকারীর পাত্রী মনোনয়ন করার মালিক। সেই বৃদ্ধা এখন সুবলের মুখে হাত দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছে।

ঘরে বসেছিল সবাই। এখন ইতু আসবে। কেমন সাজ-গোজ করল ইতু, খুব দেখার ইচ্ছা সুবলের। সে বারান্দায় পায়চারি করছে। ইতুর আসতে দেরি দেখে অবিনাশ এবং কাকীমা ছটফট করছিলেন। দীপু বাইরে দাঁড়িয়ে সুবলদার সঙ্গে দেশের সব অতীত ইতিহাস টেনে কথা বলছে, তখন এমন একটা সময় ছিল, যেন বলার ইচ্ছা, সুবলদা, সব বৈভবের ভিতর তোমার মুখ কেবল দেখতে পাই। মা কেমন হয়ে গেছেন। তোমাদের কথা মা ভালভাবে শুনতে চান না। সে যেন অতীত একটা ঘটনা। জলের মত। নদীর জল যেমন নেমে আসে, কোন দাগ রেখে আসে না—যেখানেই সে যায়, আপন মহিমায় সে নির্মল হয়ে যায়। দীপুদের কেন যে ভাবল—পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং শপথ এখন আমার মনে থাকার কথা নয়। আমি আপন মহিমায় নির্মল হয়ে আছি।

দীপুর মুখে কত রকমের রেখা ফুটে উঠছিল। সে শুধু বলল, তোমাকে এখানে দেখব আশাই করতে পারিনি।

সুবল অন্যমনস্ক ছিল। বোধ হয় ভিতরে কিছু হয়েছে। সে দীপুকে বসতে বলে ভিতরে চলে গেল। দেখল সবাই ইতুকে ঘিরে কি যেন বোঝাচ্ছে।

—এ কি ইতু, তুমি এখনও সাজ-গোজ করনি!

অচলা বলল, কি জানি, দেখুন দাদা। মাথা গুঁজে সেই যে বসে আছে কিছুতেই উঠছে না।

—এসব আনন্দদার লাই পেয়ে হয়েছে। কাউকে মেয়ে সমীহ করে না। এত স্বাধীনতা কি মেয়েদের ভাল? বলে সুবল ধমকে উঠল, ইতু এসব কি হচ্ছে? তুমি কি মাসিমা-মেসোমশাইয়ের সম্মানটুকু রাখবে না? লোকে শুনলে কি বলবে?

মাসিমার প্রায় কান্না এসে গেছে গলায়।—বল তো সুবল, এমন হীরের টুকরোর মত ছেলে, কি সুন্দর দেখতে, কি দৌলত তার, আমরা ওদের কাছে কিছু না—বলে তিনি থেমে গেলেন। যেন বলার ইচ্ছা ছিল, গরিব। তিনি বলতে গিয়ে

বলতে পারলেন না। এমন ছেলে হাত-ছাড়া হলে সারা জীবন হাত-পা কামড়াতে হবে।

সুবল বলল, ইতু!

ইতু তাকাল।

—জামা-কাপড় পাল্টে নাও।

এমন গম্ভীর গলা যেন এই প্রথম শুনল সুবলদার। সে আর সাহস পেল না। এই মানুষ এমনভাবে কথা বলতে পারে! ভিতরে ভিতরে এক প্রচণ্ড অভিমান ইতুর ; তুমি সুবলদা বড় চতুর। সব খেলা সাঙ্গ হলে তোমাকে আমি রাজারানীর খেলা দেখাতে পারি। প্রচণ্ড অভিমানে ইতুর হাত-পা কাঁপছিল। সে উঠে চলে গেল। সাজ-গোজ করাবার জন্য অচলা গেল সঙ্গে।

সুবল এসে বলল, হয়ে গেছে। আসছে। কাকীমার কাছে সে আর একটু সময় চেয়ে নিল।

যখন ফিরে এল তখন ইতুকে আগের ইতু বলে চেনাই গেল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। লাল আভা ঘরে। লাল রঙের দামী বেনারসী, সেই সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ, মুক্তো বসানো চাকতির মত গোল গোল ফুল ফুটে আছে ব্লাউজে। চোখে টানা কাজল। চুল এলো করা কোঁকড়ানো চুলের ভিতর ইতুর মুখ প্রতিমার মত দেখাচ্ছে। ইতু কারো দিকে তাকাল না। সে সোজা অচলার পিছনে ঘরে ঢুকে গেল। সুবল বসেছে অমলের পাশে। দেখে এখন মনে হয় যেন সুবল অমলের হয়ে পাত্রী দেখতে এসেছে। মেসোমশাই এলেন। মাসীমা এবং অন্য আত্মীয়-স্বজন দরজায় ভিড় করে আছে। অমলের ঠাকুমা হাত দিয়ে চুল দেখলেন ইতুর। মুখখানা তুলে ধরতেই কেমন অভিমানের চোখ ভেসে উঠল ইতুর অথবা ভয়ের চোখ—যেন এখন ইতু প্রায় এক শশকের মত, ভীত শশক শিকারিদের পাল্লায় পড়ে নিরন্তর যেন ছুটছে।

কাকীমা, দীপু, অবিনাশ অথবা অমলের ঠাকুমা কেউ কোন প্রশ্ন করছেন না ইতুকে। ওরা যা দু একটা কথা বলছেন, হয় সুবলের সঙ্গে না হয় ইতুর বাবা অধীরবাবুর সঙ্গে।

অচলা বলল, কিছু বলবেন না ওকে?

অবিনাশ বলল, সুবলের পরিচিত—প্রায় বোনের মত মেয়ে—আনন্দবাবু আমাদের দেশের গৌরব—তার বোন—আমাদের আর কিছু দেখার নেই।

কাকীমা বললেন, সুবলকে আমরা জানি।

দীপু বলল, এমন মানুষ যখন আপনাদের রেফারেন্স, তখন দেখা-অদেখার ব্যাপারটা সামান্য।

দীপু তবু ঠাট্টা করে অমলের দিকে তাকিয়ে বলল, কি গো অমলদা, তোমার চোখ যে আর পড়ছে না।

অমল স্মিত হাসল।

অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাস। তবু ইতু ঘেমে যাচ্ছে।

সুবল বলল, ইতু তবে যেতে পারে কাকীমা।

—হ্যাঁ, বসে থেকে আর কি হবে!

তবু একবার বৃদ্ধাকে কিছু সম্মানের সঙ্গে বলতে হয়। কাকীমা নিজেই বললেন, মা, ইতু যাবে?

—এমন লক্ষ্মী মেয়ে তোমাদের! আহা, কি সুন্দর মুখ! আমার অমলের কি ভাগ্য! সুবল তুই কত বড় হয়ে গেছিস। সুবলের মুখে মাথায় ফের হাত রাখলেন।—কত বড় ঘর ছিল তোদের, তোর বাবার কত বড় মন ছিল, তুই সুবল জানিস না। এমন মানুষের ছেলে যখন আপনাদের ঘরে আছে, তখন আর দেরি নয়। বৈশাখেই আমরা শুভ-কাজ আরম্ভ করে দিতে চাই। সুবল তুই কি বলিস?

—বৈশাখ মাস। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

দীপু বলল, দেরি কোথায়? মাঝে তো একটা মাস।

সুবল বলল, শুভ-কাজ যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল।

কাকীমা বললেন, তুমি বললে আমরা আরও তাড়াতাড়ি করতে পারি। বলে সুবলের দিকে সকলে নিবিষ্ট হল।

ইতু ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ তুলে সুবলের মুখ সুযোগমত দেখবার সময় বুঝল মানুষটার এতটুকু এ-ব্যাপারে আসছে যাচ্ছে না। কেমন নির্বিকার বসে আছে! কি নিষ্ঠুর তুমি সুবলদা। তুমি কি পাগল, তুমি মনে কর আমি তোমার মন জানি না!

অবিনাশ বলল, সুবল তোমাদের ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা।

ইতু মনে মনে বলল, তুমি শেষে আমার গার্জিয়ান হয়ে গেলে! সব কথা ওদের তোমার সঙ্গে।

দীপু বলল, আমার ইচ্ছা আষাঢ়ে হোক।

—কেন, এত দেরি কেন? সুবল প্রায় ক্ষেপে যাবার মত কথাটা বলল।

—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে কি গরম বল।

—আষাঢ়ে কি গরম থাকে না?

—তখন বৃষ্টি পড়লে ঠাণ্ডা হবে দেশ। আমরা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বরযাত্রী আসব।

সুবল বলল, সে তোমাদের সুযোগমতই সব হবে।

ইতু উঠে চলে গেল। সবার অনুমতি নিয়ে সুবল ইতুকে ভিতরে পাঠিয়ে দিল। মিষ্টি এবং জল এল। সাদা পাথরের থালায়, সাদা পাথরের গ্লাসে। কথা আছে, ওরা রাতের আহার এখানেই সেরে যাবে। অধীরবাবুর এই আগ্রহটুকু ওরা ফেলতে পারল না। ইতু চলে গেলে সুবল ইচ্ছা করে নিজেই দেনা-পাওনার কথা বললে, অবিনাশ প্রায় ধমকে উঠল—সুবল, তুমি কি! আমাদের কিছু দাবি-দাওয়া নেই। শুধু বিয়েটা দিয়ে দেবে।

সুবল বলল, আনন্দদার একমাত্র বোন। ছোট বোন। মেসোমশাইয়ের বলতে গেলে শেষ কাজ। আমরা কোন ত্রুটি রাখব না অবিনাশ, এটুকু তোমাকে কথা দিতে পারি।

—সে তোমাদের ব্যাপার, তোমরা যা ভাল বুঝবে করবে।

—অমলবাবু, আপনি তো কিছু বলছেন না! আপনি তো এখানে এই সভায় প্রায় পাণ্ডবপুত্র অর্জুনের মত নায়ক। আপনি চুপ থাকলে চলবে কেন?

—আমি অর্জুন হলে সুবলবাবু, আপনাকে কিন্তু যুধিষ্ঠির বলতে হয়। যেভাবে সব কাজ দেখে-শুনে করে যাচ্ছেন, মনেই হয় না এটা আপনার অনাত্মীয়ের বাড়ি।

সুবল বলল, আনন্দদা আমার গার্জিয়ান। আমি ইতুর গার্জিয়ান। ভয়ঙ্কর দুষ্টু মেয়ে। ভয়ঙ্করভাবে আমাকে পীড়ন করছে চার বছর ধরে। এবার আপনার হাতে তুলে দিতে পারলে মশাই নিষ্কৃতি পাই।

অবিনাশ বলল, তুমি সুবল, বড় স্বার্থপর দেখছি হে! দুষ্টু মেয়েকে বনবাসে দিতে পারলে বেঁচে যাও বলে সে হো হো করে হেসে উঠল।

সুবল কিন্তু হাসতে পারল না। এতে ইতুর আবার কোন নিন্দা করে ফেলল না তো! সে তাড়াতাড়ি শুধরে দিল, কাকীমা, আমাদের ইতু বড় লক্ষ্মী মেয়ে। যে সংসারে যাবে, সে সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে ভরে যাবে।

দীপু বলল, এবার সুবলদা আপনি থামুন। সেই যে প্রশংসা আরম্ভ করেছেন, গাড়িতে, বাড়িতে, আর এই সভাতে কেবল ইতুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমরা তো মেয়ে। আমাদের এত প্রশংসা কিন্তু কানে লাগে। বস্তুত সুবল কি বলতে হয়, কি বললে ইতুর যথার্থ পরিচয় দেয়া যাবে, ভেবে উঠতে পারছে না। সে চুপ করে গেল। খাওয়া হয়ে গেলে সে দীপুকে নিয়ে বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখাল। চক-মেলানো বাড়ি। পিছনে একটা ঝিল আছে, তারপর নতুন দুটো বাড়ি উঠছে, বাড়ি পার হলে শুধু দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। সুবল বলল, কি আশ্চর্য জ্যোৎস্না দেখ। সে সেই মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে দূরের মাঠ এবং রহস্যময় জ্যোৎস্না দেখবার সময় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

দীপু বলল, সুবলদা, আপনাদের সেই পায়রার ঘরটা আছে?

—কি করে বলব বল?

—ময়ূরের ঘরটা?

—এসব মনে পড়ছে কেন?

—আপনি আমাকে একবার পায়রাদের ঘর পার করে বড় বকুলগাছটার পাশে নিয়ে কি বলেছিলেন?

সুবলের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে বলল, তখন এত সব বুঝতাম না দীপু।

তখন ভিতর বাড়িতে ইতু সুবলকে সব ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায় গেল মানুষটা? দীপুদি কোথায়? কে এসে বলল দীপুদিকে নিয়ে সুবলদা মাঠে জ্যোৎস্না দেখতে গেছে। ইতু কেমন ছটফট করতে থাকল। সে তার সাজ খুলে ফেলল। মুখের প্রসাধন মুছে ফেলল। সবার খাওয়া না হওয়া পর্যন্ত সে ছাদে উঠে দূরের মাঠে কিছু আবিষ্কারের প্রত্যাশায় পায়চারি করতে থাকল।

যত পায়চারি করতে থাকল তত আবেগে এবং অভিমানে বুক ভরে উঠতে থাকল। কার ওপর এই অভিমান? ইতু এ-মুহূর্তে ভেবে পেল না। তবু যেন সব নষ্টের গোড়া এই সুবলদা, ভালমানুষের মুখোশ পরে সব সময় সে তার পাশে ঘোরা-ফেরা করছে। ইতু রাগে গর গর করছে। কেবল ওদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় সে আছে। ওরা চলে গেলেই একটু নির্জনতা খুঁজে সুবলকে নিয়ে পড়বে। তুমি কোথাকার কে হে! তুমি আমার ভালমন্দ বলার কে হে! আমার বাবা আছেন, দাদা আছেন—তুমি কে আমার! সুতরাং ওরা সবাই চলে গেলে ইতু ছাদ থেকে নেমে সুবলকে ধরার জন্য বারান্দায় আসতেই দেখল বাবা সুবলদার সঙ্গে কি এক কথায় হো হো করে হাসছেন। সুবলদাও হাসছে। ইতুকে দেখেই অধীরবাবু বললেন—যা মা, সুবলের বিছানাটা করে দে। বেচারা সারাদিন খেটেছে। বেশি রাত না করে শুয়ে পড়ুক।

বিছানা করে ইতু ফিরে এসে দেখল বারান্দা ফাঁকা। বাবা নেই। সুবলদা নেই। বাবা সুবলদা আমলকী গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে কি যেন খুঁজছেন অথবা গোপন সব কথাবার্তা বলছেন। ইতু ভাবল, এ-ফাঁকে খেয়ে নেওয়া যাক। সে খেতে চলে গেল এবং খাওয়া হলে সে ফের মানুষটার খোঁজে এসে দেখল, শুধু বারান্দায় বাবা বসে তামাক খাচ্ছেন। জ্যোৎস্না তেমনি আমলকী গাছের মাথায়, নিঃশব্দ এক ভাব, একটা মালগাড়ি যাচ্ছে, তার টংলিং টংলিং শব্দ। সে সুবলদাকে খোঁজার জন্য বারান্দা পার হয়ে আউট-হাউসের দিকে যাবার সময় দেখল বাবা তাকে ডাকছেন। —যা ইতু, এবার শুয়ে পড়।

ইতু বলল, সুবলদাকে দেখছি না।

—ও শুতে চলে গেছে।

ইতু তাড়াতাড়ি করল না। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে আজ সুবলের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করবে ভেবে রেখেছে। ভিতরে এক অন্তর্দাহ। সে সব প্রকাশ করতে পারছে না। আমি লক্ষ্মী, আমার লক্ষ্মীশ্রী আছে, আমাকে ঘরে তুললে শ্রীময়ী হবার সম্ভাবনা—তুমি এসব বলার কে? কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখল, জানালা খোলা। মৃদু আলো জ্বলছে। নীল অথবা সবুজ রঙের আলো। মশারি চাঁদোয়ার মত করে রাখা। মানুষটা কেমন শিশুর মত অথবা অসহায় মানুষের মত পা গুটিয়ে শুয়ে আছে। শীত ক্রমে বাড়ছে। স মান্য কম্বলে বোধ হয় সুবলদার শীত কাটছে না। সে ঘুমের ভিতরও শীত শীত অনুভব করছে। তাড়াতাড়ি ইতু আর একটা কম্বল নিয়ে এসে পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল সুবলের। মশারি ফেলে গুঁজে দিল। তারপর চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে জানালায় সাদা জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে মানুষটার জন্য সহসা এক অসীম ভালবাসা আবিষ্কার করে নিজের ভিতরেই নিজে গুটিয়ে গেল। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। দু-একটা চুল এসে পড়ছে মুখে। মানুষটার জন্য ভিতরে ভিতরে কি যেন এক মায়া—সে চার বছর ধরে দেখে এসেছে মুখচোরা এই মানুষ নিজের জন্য কিছুই চাইতে জানে না। শুধু এক জাদুর মত ভালবাসা-বাসি, দূরের কোন বালিয়াড়িতে পায়ের ছাপ রেখে যাবার মত অজ্ঞাতে মায়া জড়িয়ে দিয়েছে। ইতু ধীরে ধীরে মানুষটার মাথায় হাত রাখল। কপালে হাত রাখল। তারপর আপন মনে জানালার দিকে তাকিয়ে আমলকি গাছের মাথায় বড় চাঁদ দেখতে দেখতে কেঁদে ফেলল।

সুবল বাড়ি ফিরে মাকে, দীপু এবং অবিনাশদের সম্পর্কে কিছুই বলল না। মা-র কেমন একটা অভিমান ওদের সম্পর্কে দিন দিন গড়ে উঠেছিল। এই চার বছরে লাবণ্য একবার খোঁজ নিতে পর্যন্ত এল না। শশী ঠাকুরপোর স্বপ্ন, দীপু বড়বাবুর পুত্রবধূ হবে, বড়বাবুরও এ-ব্যাপারে উৎসাহের অন্ত ছিল না—কিন্তু এখন মনে হয় শশীকাকা বেঁচে থাকলে এটা তার কাছে এখন দুঃস্বপ্নের মত মনে হত। কাকীমার ব্যবহারেও কোথায় যেন সেই আন্তরিকতার অভাব ছিল যা সুবলকে পীড়িত করেছে। সে সেজন্য মাকে ফিরে এসে কিছুই বলল না। নিবিষ্ট মনে খাতা দেখার সময় সামনের পার্কে কিছু ফুল ফোটার কথা ভাবল। বসন্তকাল এখন। ফেরার পথে ইতু সারা ট্রেনে দুটো একটার বেশি কথা বলেনি। ইতু কেমন শান্ত এবং সতী-সাধ্বীর মত মুখ নিয়ে সব সময় বসে থেকেছে। সে দু একবার অমলের প্রশংসা করার সময় দেখেছে ইতুর চোখ বড় উদাসীন। অমন ছেলে হয় না, কি চেহারা, রাজপুরুষের মত চেহারা। সুবল আন্তরিকভাবে অমল সম্পর্কে

গুণগান গাইছিল—কিন্তু সেই এক মুখ, যেন জলের অতলে তার কি এক অসামান্য বস্তু হারিয়ে যাচ্ছে—সুবল চোখে সামান্য অন্ধকার দেখতে পেল। নিবিষ্ট মনে যত খাতা দেখবে ভাবছে, তত ইতুর এক অসহায় কোমল মুখ চোখের ওপর ভাসছে।

আর তখন রান্নাঘরে মা এবং অন্য কে যেন, বোধ হয় ইলু-বিলুর কেউ বন্ধু হবে, মা তাকে আদর করে কথা বলার মত—ও মা, তুই কত বড় হয়ে গেছিস! তোকে এখন চেনাই যায় না। ইলু-বিলু পর্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কথা বলছে। সে খাতা পেন্সিল তুলে নেবার সময় দেখল ঝড়ের মত ঘরে এসে দীপু ঢুকছে—তুমি!

—সুবলদা তুমি তো আচ্ছা লোক! জেঠিমা বললেন, হাজারিবাগে আমাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল সে সব কিছু বলনি।

সুবল বলল, বোস। মা তোমাকে চিনতে পেরেছেন?

ইলু-বিলু সঙ্গে সঙ্গে এল। মা এলেন। মা অভিযোগ করলেন, কিরে, লাবণ্যর সঙ্গে তোর নাকি হাজারিবাগে দেখা হয়েছে? লাবণ্যর ভাইপোর সঙ্গে নাকি ইতুর বিয়ের পাকাপাকি?

—হ্যাঁ মা!

—এমন একটা খবর তুই আমাকে না দিয়ে থাকলি কি করে?

ইলু বলল, মা, তুমি তো দাদাকে জান।

বিলু বলল, দাদার তো এমনি স্বভাব। নতুন তুমি কি দেখলে?

দীপু বলল, তুমি বড় নিষ্ঠুর মানুষ।

—এ কথা বলছ কেন?

—বলব না তো কি বলব। এতদিন পরে দেখা, এমন একটা খবর তুমি জেঠিমাকে না দিয়ে থাকলে কি করে?

—তা তোমরা সবাই দেখছি আমাকে আসামী সাব্যস্ত করে ফেলেছ।

—এমন কথা কেন? দীপু বলল।

—যেভাবে এসে দাঁড়িয়েছ! বলতেই সবাই হেসে উঠল।

দীপু বলল, মা আমাকে পাঠিয়েছেন জেঠিমা। ইলু-বিলুকে নিয়ে যেতে বলেছে।

—আজকে! এখন!

—তবে কখন? বলে দীপু সুবলের তক্তপোশে বসে পড়ল।

—কোন খবর নেই। আগে থাকতে খবর দিতে হয়। সুবিধা-অসুবিধা থাকতে পারে।

—সুবিধা-অসুবিধার কি? সবাই তোমরা খাবে রাত্রিতে।

—সে কি করে হয়। দাদার কলেজ আছে। বিলু বলল।

—ভারী আমার কলেজ! বলে সে সুবলের দিকে সরল চোখে তাকাল।

মা বললেন, কিন্তু আমাদের যে—

দীপু শেষ করতে দিল না।—জেঠিমা, কাল রাত্রিবেলাতে হঠাৎ মা বার বার আপনাদের কথা বলতে থাকলেন। বললেন, কাল শনিবার আছে। শনি পুজো। দিদিকে নিয়ে আয়! এমন সময়ে বলল যে তখন আর আসবার সময় থাকল না।

সুবল বলল, দেশের পূজা-আর্চা তবে সব বজায় রেখেছ?

—মা-র ঐ একটা দেবতার ওপর বড় ভয়। দীপু এবার ঘরের চারদিকটাতে তাকাল।

শনিপুজো বলে কথা! দেবতার ভয়ে বুঝি ইলু বিলু এবং মা রাজী হয়ে গেল। মা বললেন, সুবল এমনিতেই কত ঝামেলা, শনির কোপে এখন তোমাদের শ্রীবৎস রাজার মত অবস্থা। আমরা যাব দীপু। বিকেলে চলে যাব।

ইলু বলল, দীপুদি তুমি বরং এখানে খেয়ে নাও।

—তোদের এখানে ফোন আছে? কি ভেবে বলল, থাক, ঠিক আছে। সে সিঁড়ি ধরে নেমে হাতে ইশারা করতেই ড্রাইভার হাজির। এতক্ষণে ওরা দেখল পথের ওপর বড় একটা ঝকঝকে গাড়ি পার্ক করা। দামী গাড়ি থেকে ড্রাইভার নেমে এলে দীপু বলল, বাড়ি গিয়ে মাকে বলবে, বিকেলে ওদের নিয়ে যাচ্ছি। আমি এখানে খাব। আমার জন্য দাদা মা যেন বসে না থাকেন। এখানে আমি খেয়ে নেব। তুমি চারটের সময় চলে আসবে। বুঝলে!

ইলু বলল, কত বড় গাড়ি!

বিলুর কথাটা পছন্দ হল না। সে জোরে চিমটি কেটে দিল ইলুকে।

সুবল আর কোন কথা বলছিল না। দীপুর শরীরে সুগন্ধ। শৈশবের দীপুর সঙ্গে কত তফাত এই দীপুর। দীপু এমন লম্বা হল কি করে? এমন গৌরবর্ণ হল কি করে? ঘাড়ের কাছে কি মসৃণ নরম কোমল ত্বক—দীপু এই ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দেওয়ালে ছবি দেখছে। মাঝে মাঝে সুবলের খাতা দেখা আড়চোখে দেখছে। মা এ-ঘরে নেই। ইলু-বিলু মার সঙ্গে বোধ হয় রান্নাঘরে। দীপুদির এমন আপন করে নেবার স্বভাবে ইলু-বিলু খুশিতে ডগমগ করছে। দীপুদি কি খাবে, তার জন্য স্পেশাল কি হবে—ইলু-বিলু রান্নাঘরে এখন সেই নিয়ে ব্যস্ত। আর সুবল যেন জানে না কিছু, বোঝে না কিছু এমন মানুষের মত ঘাড় নুয়ে খাতা দেখে যাচ্ছে। দীপুর সেই শৈশবের মুখ মনে পড়ছে। শৈশবে দীপু এমন শ্রীময়ী ছিল না। একবার ইছাপুরায় কাছারিবাড়িতে দীপু মেলায় হারিয়ে

গিয়েছিল—শশীকাকার কি ছোটাছুটি, দীপু তখন সুবলের হাত ধরে নদী অতিক্রম করে ছুটছে! আম-জাম নারকেল গাছের ছায়ায় ছায়ায় ছুটছে। শৈশবে দীপু সুবলের হাত ধরে ছুটত। স্নানের সময় দীপুর স্বভাব ছিল সুবলের সঙ্গে স্নান করা। তখন দীপু কত ছোট, বড়বাবু প্রায় দীপুকে গরিবের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে দিতেন না। দীপু শৈশবে সুবলদের বাড়িতেই মানুষ। ইলু-বিলু তখন সংসারে আসেনি।

সুবল জুতোর খট খট শব্দ পাচ্ছিল। আর বুঝতে পারছিল যুবতীর কি এক সংগোপনে কথা বলার ইচ্ছা। যুবতীর মুখ দেখলে টের পাওয়া যায়—আমি অন্য কাজে এসেছি সুবলদা। কোথাকার কি এক শনিপুজো—সে অছিলা মাত্র। আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। আমি জানি তুমি বড় ভীতু মানুষ! শৈশবে আমি তোমাকে একবার লুকোচুরি খেলার সময় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম। বৈঠকখানার পাশে সে রাতে জ্যোৎস্না ছিল, করবী গাছে অসময়ের ফুল ফুটেছে, তখন হেমন্তকাল—শরতের মত পরিচ্ছন্ন আকাশ, শিশিরে ঘাস ভিজে যাচ্ছে—আমি, তুমি এবং অবিনাশদা আর কে কে যেন, বোধহয় তোমার কোন এক আত্মীয় পুরুষ এবং মেয়ে সে রাতে ছেলেমানুষী এক খেয়ালে মেতে ছিলাম। মনে আছে, তুমি এবং আমি গোলাঘরের পাশে লুকিয়ে থেকে—তুমি কি ভীতুর মত মুখ করে রেখেছিলে, তুমি বলেছিলে—এই দীপু তুই সরে যা। অবিনাশ একসঙ্গে দেখলে খারাপ ভাববে। কি ভীতু তুমি সুবলদা! তোমার জন্য আমি একা স্নানের ঘরটার পেছনে বড় অর্জুন গাছটার নিচে লুকোবার সময় দুই চোখ, লম্বা বড় চোখ ভুতুড়ে কিছু হবে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠতেই তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে। তুমি আর এখন বুঝি তেমন মানুষ নও। আমি এখনও যখন বড় পার্টিতে সামান্য মদ গিলতে হয়, সেই শৈশবের নরম কবুতরের মত তোমার বুকের কোমল সুখের আস্বাদ টের পাই। তুমি আমার তখন একমাত্র কাছের মানুষ মনে হয়। আবেশে আমার চোখ বুজে আসে।

সুবল মুখ তুলতেই দেখল দীপু খুব নিবিষ্ট মনে দেয়ালের কিছু ফটো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। সুবল তক্তপোশ থেকে নামার সময় বলল, বাবাকে নিশ্চয়ই চেনা যাচ্ছে না দীপু।

—খুব রোগা হয়ে গেছিলেন।

—খুব। এখানে এসে বাবা কয়েক মাসের ভিতর হাড় ক'টি সার করে একদিন সংসার থেকে একেবারেই ডুব দিলেন।

দীপু কেমন অন্যমনস্ক গলায় বলল, জান সুবলদা, জ্যাঠামশাইয়ের সেই দৃশ্যটা কেবল আমার বেশি মনে পড়ে।

—কোন্ দৃশ্যটার কথা বলছ?

—বড় লম্বা একটা সোফাতে যখন তিনি বৈঠকখানার বারান্দায় বসে বড় নলে গড়গড়ায় তামাক খেতেন, তোমাদের ম্যানেজার শ্রীকান্তবাবু কি সব বোঝাতেন আর তিনি হুঁ হাঁ করে যেতেন—আমরা মঠের সিঁড়িতে লাফিয়ে উঠতাম, দাদা এবং অন্য সকলে নদীর ঢালুতে ব্যাডমিন্টন খেলত এবং নদীতে নৌকোয় তখন পাল থাকত—কিছু পাখি উড়ত—এমন একটা দৃশ্য।

সুবল ভাবল চোখ বুজলে তুমি আরও সব দৃশ্য দেখতে পার। অনেক দূরের দৃশ্য। হাট-বারে মনে আছে তোমার, বাড়ির সামনে পথ, পথে যত লোক হাট করতে যেত, বাড়ির সামনে এলেই আদাব দিত, হাত তুলে নমস্কার করত, আমাদের বাড়ির সঙ্গে সবার কি যেন এক সহৃদয় সহযোগিতা—বাবা তো তেমন লোক ছিলেন—মানুষের ভালোর জন্য তাঁর কিছু দান ছিল, ঘোড়ায় চড়ে বাবার সবুজ সব দ্বীপে চলে যাবার বাসনা ছিল। সুবল দরজার কাছে এসে বলল, সব হারিয়ে বাবা এই ঘরটায় বাকি ক'টা মাস কাটিয়ে চলে গেলেন। জান, আশ্চর্য, বাবাকে কোন দুঃখ করতে দেখিনি। কোন আপশোষ ছিল না। হাসি-খুশি যেমন ছিলেন, এখানে এসেও তেমনি সেই এক মানুষ, অথচ দিন দিন তিনি বড় শীর্ণ হয়ে গেলেন।

দীপু আর একটা চেয়ার টেনে বসল। তারপর সুবলের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কখন যাবে?

—আমার গিয়ে কি হবে?

—বারে, রাত্রিতে তোমরা যে সবাই আমাদের ওখানে খাবে।

—আমার তো অনেক কাজ দীপু।

—কাজ না ছাই! তুমি না গেলে খুব রাগ করব। দীপুর মুখ সহসা কেমন গম্ভীর দেখাল।

—আরে যাব। মুখ গোমড়া করবে না। তুমি শুনেছি সুন্দর সব ছবি এঁকে দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে, সে-সব না দেখলে চলে?

দীপু বলল, আমার আবার আঁকা। নেই কাজ তো খৈ ভাজ। এই বলে দীপু ত্বরিতে রান্নাঘরে ঢুকে জেঠিমার পাশে বসে পড়ল।

সুবলের মন্দ লাগছিল না। দীপুকে কেন জানি বড় আপনজনের মত মনে হচ্ছে। দীপুর এমন সরল কথাবার্তা সুবলকে খুশি করছিল। সুতরাং বিকেল হলে মা এবং ইলু-বিলু চলে গেল। সন্ধ্যা হলে সুবল দীপুদের বাড়িতে ঢোকার মুখে দেখল সদর দরজায় দারোয়ান। সুবল সামান্য একটা কালো রঙের প্যান্ট পরেছে, সাদা রঙের হাওয়াই শার্ট। চুল ব্যাকব্রাশ করা। পায়ে স্যাণ্ডেল সু। সে

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ সদর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। সারি সারি গাড়ি ভিতরে। ছোট গোলমত পার্ক। নীল-লাল বাতি জ্বলছে। পার্কের ভিতরে ছোট পাথরের গম্বুজ এবং গম্বুজে নীলবসনা এক যুবতী, তার মুখে জলের ফোয়ারা। তারপর নুড়ি বিছানো পথ। এবং হুস হাস বড় বড় গাড়ি নিমেষে বের হয়ে যাচ্ছে। সে সদরে দাঁড়িয়ে বাড়িটা কত বিশাল প্রায় ধরে ফেলল। শশীকাকা কি কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন? এতবড় বাড়ি ব্যবসা থেকে—বিশেষ করে দশ-বারো বছরের ভিতর এতবড় বাড়ি—কি তেমন ব্যবসা—মূলধন কোথা থেকে এল! সে ক্রমে বিস্ময়ে তলিয়ে যাচ্ছিল। দারোয়ান তখন হাঁকল, এই বাবুজী, উধার ঠারিয়ে।

সুবল সিগারেটটা ফেলে দিয়ে দারোয়ানের দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল। আমি যাব, ভিতরে যাব। দারোয়ানের হাঁকে সামান্য যেন তোতলামিতে পেয়ে বসল। একটা গাড়ি ভিতরে ঢুকছে। আর দেখল দীপু, সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ান, অ্যাটেনসান এবং স্যালুট। দীপু গাড়ি থামিয়ে দিল সদর দরজাতে।—তুমি তো আচ্ছা মানুষ সুবলদা। বললাম, গাড়ি যাবে, আর তুমি বাসে চলে এসেছ!

—তোমার দেরি দেখে বাসে চলে এলাম।

—দেরি কোথায়! আমি তো ঠিক সময়ে গেছি।

বস্তুত সুবলের ইচ্ছা ছিল না কলেজের সামনে কোন যুবতী গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর সে সেই গাড়িতে চলে আসবে—সবাই, বিশেষ করে অনুজ ছাত্র-ছাত্রীরা, ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে রসিকতা করতে পারে, অথবা মনে মনে সবাই ভেবে ফেলতে পারে আমাদের স্যার একজনকে পাকড়েছেন। সুতরাং সে আগে আগে কলেজ থেকে বের হয়ে বাসে চলে এসে বাড়ির ভিতরটা দেখে কেমন তাজ্জব বনে যাচ্ছিল।

সুবল বলল, কত বড় বাড়ি!

দীপু বলল, হ্যাঁ, কত বড়।

শশীকাকাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

দীপু উত্তর করল না।

ওদের গাড়ি, গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়ালে সে দেখল একজন পরিচারক এসে দরজা খুলে দিচ্ছে। ঝকঝকে সাদা পোশাক মাথায় ঝালরের টুপি, লোকটার নাম অনাদি, ওর পকেটে লেখা আছে শশী অ্যাণ্ড সন্স। সুবল ভাবল ডটার লেখা নেই কেন। কেন না সম্পত্তির সমান ভাগ অবিনাশ এবং দীপুর ভিতর। এবং শোনা কথা, দীপুই এই সব ব্যবসার প্রতিপত্তিশালী অংশীদার। অবিনাশ পর্যন্ত দীপুকে সমীহ করে চলে। সুবল এত বড় বাড়িতে ঢুকে প্রথমে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল।

দীপু যেন বলছে, সুবলদা, তুমি আমার পাশে পাশে থাক। আজ আমার জন্মদিন। আমার জন্মদিনে মা শনিপুজো করেন। কারণ মা জানেন, এইসব বিলাস-সামগ্রী বাবা আমার বিনিময়ে অর্জন করেছেন। মা-র কাছে এখনও ব্যাপারটা স্বপ্নের মত। দেশে থাকতে—তুমি জান সুবলদা, মা প্রতি শনিবারে শনিপুজো করতেন—কারণ মা-র বিশ্বাস ছিল, জ্যোতিষশাস্ত্রে মা-র অগাধ বিশ্বাস—বাবার শনির দশা চলছে। দেশ-ভাগের পর—সেটা কি সাল হবে, ধর ১৯৫৪-৫৫—বাবা এদেশে চলে এসে সেই শনি আমার পিছনে লাগিয়ে দিয়ে যেন মুক্তির নিশ্বাস নিলেন। বাবা ক্রমে ধনে দৌলতে, এইসব রক্তমাংসের বিনিময়ে ধন-দৌলত, কি যে না করেছেন—তুমি আর এমন কথা বল না—পৃথিবীতে একমাত্র মানুষ আমার বাবা, যার প্রতি আমার সবচেয়ে বেশি ঘৃণা হয়, কি যে বলি তোমাকে—তুমি এস সুবলদা, আমার সঙ্গে এস। তুমি আর যাই বল শ্রদ্ধার কথা উচ্চারণ কর না। আমার জন্মদিনে মা শনিপুজো করে সেই রাহু থেকে আমাকে সামান্য সময়ের জন্য ছাড়িয়ে আনতে চান।

শশীকাকাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না এমন কথায় দীপু বিমর্ষ হয়ে গেল কেন সুবল বুঝতে পারল না। সুবল অত্যন্ত অপরিচিতের মত যেন বলল, দীপু, মাকে দেখছি না? ইলু-বিলু?

—ওঁরা মা-র কাছে আছেন। মা-র জন্য আলাদা মহল আছে সুবলদা। তোমাকে আমি পরে সব দেখাব। তোমাকে আমি সেখানেও নিয়ে যাব।

দীপুর সঙ্গে কত মানুষের তখন হাসি-বিনিময় হচ্ছিল। বড় পার্টি দিচ্ছে দীপু। অবিনাশ খুব সুন্দর পোশাকে একটা বড় হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সুবলকে দেখেই বলল, আরে এস এস। দীপু বলল, দাদা, তুই মার্সিডিজটা কোথায় পাঠিয়েছিস? মিঃ করকে আনতে কে গেছে!

এখনও অতিথি-অভ্যাগতেরা তেমন আসেননি। গাড়িগুলো এক এক করে বের হয়ে যাচ্ছে। আর একটু রাত হলে এই হলঘর আলোময় এবং ভোজ্যদ্রব্যে ভরে যাবে। আজ কি আয়োজন এবং কারা কারা আসছে দীপু কিছুই জানতে চাইল না। সারাটা দিন দীপু কোথায় এক সামান্য মানুষের জন্য, তাদের নিয়ে আসার জন্য পড়ে থেকেছে।

সুবল কোন কথা বলছে না, বস্তুত সে কথা বলতে ঠিক সাহস পাচ্ছে না। পরিচারকদের পোশাক, নীল লাল উজ্জ্বল বাতি এবং হলঘরে এত বড় টেবিল দেখে, ওপরে এত ঝাড়-লণ্ঠন দেখে সে অতীতের বৈভবের কথা ভুলে গেল। বস্তুত, গ্রাম্য জীবনে এমন বৈভব এবং বিলাসিতার সে সাক্ষ্য থাকেনি। সেখানে বারো মাসে তেরো পূজা-পার্বণ। দোল-দুর্গোৎসব। মঠ প্রতিষ্ঠা। পয়লা বৈশাখে

দূর দূর দেশ থেকে প্রজারা আসতেন। বাবা বৈঠকখানায় বসলে নায়েব গোমস্তা এবং সেখানে যত আমলা কর্মচারী ছিল সবাই মিলে রুপোর থালাতে এবং রুপোর মঙ্গলঘটে বাবাকে বরণ করে নিতেন। সে-সব খুব শৈশবের কথা—আর শখ ছিল ঘোড়ায় চড়ার। ঘোড়ার পিছনে বাবার টাকা ওড়াবার সামান্য অভ্যাস ছিল। এ ছাড়া তেমন বিলাস-বৈভবের কথা তার জানা নেই। যেতে যেতে ওরা একটা হলঘর পার হল। তারপর দুপাশে মেহগনি কাঠের দেয়াল অতিক্রম করলে বড় আয়না, নিচে পিতলের মীনা-করা ভাস, ভাসে কত রকমের ফুল ফুটে আছে। সুবল বলল, দীপু, শশীকাকার রুচির তারিফ না করে পারছি না। এমন শিল্পীসুলভ বাড়ি-ঘর ভাবাই যায় না।

দীপু ঘাড় তুলে সুবলকে দেখল। সুবল যত লম্বা, দীপু যেন তার চেয়ে কম যায় না। দীপুর মুখ এখন প্রায় গ্রীক সুন্দরীদের মত দেখাচ্ছে। যেমন চওড়া কাঁধ, তেমনি সুপুষ্ট বাহু। প্রায় সাপের মত মসৃণ ত্বক। সাদা রঙ নয়, আবার হলুদ রঙও নয়—কি যেন এক রঙ শরীরে মেয়ের, যার তুলনা হয় না। মুখের চওড়া চিবুক এবং টানা চোখ দেখলে স্থির থাকা যায় না। শাড়ি নাভির নিচে, একবার আঁচল খসে পড়লে মনে হল দীপু এখন শরীরে সামান্য বাস রেখেছে, কারণ স্তনের সামান্য আবরণ বাদে নাভি-মূলে অন্য কিছু ছিল না। সুবল কেমন পাগলের মত এই রূপবতীর পেছনে পেছনে হাঁটছে। শশীকাকার রুচির প্রশংসা করলে দীপু কেমন গম্ভীর হয়ে থাকছে। সে ভাবল কেন যে মেয়ে তুমি রূপবতী বলে আমাকে এত অবহেলা কর—সুবল এবার ডাকল, দীপু, তুমি এত তাড়াতাড়ি হাঁটছ কেন?

কেমন অন্যমনস্ক ছিল দীপু।—ওঃ, আচ্ছা এস। সে ফের হাঁটতে থাকল। বাড়িটার কোথায় কি আছে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু আসলে দেখা আর হয় না। সুবলদা তুমি এই বৈভবের পেছনের ইতিহাসটা জান না। তুমি শুধু আমাদের এমন সুন্দর সাজানো প্রাসাদের মত বাড়ি দেখে কুবেরের ধন আবিষ্কার করেছি ভাবতে পার—আর জান না, তোমার শশীকাকা, তখন আমি কত ছোট, মাত্র ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরছি—বাবা তখন পুরনো টিনের স্ক্র্যাপ কিনে বিক্রি করে অনাহার থেকে আমাদের রক্ষা করছেন। বাবা তখন কার পরামর্শে একটা বলপ্রেস কিনে সামান্য জর্দার কৌটো বিক্রি করে দু-পয়সার মুখ দেখেছেন। মোটামুটি স্বচ্ছল সংসার—বাবার তেমন লোভ ছিল না টাকার। আমরা তখন সুখী ছিলাম সুবলদা।

সুবল বলল, আচ্ছা দীপু, শশীকাকার কথা বললে তুমি এমন চুপচাপ থাক কেন?

সামনে ফুলের বাগান। একটা ইউক্যালিপটাসের গাছ, গাছে নিরন্তর এক পাখি ডেকে চলেছে। কোথায় সেই পাখি, কোন পাতার নিচে তা দেখা যাচ্ছে না। তবু পাখিটার ডাক শোনা যাচ্ছে। তেমন এক পাখির মত এই দীপুর দুঃখ-বেদনা কোন কারণে ধরা যায় না, কিন্তু দীপু দুঃখে ডুবে আছে বোঝা যায়। ট্রেনের দীপুর সঙ্গে কত তফাত এই দীপুর। সুবল বলল, তোমার জন্মদিন আজকে, তুমি তো আমাকে সে-কথা বলনি!

দীপু বলল, তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে সুবলদা। কখন বলব, কিভাবে বলব, বুঝতে পারছি না।

সুবল্ বলল, শশীকাকার কথা কিন্তু তুমি কিছু বলছ না।

—এখন সে-কথা থাক।

—শশীকাকার কথা বললে তুমি—

—আমার ভাল লাগছে না সুবলদা। তোমার মনে আছে, তুমি আমি আর রামসুন্দর বেথুন ফল তুলতে একবার কালীবাড়ির জঙ্গলে ঢুকে গেছিলাম। তারপর কি একটা সাপ, বড় সাপ, আমাদের তাড়া করেছিল?

—মনে পড়েছে।

—এদেশে এসে সেই সাপটা ফের আমাকে তাড়া করছে।

সুবল ঠিক বুঝতে পারল না।

—যখন সাপটা তাড়া করে তখন তোমার কথা মনে হয়। কথা বলতে বলতে ওরা দীপুর ঘরে ঢুকে গেল। পাশাপাশি তিনটে ঘর। একটা ঘরে অবসর সময়ে দীপু ছবি আঁকে। অন্য ঘর বড় বড় সরকারি অফিসারদের জন্য বরাদ্দ। তারা দীপুর সঙ্গে দেখা করতে এলে সেই ঘরটায় বসে। শুধু পাশের ঘরটা খালি। দেয়ালে সব বিচিত্র ছবি এঁকে রেখেছে। সে ঘরে ঢুকে সুবলকে তার আঁকা ছবিগুলো দেখাতে থাকল।

সুবল দেখল সব ছবিতেই এক মুখ। এক কিশোরীর অসহায় মুখ আঁকা। পাশে এক প্রৌঢ় মানুষ। গলায় দড়ি পরানো ফাঁসের মত। প্রৌঢ় মানুষটি দড়ি ধরে টানছে। কোথাও কোন সমুদ্রতীরে এক কিশোরী পালাতে চাইছে—পিছনে এক প্রৌঢ় মানুষ তাকে ধরার জন্য ছুটছে। কোথাও কোন এক কালো অশ্ব। পিঠে বালিকা। বালিকার শরীরে কোন আবরণ নেই। হাজার যুবক তামাশা দেখার জন্য ঘোড়াটাকে নাচাচ্ছে। সুবল যত এইসব ছবি দেখল তত বিস্মিত হতে থাকল। আর দীপুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার সময় মনে হল এই মেয়ে বড় রহস্যময়ী। গ্রামের দীপুকে সে খুঁজে পেল না। কেবল যেন আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে। কলকাতা নামক এক মহানগরী বুঝি দীপুকে গ্রাস করে ফেলেছে।

সুবল বলল, শনিপুজোর নিমন্ত্রণে জন্মদিনের ভোজ!

দীপু বলল, চল। ওরা সবাই এসে গেছেন। বলে হলঘরটাতে ঢুকতেই সুবল দেখল লাল-নীল পানীয়। কত হরেক রকমের কাচের বাসন। কত রকমের গ্লাস। সব পরিচ্ছন্ন যুবক-যুবতীরা, সব ধনী পরিবারের দেখলেই চেনা যায়। এবং কিছু সরকারি কর্মচারী—যারা এতক্ষণ দীপুর জন্য অপেক্ষা করছিল। সুবলকে খুব বেমানান দেখাচ্ছে। দীপু বলল, তুমি থাক সুবলদা। তুমি না থাকলে সারারাত ওরা আমাকে ছাড়বে না। অনেক রাত করে ফেলবে। আমি সামান্য খেয়ে তোমার সঙ্গে চলে আসব।

সুবল কোন কথা বলতে পারল না। ক্রমে সে এই পরিবারের এমন সব ভোজে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ছে। সে মদ খেল না। সামান্য খাবার খেল। দীপু সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। দীপুর সামান্য ভালবাসা বুঝি এদের কাম্য। অন্য যুবতীরা ঘোরাফেরা করছে। খাবারের চেয়ে মদ বেশি খাচ্ছে। দীপু বলল, এই আমার সুবলদা। বড় সৎ এবং সাহসী মানুষ। বলে দীপু কেমন হা হা করে হেসে উঠল।

সুবল বলল, দীপু, তোমার আজ জন্মদিন। জন্মদিনে কেক খাব। কিন্তু এ-সব কি? ওরা কি সবাই তবে মদ গিলতে এসেছে?

অবিনাশ বলল, কেমন লাগছে সুবল?

অমল এসেছে। অমলের সঙ্গে দুই বান্ধবী এসেছে। সুবলকে দেখে সে প্রথমে আঁতকে উঠেছিল। অবিনাশ বলল, সুবল, আগে জানতাম মদে টাকা নষ্ট হয়। কিন্তু ভাই এখন দেখছি এই মদ আর সামান্য যুবতীর গন্ধ রাখতে পারলে তুমি সোনার খনি আবিষ্কার করে ফেলতে পার।

সুবল ভালমানুষের মত মুখ করে অবিনাশের কথা শুনছিল। সামান্য পয়সা হলে মদ, মদ হলে মেয়ে এবং এ-ভাবে অনেক দূর তুমি চলে যেতে পার। অবিনাশের বুঝি সামান্য ঝিম ধরছিল। চোখে সামান্য গুলাবী নেশা। দীপু সবার সম্মানার্থে ঢক ঢক করে দু পেগ গিলে ফেলল। প্রায় ওষুধ গেলার মত মুখ করে দীপু বলল, সুবলদা, তোমার শশীকাকার রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। বলে আগে যেমন হা হা করে হেসে উঠেছিল, তেমনি সে যেন হা হা করে হাসতে হাসতে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল।

সুবল বলতে পারত, আমার এসব ভাল লাগছে না। আমি চলে যাব। কিন্তু দীপুর জন্য ওর কেমন মায়া হতে থাকল। মনে হচ্ছিল দীপু বড় অসহায়, গলায় অহঙ্কারের ফাঁস পরে এখন আর পিছিয়ে আসতে পারছে না। সে দীপুকে কানে কানে বলল, দীপু, আয়নায় তুমি মুখ দ্যাখো। চোখ দ্যাখো। কি লাল দেখাচ্ছে

চোখ, তোমার মুখ দেখলে তোমাকে বড় অসুখী মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে দীপু সবার প্রতি হাত তুলে দিল। বলল, শরীরে সামান্য অসুস্থতা বোধ করছি। টেবিলে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না বলে দুঃখিত।

অবিনাশ বলল, দীপু, তুমি চলে যাচ্ছ? মিস্টার মুখার্জী কি ভাববেন?

—ভাবাভাবি আমার ভাল লাগে না দাদা। আমি যাচ্ছি।

দীপু সুবলের হাত ধরে বাইরে এসে দাঁড়াল। মদের উৎকট গন্ধ মুখে। ক্লান্ত অবসন্ন। সেই শ্রী আর দীপুর মুখে নেই। লাবণ্য নেই। লক্ষ্মীর পটের মত দেখতে এই দীপু এখন কেমন যেন সময়ের দোষে শ্রীহীনা। সুবল ওর চোখ দেখল। চোখে সেই সলজ্জ ভাবটা নেই। বরং চোখে এক মিনতি যেন—তুমি আমায় অন্য কোথাও নিয়ে চল। ছোট্ট এক নদী থাকবে, গম যব ক্ষেত থাকবে, বর্ষাকালে কদমফুল ফুটবে। গাছের নিচে ছোট্ট কুঁড়েঘর থাকবে। জমি থেকে তুমি ফসল তুলে আনবে—আমি নদী থেকে জল তুলে আনব।

সুবল বলল, মিঃ মুখার্জী কে?

—মিঃ মুখার্জী, ডি এল. এফ-এর ডেপুটি কন্ট্রোলার।

—ডি. এল. এফ-টা কি?

—তুমি সে সব বুঝবে না সুবলদা। ওটা একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সোনার খনি। ডি.এল.এফ. হচ্ছে ডেভালপমেন্ট লোন ফাণ্ড। আমেরিকা থেকে যত লোনের টাকা পাওয়া যায়, বিনিময়ে যে দ্রব্য ভারতবর্ষ পায়, এই সংস্থা তা বিলি করে। অর্থাৎ লাইসেন্স প্রদান করে। মিঃ মুখার্জী তার একজন বড়কর্তা।

—প্রায় দেখছি শশীকাকার বয়সী!

—প্রায় তাই। বিপত্নীক এই মানুষটা। তখন তিনি ডাইরেক্টর অফ স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রিজে কি একটা বড় কাজ করতেন, এই মানুষটা বাবাকে সোনার খনির সন্ধান দিয়েছিলেন।

—ঠিক বুঝতে পারছি না। সোনার খনিটা তিনি নিজে না নিয়ে তোমাদের দিলেন!

—সুবলদা-দীপু হাঁটতে থাকল। সুবল পেছনে পেছনে হাঁটলে বলল,—সুবলদা, প্রায় এখন সব আমার প্রাচীন গল্প-গাথার মত মনে হয়। বাবা ছোট্ট বলপ্রেস কিনে জর্দার কৌটো বানাতেন। বাজার থেকে পুরনো স্ক্র্যাপটিন কিনে আনতেন। তিনি রিফুউজি। লোনের জন্য তিনি একটা দরখাস্ত করলেন। ছোট্ট ব্যবসার জন্য সরকার লোন দিচ্ছে। এতসব দেখে এখন তাজ্জব বনে যাচ্ছি। বাবা একদিন এই মানুষটিকে নিয়ে এলেন বাড়িতে। কোথায় বসতে দিই, কোথায় কি করি। দেখাশোনার তদারক আমার ওপর। সেই থেকে মানুষটাকে বসাবার

এবং দেখবার ভার আমার ওপর বর্তাল। মানুষটা আমাদের অনেক দিয়েছেন। কেমন ধীরে ধীরে ক্লান্ত গলায় বলে সে তার ঘরের দিকে হাঁটতে থাকল। বাকিটুকু বলতে পারল না। বললে যেন শোনাত, সেই থেকে মানুষটাকে আমি আত্মা বিক্রী করে চলেছি সুবলদা। তখন আমার বয়েস কত। চোদ্দ-পনেরো। মানুষটা আমার সঙ্গে অশালীন আচরণ করলে বাবাকে বলি—বাবা রাগে দুঃখে আমার গালে চড় মেরেছিলেন। বলেছিলেন—মেয়ে তুমি সহবৎ শেখনি। যেন বাবার বলার ইচ্ছা ছিল—মেয়ে তুমি এমন রূপবতী, এমন রূপবতী হলে রাজ্য জয় করা যায়। আর তুমি একটা মানুষকে জয় করতে পারছ না? ঠিক এখন যেমন আমি সময়ে অসময়ে মদের ঘোরে হা হা করে হেসে উঠি, বাবা অর্থের লোভে মাঝে মাঝে তেমন হেসে উঠতেন। এই মানুষ একদিন বলল—সরকারি লোন নিন। সরকারি লোন পেলাম। সামান্য এক টিনের কারখানা। কিন্তু সেই সব পাতলা টিনের তিন লাখ চার লাখ টাকার হাফ-ইয়ারলি লাইসেন্স। শুধু দুশো পারসেন্ট প্রিমিয়ামে বিক্রী। কোন ঝামেলা নেই। লাইসেন্স বিক্রী করে দিলেই তিনে ছয়, চারে আট অর্থাৎ আট লাখ টাকা। প্রৌঢ় মানুষটি বড় শক্তিশালী মানুষ সুবলদা। সে বাবাকে রাতারাতি বড়লোক করে দিল, বিনিময়ে আমি রক্তমাংসের ভিতর যত ক্লেদ নিয়ে ডুবে থাকলাম।

দরজার পাশে দীপু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সুবল বলল, এই মানুষের প্রতি তবে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা দরকার।

—আমাকে ঠাট্টা করছ সুবলদা?

—ঠাট্টা করব কেন? তোমরা এখন স্বপ্নের জগতে ঢুকে গেছ।

—মাঝে মাঝে মনে হয় স্বপ্নটা ঈশ্বর ফিরিয়ে নিক। আর পারছি না। তোমার শশীকাকা এমন একটা স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে আসতে হবে এই ভয়েই বুঝি মরে গেল।

—কেন, ভিতটা তিনি ভালভাবে গড়ে দিতে পারেননি?

—পারলে তিনি অসময়ে মারা যেতেন না।

সুবল বলল, আমি যাচ্ছি।

—তুমি একটু বসবে না? একটু বসে গেলে ভাল হত।

—মা, ইলু, বিলু?

—ওঁরা মায়ের কাছে আছেন। শনিপুজো হলেই মা ওঁদের পাঠিয়ে দেবেন। সুবল কি করবে এখন ভেবে পেল না। দীপু ওর ঘরে সোফায় বসে নুয়ে আছে। সামন্য মদ দীপুকে ক্লান্ত করেছে অথবা জীবনে বুঝি এমন সব দুর্ঘটনা আছে যা আজ এক এক করে মনে পড়ছে দীপুর। দীপুর শরীর, মন এবং শাড়ির গন্ধ নাকে

আসছিল, দীপুর নগ্ন বাহু দেখা যাচ্ছে! সামান্য ব্রেসিয়ারের মত ব্লাউজ দীপুর। সিল্কের অসামান্য দামী মেরুন রঙের কাপড় বুক থেকে খসে পড়ছে। নাভির নিচে কাপড়—সুবলের দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করছিল।

মনে হল তখন কোথাও জুতোর শব্দ হচ্ছে। মনে হল তখন দীপু ভয়ে আরো গুটিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কারা যেন উচ্চকিতভাবে হাসছে। কারা যেন করতাল বাজাচ্ছে। দীপু সেই সব শব্দে উঠে দাঁড়াল। বলল, সুবলদা, তুমি ভিতরে এসে বস। আমার বড্ড ভয় করছে।

সুবল মনে মনে ভাবল, ন্যাকা! এত সব করতে পার, আর এখন আমাকে দেখে তোমার সব অদৃশ্য ভয়! সে কিছু বলল না। সে সোফাতে বসে পড়ল। চারদিকের দেয়াল ফাঁকা। শুধু সাদা-রঙের একটা ক্যালেণ্ডারে কালো কালো অক্ষরে মাস-তারিখের হিসাব। আর তখন মনে হল দরজায় সেই প্রৌঢ়। তিনি ঢুকে গেলেন। দীপুর কোন অনুমতি প্রার্থনা করলেন না। প্রায় ঘরের মানুষের মত। বরং সুবলকে দেখে বিস্মিত। তিনি বললেন, দীপু, তুমি টেবিল থেকে চলে এলে? বলে তিনি অন্য সোফায় বসে উদ্বিগ্ন চিত্তে তাকালেন।

—আমার শরীরটা ভাল নেই মিঃ মুখার্জী।

—আমি কালই দিল্লি চলে যাচ্ছি। তুমি কবে যাচ্ছ?

—সময় হলেই যাব।

তিনি কি বলতে গিয়ে ইতস্তত করছিলেন। দীপু বুঝতে পারল এবং বলল, কোন ভয় নেই। ওর সামনে আপনি সব বলতে পারেন।

—তোমাদের গতমাসে এস. পি. রিটার্ণ ভুল ছিল। ম্যানিপুলেশনে ভুল থাকলে আমাদের পক্ষে কাজ করা কঠিন।

—আপনি দাদাকে বলে যান।

—তোমাদের কনজাম্পসন আরও বেশি করে দেখাও। এবার ইনষ্টল ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে দেবে। ওখান থেকে ইন্‌স্‌পেকশানে যারা আসবেন, তাদের আমি বলে দেব। লাইসেন্স বাড়াতে হলে এ সবের এখন দরকার হচ্ছে।

—দাদাকে বলে যান।

—তুমি এত নিরুৎসাহ কেন?

—শরীরটা ভাল নেই।

সুবল বলল, আমি উঠি। সে মুখার্জীর দিকে তাকিয়ে বলল, চলি মিঃ মুখার্জী।

—আপনার সঙ্গে তো ভালভাবে কথা বলতে পারলাম না। দীপু সুবলকে কিছু বলল না। কারণ দীপু জানত সুবলদাকে আর ধরে রাখা যাবে না। সে দেখল সুবল চলে যাচ্ছে। সামনের ছোট মাঠ পার হলে বাঁদিকে গাড়ি-বারান্দায় সুবলকে

দেখা যাচ্ছে। সে একা একা, কেউ এখানে নেই, সে বেল টিপলে বয় এসে হাজির। সে বলল করুণাবাবুকে বল, যে বাবুকে আমি ধরে এনেছিলাম, তাকে যেন গাড়িতে এক্ষুনি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। ঐ দ্যাখ যাচ্ছে। যাও, ছুটে যাও। বস্তুত এই সুবলের সঙ্গে দীপুর এখন ছুটে বের হয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। এক শিকলে আমি বাঁধা সুবলদা। এই বিলাস-সামগ্রী ঠিক যেন এক হিমালয়ের কোন গভীর অরণ্য। ঢুকে গিয়ে বের হবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। পেলেও এমন সব ফুল ফল ফুটে আছে যার লোভে সব ভুলে অরণ্যের ভিতর আবার ডুবে যাই। আরও কি যেন বলার ইচ্ছা দীপুর। কিন্তু সে কিছু ভাবতে পারল না—সামনে যমের মত এই মানুষ, পরিপক্ক ফলের জন্য, কারণ ফল এমন সুস্বাদু, হায়, সেই ফলের রসে চুমুক দেবার জন্য গোঁফে এখন তা দিচ্ছে। দীপু এবার হেসে উঠল—প্রায় পাগলপ্রায় হাসি। সে বলল, মিঃ মুখার্জী তারপর বলুন। বস্তুত দীপু এই মানুষকে নিয়ে খেলা করে। এক দুর্লভ খেলা—তুমি আমার পাশে থাক, তুমি আমার ভালবাসা নাও, শরীরে মনোরম গন্ধ রেখে দি, অযাচিত ভালবাসার মত তা ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে—কিন্তু তুমি এক মানুষ যার সর্বদা ছুঁক ছুঁক ভাব। যে সর্বদা ছুঁতে পেলে অন্তরে প্রবেশ করার জন্য পাগলের মত ছুটে বেড়ায়। আমি শুধু তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াব! দীর্ঘদিন থেকে তুমি এক মাঝবয়সী মানুষ ফুলের বনে দৈত্য হয়ে গেছ। আমি প্রজাপতি হয়ে সে-বনে উড়ছি। কিছুতেই ধরা দিচ্ছি না। তুমি খপ করে ধরে ফেলে ডানা ছিঁড়ে দিয়ে আমাকে পঙ্গু করে ফেলতে চাও। তাই আমি তোমার চারপাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছি—লোভ এবং লালসা তোমাকে নিরন্তর ছুটিয়ে মারছে। আমি উড়ে উড়ে তোমাকে এক পদ্মবনে নিয়ে যেতে চাইছি। সেখানে তুমি লতায় পাতায় জড়িয়ে গেলে—আমি আবার ফুলের বনে ফিরে আসব। ফুল হয়ে ফুটে থাকব! আমার সেই রাজপুত্র এসে আমাকে তখন তুলে নেবে।

সুবল বাড়ি ফিরেই ভাবল একবার তার কাকীমার সঙ্গে দেখা করে আসা উচিত ছিল। সে গেল অথচ ভিতরে গেল না, কোনদিকে কাকীমা থাকেন এবং মা-ইলু-বিলুই বা কোথায় একবারও তার সচক্ষে দেখার ইচ্ছা হল না। কি যেন এক আকর্ষণ তাকে সারাক্ষণ দীপুর পার্টিতে জড়িয়ে রেখেছিল।

দরজা খোলার শব্দটা পর্যন্ত এখন তার কাছে রহস্যজনক। কারণ সে এই যে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকছে, এবং অন্ধকারে সুইচের সন্ধানে আছে, যেন আলো জ্বাললেই এই ঘরটা একটা বিশাল হলঘর হয়ে যাবে, দামী লম্বা টেবিলে সাদা চাদর, সাদা ন্যাপকিন কেমন মুকুটের মত ভাঁজ করা, সে একজন সাদা পোশাকে বয় অথবা বাবুর্চি হয়ে যাবে।

সে আলো জ্বালার আগে কিছুক্ষণ চুপচাপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল। সে ভেবেছিল, মা-ইলু-বিলু হয়ত আগেই এসে যাবে, কিন্তু এখনও তারা ফেরেনি, রাত দশটা বেজে গেছে, সে এখন নিজের ঘরের দিকে এগোতে থাকল। তার ঘরটা সবশেষে। আগের ঘরে মা থাকেন, সামনের ঘরটা রান্নার। সে শেষের ঘরটা একেবারে নিরিবিলি ভেবে বেছে নিয়েছে।

তার যা হয়, কোন একটা চিন্তা মাথার ভিতরে ঢুকলে সহজে যখন বের হতে চায় না তখন একটা সিগারেট পাকিয়ে খায়। সে সামান্য টোবাকো হাতে নিল, খুব যে একটা তার সিগারেটের নেশা আছে তা নয়, তবু মাঝে মাঝে সে খায় এবং খুব একটা চিন্তার ভিতর পড়ে গেলে সে খায়। চিন্তাটা দীপুকে নিয়ে। মিঃ মুখার্জীর বয়েস হয়েছে। শরীরে শক্তি প্রবল এবং উঁচু লম্বা মানুষ। হাতের কব্জি শক্ত। মানুষটাকে দেখলেই বোঝা যায়, সে অনায়াসে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। শৈশবের দীপু এবং এই দীপু যতই উভয়ে দূরে চলে যাক, এখনও কোথায় যেন ওদের ভিতরে ভিতরে একটি ভীষণ মিল আছে। সে নিজের মনেই বলল, দীপু, তুমি বড় শক্ত খেলায় মেতে গেছ।

তবু ভিতরে একটা কষ্ট। কেন এমন একটা কষ্ট তার ভিতরে, দীপু তো কোনদিন খবর পর্যন্ত করেনি, এখন এমন কষ্ট কেন! আসার আগে সে যেন জোর করে চলে এসেছে। দীপু বাধা দেয়নি। কি হবে বাধা দিয়ে। সেখানে সে যে খুব সহজ হতে পারছে না, দীপু যেন সেটা পুরোপুরি টের পেয়েছে। অথবা দীপু এই যে সরল বালিকার মতো নেশার ঘোরে কিছু কিছু ঘটনার কথা বলে গেল, সবটাই তার কাছে খুব অবিশ্বাস্য। সে শশীকাকাকে কেন জানি খুব ছোট ভাবতে পারে না। শশীকাকার ভীষণ নাম ছিল সৎ মানুষ হিসাবে। এবং বাবা বলতেন, এমন মানুষ হয় না। শশী বড় সরল সহজ মানুষ।

সুবল এবার টের পেল মাথাটা সামান্য তার ধরেছে।

সে ঘরে ঢুকে সামনের জানালাটা খুলে দিল। বেশ একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে মুখে লাগছে। জানালার কাঠ দুটো লাগিয়ে দিল। সামনে মাঠ। মাঠ পার হলে রাস্তা। শহরের বাস-ট্রামের শব্দ আসছে না। রাত হয়েছে বলে, রাস্তার মানুষজন, গাড়ি-ঘোড়া কমে আসছে। কেমন একটা নিঃশব্দ ভাব। সে যেন টের পেল অনেকদিন পর কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছে। এবং জানালায় দাঁড়িয়ে থাকলে বোঝা যায় না সেটা কি! কারণ সামনের অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট নয়।

এভাবে যা হয়ে থাকে, মনের ভিতর একটা অহমিকা জন্মালে সে ভাবল দীপুদের বাড়ি আর যাবে না। যাওয়া ঠিক না এমন মনে হল তার। পুরোনো সম্পর্ক খুব ঢিলে-ঢালা। যা কিছু আন্তরিকতা দীপুর ভিতর, তাও বৈভবের

ভিতর পড়ে গিয়ে এমন একটা কঠিন সত্যের মুখোমুখি এখন দীপু যে সে ভাবতেই পারে না, কি করে মেয়েটা পার পাবে।

চোখের সামনে তার এখন নানারঙ। অন্ধকার অথবা আলোর। এবং সুদিনে দুর্দিনে শশীকাকা কখন সূর্যাস্ত দেখত কেউ জানে না। তবু মনে হত শশীকাকা কতবার হেঁটে গেছে নদীর পাড়ে, সূর্যাস্ত দেখবে বলে হেঁটে গেছে—তখন যথার্থই বানের জলে ভেসে যাননি। সে ভাবল, এটা ভালই হয়েছে। দীপুদের এ-ছাড়া অন্য কোন বুঝি উপায় ছিল না।

সব এলো-মেলো চিন্তা। মা এখনও আসছেন না। নিশ্চয়ই ওরা গাড়িতে ফিরে আসবে। সুবলের এটা ভাল লাগে না। গাড়িতে এলেই পাড়াপড়শীরা জানালায় উঁকি দিয়ে থাকবে। এখানে এমন একটা বাড়ি নেই যাদের গাড়ি থাকা সম্ভব। গাড়ি থাকলে মানুষ হিসাবে আল্লাদা, সে টের পায় গাড়ি আসায় ইলু-বিলুর সম্মান বেড়ে গেছে এ-পাড়ায়। সুবল এটা বোঝে। এবং বোঝে বলেই ওর ইচ্ছা নয় দীপু এখানে গাড়ি নিয়ে আসুক। আলাদা আলগা আভিজাত্য ওর কোনদিনই পছন্দ নয়। এখন তো আরও নয়। বরং সে বাথরুমের দরজা খুলে হাত-মুখ ধুতে গেলে ভাবল, ওদের সে সঙ্গে নিয়ে এলেই ভাল করত।

সুবল কেমন নিজের ওপর ভীষণ রেগে গেল। এটাই তার স্বভাব। সে প্রথম ভেবে নিতে পারে না কি করা উচিত। প্রথমেই ঠিক ওর উচিত ছিল, ওদের যেতে না দেওয়া। যেন মনে হচ্ছে, ওদের বৈভব দেখানোর জন্যই দীপুদের এই ছল-চাতুরী। এবং মায়ের যে শনিঠাকুরের ওপর একটা দুর্বলতা আছে কাকীমা তা জানতেন। তাদের বেশ একটা ট্র্যাপের ভিতর ফেলে দীপু নিয়ে গেল। শনি পুজোর কথা না বললে, মা কিছুতেই যেতেন না। যেতে চাইতেন না। মা না গেলে বাকিটা তার হাতে ছিল। সে ইচ্ছা করলেই এটা বন্ধ করতে পারত। দীপুর এমন একটা অবস্থা তাকে দেখতে হত না। সে এবার বাথরুমের জল ঝর ঝর করে ছেড়ে দিল।

সে জলের ঝাপটা দিল মুখে। ঘাড়ে গলায় জল দিল। সে সামান্য খেয়েছে। কিন্তু এখন কেন জানি মনে হচ্ছে খুব খাওয়া হয়ে গেছে। মোটামুটি সবই স্ন্যাক্স জাতীয় খাবার। কিছু সঙ্গে চিলি চিকেন ছিল। নামটা সে জানত না। কোন খাদ্যবস্তুর কি নাম দীপুই ওকে বলে দিয়েছে। খুব মুখরোচক। সে যা সামান্য ভেবে খেয়েছে এখন সেটাই কেন জানি অসামান্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। খাবারগুলো গুরু পাকের। এবং লাল নীল পানীয়-এর সঙ্গে না খেলে ঠিক হজম হবার কথা নয়। এসব ভেবে সে বাইরে আসতেই গড়ির হর্ন শুনতে পেল এবং দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। সে দরজা খুলে দেখল, মা। ইলু-বিলু পেছনে হেঁটে আসছে।

দরজা খুলতেই বারান্দার আলোটা এসে মায়ের মুখে পড়ল। সুবলকে দেখে মা কিছু বললেন না। তিনি হেঁটে গেলেন পাশ কাটিয়ে। সুবল বুঝতে পারল, মা রাগ করেছে তার ওপর। সে মায়ের মুখ দেখলেই টের পায় মা কেন রাগ করেছেন। সুবলের শিষ্টতার অভাব, সুবল কোন খারাপ কাজ করলে মা ভারি দুঃখ পান। সে লাবণ্য কাকীমার সঙ্গে দেখা না করে আসায় মা রাগ করেছেন। মার আশা ছিল, সে ভিতরে যাবে এবং শনি পুজোর প্রসাদ নেবে। ছেলেমেয়েদের দেব-দ্বিজে ভক্তি থাকবে না মার এটা পছন্দ নয়।

সুবল এবার ইলুকে ডেকে বলল, মা মুখটা গোমড়া করে রেখেছে কেন-রে?

—আমি কি জানি!

সুবল বলল, বা-রে তোমরা জান না, কে জানে। কাকীমা কোন অসম্মান করেছে তোদের?

—তুমি যে কি বল না দাদা!

—তবে মা মুখটা হাড়ি করে রেখেছে কেন?

—মাকে বল।

—আমার বয়ে গেছে। বলে সুবল কেমন যেন কঠিন উক্তি করে ফেলল। এবং এই কঠিন উক্তি সুবলের ভাল লাগে না। সে জানে মাকে এ-সময় হাসাতে না পারলে কিছুতেই সে শান্তি পাবে না। সে কেমন ভালমানুষ সেজে মায়ের ঘরে ঢুকল। এবং মা যে বিছানায় শোয় সেখানে সে শুয়ে থাকতে পারে। এককাত হয়ে পাশে সে শুয়ে থাকল। বালিশটা টেনে নিল না। সে বালিশ ছাড়াই মাথা রাখল খাটে। মায়ের এটা ভাল লাগবে না সে জানে। এ-ভাবে শুয়ে থাকা মায়ের পছন্দ হবে না। মা তাকে বালিশ ঠিকঠাক করে দেবে সে জানে।

সে-সব আজ মা কিছুই করলেন না। গায়ের চাদর আলনায় রেখে দিলেন। একবার শুধু বললেন, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। রাত অনেক হয়েছে।

সুবল বলল, থাক।

মা বললেন, কি থাক!

—এই থাক মানে থাক!

মা এবার আর পারলেন না। সুবল তুমি এমন হবে জানতাম না।

—কি করব বল। ওদের পার্টিতে কত লোকজন, ওদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করতে করতে আমার মনে হল তোমরা কখন চলে গেছ।

—মিথ্যা কথা বলার আর জায়গা পেলে না!

সুবল এবার উঠে এল। মাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, কি হয়েছে বল! আমি কি করেছি?

তুমি লাবণ্যের সঙ্গে একবার দেখা করে এলে না।

—আমার সেটা খেয়াল হয়নি।

—তোমার এমন খেয়ালের জন্য আমায় কথা শুনতে হয়!

—লাবণ্য কাকীমা তোমাকে কিছু বলেছে!

—কি বলবে! মুখ দেখলে আমি সব বুঝতে পারি।

—কিছু যখন বলেনি, তখন এসেই মিছিমিছি অশান্তি করছ কেন।

মা আর জবাব দিতে চাইলেন না। কিন্তু কোথায় যেন মনে হল, ছেলে তার বেশ জোর দিয়ে কথা বলছে, নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে চাইছে না। মা এবার ঘরে এসে গামছা দিয়ে পা মুছতে মুছতে বললেন, ওদের তুলনা নেই।

—কিসের তুলনা মা।

—এই যেমন অবিনাশ ক'দিনে বাড়িঘরের কি চেহারা করে ফেলেছে।

—ওদের নসিব ভাল।

—ঐ তোমার বাবার স্বভাব। জমিদারি করে কিছু আর শেখেনি। নসীব শিখেছেন, আগে এলে এমন হত!

মা আরো কি বলবেন সুবল বুঝতে পারে। এতটুকু বাড়িতে মায়ের খুব অসুবিধা। মা পাকিস্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসতে চেয়েছিলেন। যা ছিল ওতে করে বাবা বেশ রাজকীয় সম্মানে শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন। সেই এলেন সব খুইয়ে। যা কিছু অলঙ্কার ছিল, এবং কিছু ক্যাশ টাকা—কোনরকমে এখানে এনে বিক্রি-বাট্টাতে প্রথম এই ছোট তিন কোঠার বাড়ি। বাকিটা এখন যে-ভাবে চলছে—মার কোথায় লেগেছে সুবল সেটা টের পেয়ে বলল, তোমরা মা মেয়েরা খুব সহজে পরের জিনিসে লোভ দিতে পার।

—এটা তোমার অক্ষমতার কথা সুবল।

মা যে এমনভাবে তাকে নিয়ে পড়বে সে বুঝতে পারেনি। সুবল এমন কথার কোন জবাব পেল না। দীপুর কাতর মুখ ভেসে উঠলে সে বলল, মা, তুমি তো জানো, তোমার ছেলে ভীষণ অকাজের। তুমি ওখানে গিয়ে ভীষণ কষ্ট পেয়েছ। এবার থেকে প্রতি শনিবারে বাড়িতেই একটা পুজো দিও। তবে আর কোনদিন তোমাকে যেতে হবে না। গিয়ে আর দুঃখও পেতে হবে না।

—সে আমি যা ভাল বুঝব করব।

এই হয় সংসারে, কি করে যে প্রাণের ভিতর নানারকম ছোট-খাটো ঘটনা বড় নাড়া দেয়। মা কোনদিন এমন ছিলেন না। এমন কি সেখানে যাবার আগ্রহও কোনদিন তাঁর ছিল না। অথচ সকালে দীপু এসে সব গোলমাল করে দিয়ে গেল। লাবণ্য কাকীমার সঙ্গে দেখা না করায় মা এত যে কেন ক্ষেপে গেলেন বোঝা গেল

না। নানাভাবে সে আজকের মাকে ভাববার চেষ্টা করল। মা কি তবে দীপুকে দিয়ে এই সংসারের দুঃখী চেহারাটা পাল্টে দিতে চাইছে। দীপু এলে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা মিলে যাবার মত। সে এসব ভেবে নিজের মনেই হাসল। সে ওদের কাছে কিছু না, এতদিনে হয়ত মা সেটা ভালভাবে টের পেয়েছে। তাও লাবণ্য কাকীমার সঙ্গে দেখা করলে, একটু ভাল-মন্দ কথা বললে, তিনি সুবল সম্পর্কে উৎসাহ দেখাতেন—আমাদের সুবল তেমনি আছে দিদি। কি ভাল ছেলে! সুবল সম্পর্কে কথাবার্তা হলে মা হয়ত পুরোনো সম্পর্কের কথাটা পাড়তে পারতেন। সুবল বলল, মা, রাত হয়েছে। এবারে শুয়ে পড়। সকালে যত খুশি ঝগড়া করবে।

সুবল এই বলে মায়ের ঘর থেকে বের হয়ে ওর নিজের ঘরে ঢুকলে দেখতে পেল, বিলু জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। তুই এখনও জেগে আছিস?

—তুমি শুলে আলো নিভিয়ে যাব।

—মার কি হয়েছে রে?

—কি করে বলব দাদা?

—লাবণ্য কাকীমা মাকে কিছু বলেছে!

—না। কি বলবে! কাকীমাতো মাকে দেখে কি খুশি! সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। কাকাবাবুর ফটো। ঘরটা কি বড়। আর কত বড় খাট। দামি মোজাইক মেঝে। দেওয়ালে কত রঙ-বেরঙের ছবি। ঘরটায় ঢুকলে আর বের হতে ইচ্ছা হয় না। বড় বড় গোলাপ ভাসে। ধূপদানিতে সুন্দর গন্ধ ধূপের।

—লাবণ্য কাকীমা মাকে সব দেখাল।

—সবটা দেখাতে পারেনি। যেদিকে পার্টি দিচ্ছে দীপুদি সেদিকটায় কাকীমা যায় না, কতরকমের সব বড় বড় মানুষ আসে। কাকীমার ভারি লজ্জা।

—কাকার ছবিটা দেখতে কেমন রে!

—খুব মহান। এই লম্বা গোঁফ। দামি শাল গায়ে। হাতে একটা লাঠি। পায়ের কাছে বাঘ ছাল। বাঘের মুখ।

—আর কিছু দেখলি না।

—আর কি দেখব। অঃ হ্যাঁ, অনেক দামী আংটি আঙুলে। আটটা দশটা আংটি। ছবিটা দেয়াল জুড়ে। আঙুলগুলো কি মোটা মোটা। কাকার মুখে রাজ্য জয় করা হাসি। দেখলেই খুব মান্য করতে ইচ্ছা করে।

সুবল বলল, যা তুই। আলোটা আমি নিভিয়ে দিতে পারব। তারপর কেমন থেমে থেমে যেন বলা, তবে কি জানিস বিলু, ছবিতে মানুষের চেহারা ঠিক চেনা যায় না।

বৃষ্টি ঝরছিল। সকাল থেকেই সুবল ভাবছে একবার আনন্দদার বাড়ি যাওয়া দরকার। এসে পর্যন্ত সে দেখা করতে পারেনি। সব খবরাখবর দিয়ে দিয়েছে। তবু একদিন নিজে গিয়ে আনন্দদাকে না বলতে পারলে ঠিক যেন সে খুশি হতে পারছে না।

সকালে বাজার করে আসতে দেরি হয়ে গেল। দু'জন ছাত্র এসেছিল দেখা করতে। ছেলে দুটো পড়াশুনায় ভাল। সে ওদের নিয়ে বসে গেল, এবং বসে গেলেই যা হয়ে থাকে তার, সে নানারকম সমস্যার ভিতর পড়ে যায়, একটা সমস্যার যদিবা সমাধান খুঁজে বের করতে পারে, অন্যটার পারে না। সে যেহেতু আন্তরিক পড়াশোনার ব্যাপারে, গোঁজামিলের ব্যাপারটা আসে না, না জানলে সোজাসুজি বলে দেয়, তোমরা পরে এস, আমি দেখে রাখব।

সুতরাং সকালে ওর যাওয়া হল না। এ-করে সে কদিন থেকেই আর সময় করে উঠতে পারছে না। ইতু পর্যন্ত একবার ঘুরে গেল না। তা অবশ্য ইতুর এসময় এ-বাড়ি আসা উচিত না। এ-বাড়ি কেন, কোথাও বেশি বের হওয়া ঠিক না। আজ গিয়ে বৌদিকে এ-কথাটা বলে আসতে হবে। কবে যেন বাসে, তিন চারদিন আগেই হবে, সে ইতুকে শ্যামবাজার বাটার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। সে কলেজ থেকে একটু ওদিকে কাজ সেরে ফিরছিল। সে বাসে যেতে যেতে দেখল, ইতু চৌমাথার মোড়ে একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখছে।

যাবো যাবো করে যখন যাওয়া হচ্ছিল না, তখন ইতুর এই বের হওয়া ব্যাপারটা নিয়ে তার খুব একটা দায় বেড়ে গেল যেন। এবং এমনকি ইতু, গতকাল এখানেও ঘুরে গেছে এবং বিকেলে সব হাতের কাজ ফেলে সে যখন ইতুদের বাড়ির দরজায় হাজির তখন একটা সাইকেল রিক্সা ক্রিং ক্রিং বেল বাজাতে বাজাতে চলে গেল। সে অন্যমনস্কভাবে দরজার কড়া নাড়ল। রিক্সাতে যে মানুষটা বসে আছে তাকে যেন সে চেনে। লোকটাকে যে কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না। এই লোকটাকে সে আরও দুবার দেখেছে। একবার গড়িয়াহাটের কাছে, অন্যবার শ্যামবাজারের চৌমাথায়। লোকটাকে তার চেনার কথা নয় অথচ চেনা মনে হচ্ছে। সে এবার কিছুটা সংকোচের গলায় ডাকল, বৌদি, আমি সুবল।

এখনও দরজা খুলছে না কেউ। ফোটা ফোটা বৃষ্টি মাথায় কে বারান্দায় সানসেটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। রিক্সাটা চলে গেল। জ্যোৎস্নাবাবুর ডিসপেনসারি পার হয়ে একটা সরু গলির ভিতর ঢুকে গেল। কে লোকটা! সে যে এখানে আসে

লোকটা কি সেই খবরাখবর রাখে। অথবা এমন সব লোক সংসারে আছে যাদের সঙ্গে কেবল কোথাও না কোথাও দেখা হয়ে যায়। তার একবার ইচ্ছা হল, কোথায় যায় মানুষটা দেখে। কে সে! আর তখনই বৌদি ধীরে ধীরে দরজা খুলে অবাক।—বাঃ বাঃ, মনে পড়েছে তবে। ওরে ইতু দ্যাখ আমাদের হিরো এসে গেছে।

সুবল খুব উচ্ছল হতে পারল না। কারণ মানুষের দুটো চোখ কখনও কখনও কত ছোট হতে পারে অথবা নীচ এবং সন্দেহপরায়ণ, লোকটার চোখ না দেখলে যেন টের পাওয়া যায় না। সে বলল, আগে একটা তোয়ালে দিনতো।

বৌদি তোয়ালে দিলে সুবল মাথা এবং মুখ মুছে বলল, ইতু কোথায় বৌদি?

—ডাকলাম তো, কোন সাড়া নেই কেন বুঝছি না। বৌদি এই বলে ইতুর ঘরে উঁকি দিয়েই বলল, দ্যাখো মেয়ের কাণ্ড। চাদর গায়ে কেমন ঘুমোচ্ছে।

—এই অবেলায় ঘুম!

—তোমরা দেখ। আমি তো এতদিন দেখছি।

—বোধ হয় ঘুমিয়ে শরীর ভাল করছে।

—হবে হয়ত কে জানে! বলে বৌদি তাকালেন সুবলের দিকে। একটা চিরুনি দিচ্ছি। চুলটা আচড়ে নাও।

—হবে হয়ত নয় বৌদি। মেয়েরা সব জানে। কিসে কি হয় খুব ভাল জানে।

—তাই বুঝি! বলে বৌদি সামান্য হাসলেন।

—বিয়ে হবে মেয়ের। সব পাকাপাকি। ইতু তাই এখন কেবল ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শরীর মোটা করছে।

—কেন পাত্রপক্ষ কি ওর স্বাস্থ্য সম্পর্কে...?

—আরে না না। ইতুর নিজেরই ধারণা ও খুব দুর্বল। ওর বিশ্বাস আর একটু শরীরে মাংস হলে ওকে আরও সুন্দর দেখাবে।

—তোমাকে তাহলে এখনও এসব বলে।

—ওতো সবই বলে বৌদি। আর তোমরাও তো সেটা জানো।

বৌদি আবার ঠাট্টা করে বললেন, সংসারে কেন যে মেয়েটা তোমাকে এত আপন ভেবে ফেলল!

—অমন আপনার দরকার নেই বৌদি। মেয়ে ভারি সেয়ানা। যাবার সময় যা করেছে না! ভাগ্যিস ওদের সঙ্গে গাড়িতে দেখা হয়ে গেল। নয়ত কপালে যে কি ছিল! বলে সুবল হা হা করে হেসে উঠল।

—তুমিও কম যাওনা সুবল! সেদিন ইতুকে পৌঁছে দিয়ে কি হল না হল প্রায় কিছুই না বলে চলে গেলে। তোমার দাদা ফিরল রাতে। ইতুকে দেখতে পেয়েই

বলল, ওরা এসেছে। ইতুকে তো আর বলা যায় না কি হল! তোমার দাদা তাই মনে মনে তোমার খোঁজ করছিল। তারপরই বাবার চিঠি।

—আমি তো ভাবলাম ইতুই সব কিছু বলবে। ও যা খুশি!

—খুশি কোথায়! কেমন মুখ গোমড়া। কেবল খায়-দায়, বিয়ের নামে কেবল ঘুমোয়।

—তবু যা হোক একটা অজুহাত মিলে গেছে ঘুমোবার। আগে তো পড়তে বসলেই ওর ঘুম পেত।

—এখন বিয়ের কথা শুনলে ঘুমোয়।

—তারপর মেসোমশাই কি লিখলেন?

—লিখেছেন তুমি হিরো। ইতুর বিয়ে এমন যে বড় ঘরে হচ্ছে সেটার সব কৃতিত্ব প্রায় তোমার। পাত্রের পিসিমা তোমাদের প্রতিবেশী ছিল—এসব কথাও তিনি লিখেছেন। পাত্রের পিসেমশাই তোমাদের কাছারি বাড়ির নায়েব ছিল। তোমার পরিচয়ে এখন ইতুর পরিচয়।

সুবল বৌদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে বসার ঘরে ঢুকে গেল। আনন্দদা বাড়ি নেই। এ-বাড়িতে একটা স্বাধীনতা আছে তার। দু'তিনটে তানপুরা। ছোট বড় মিলিয়ে যার যখন খুশি একটা বাজায়। বৌদি এখন চা করবে সে জানে। কেউ এলেই বৌদি চা আর সামান্য ভাজাভুজি দেন। এবং এমন সব মুখরোচক খাবার দেন যে লোভ সামলানো দায়। সে পাশের একটা তক্তপোশের ওপর উঠে বসল। মোটা নরম গদি এবং ওপরে রঙ-বেরঙের চাদর। সে বেশ পা-দুটো ভাঁজ করে বসল। এবং একটা তানপুরা নিয়ে কোলের ওপর রেখে কি দেখল চারপাশে। সে গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজল মনে-মনে। অথচ বৌদি এখনও যাচ্ছেন না। কিছু আরও বলতে চান যেন। সে হাত তানপুরার ওপর রেখেই বলল, ইতু খুব চটে উঠত। যদি বলতাম, জানো ইতু আমাদের মঠে অনেক টিয়াপাখি থাকত। হাজার হাজার টিয়াপাখি। সে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ইতু মুখ ভেংচে বলত, সব বঙালরাই দ্যাশে একটা জমিদারি ফ্যালাইয়া আইছে। বলত না বৌদি! তারপর একটু হেসে বলল, ওকে ডেকে তুলে দিন না, পেছনে ওর লাগা যাক। বলে সুবল হা হা করে হেসে উঠল।

—ওর কথা বাদ দাও। বড় খামখেয়ালি।

—বিয়ে হলে ও খুব সুখী হবে। বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল সুবল। সোনার টুকরো ছেলে আপনাদের ভাষায়। এইটুকু বলে সুবল কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সে কালকে অমলকে দেখেছে। হাজারিবাগের অমল এবং এ অমল যেন আলাদা মানুষ। অমল বড়লোক। বড়লোকের নানারকম খেয়াল

থাকা স্বাভাবিক। তার বাবারও এক সময় কিছু খেয়াল ছিল। যা এখনও মা তাকে মাঝে মাঝে শোনাতে ভোলে না। কিন্তু বাবার জীবনে এধরনের কিছু ছিল না। সে কেন যে অমলের কথা ভাবতে ভাবতে বাবার কথা ভেবে ফেলল ঠিক এ সময় বুঝতে পারে না। গত রাতের ঘটনায় মা যে এত রুষ্ট হবে সে বুঝতেই পারেনি। এখন অমলের সঙ্গে তার দুই বান্ধবীর মুখই মনে পড়ার কথা—অথচ কেন যে এমন হয়, সব নানা রঙের ছবি এলোমেলো চোখের ওপর ভেসে যাচ্ছে। ইতুর এবং অমলের প্রায় বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক। এ সময়ে আনন্দদাকে এসব বলাও যায় না। বলতে গেলে সেই ছোট হয়ে যাবে। ওকে নীচ হীন ভাবতে পারে ইতু। ওর একটা লোভ আছে ইতুর ওপর সেটা সে ভেবে ফেলতে পারে। সে বলল, খুব অন্যমনস্কভাবে বলল, এমন সোনার টুকরো ছেলে হয়না বৌদি।

তারপর সে ভাবল, বড়লোক হলে, পয়সা থাকলে পুরুষ মানুষের এসব থাকে। বিয়ের পর সব ঠিক-ঠাক হয়ে যায়। সুতরাং সে বলল, বিয়ের তারিখ কবে ঠিক করলেন?

—বিয়ে বাইশে জ্যৈষ্ঠ। বাবার ইচ্ছে বিয়ে কলকাতাতেই হোক।

—সেই তো ভাল। আমরা খেটেখুটে দিতে পারব। খেতে পারব খুব বিয়েতে, খুব আনন্দ করা যাবে।

—তোমার দাদার ইচ্ছা হাজারিবাগে।

—হাজারিবাগে কেন! আনন্দদা তো ভারি স্বার্থপর। আমাদের ফেলে একা একা সব সেরে ফেলতে চায়!

—কেন তোমরা যাবে।

—এতদূরে কে যাবে বলুন।

—দূর কোথায়! তোমরা যে কি হয়েছ না! বলে বৌদি ঘরের যেখানে যা কিছু অগোছালো ছিল ঠিক করে দিতে থাকলেন।—একটু বাইরে যেতে গেলেই বাবুদের মুখ ভার হয়ে যায়।

বৌদির এমন ব্যবহার সুবলের কোথায় যে ভাল লাগে! এই সংসারে এই মানুষটি সব আগলে রেখেছে। বৌদির চোখ-দুটো ভারি সুন্দর। খুব একটা সাজপোশাক পছন্দ করেন না। সরল সাদাসিধে থাকতে তিনি ভালবাসেন। বয়সে যত না, চালচলনে তার চেয়ে বেশি দেখানোর স্বভাব। এমন সহজভাবে একজন মেয়ে এই ঘরে কি স্বচ্ছন্দ—আপন জনের মত, সুবল বৌদির সুন্দর সুদৃশ্য হাতের কাজ দেখতে দেখতে একসময় বলল, বৌদি আপনি একমুহূর্ত বসতে পারেন না। কথার ভিতরও কাজ করতে এত ভালবাসেন। ইতু হলে এখন শুধু গল্পই করত। ইতু দরজার পাশ কাটিয়ে যেতেই এমন বলল। ইতুর ঘুম ভেঙেছে।

ইতু শুনলে জমবে ভাল, বলে সুবল একবার দরজার দিকে তাকাল।

ইতু কিছু বলল না। কারণ ইতু বললে এতক্ষণে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যেত। সে যে আসছে না এটা একদিকে ভালই হল। ইতুর মুখ দেখে ওর মনে হয়েছে এ-সব বলা এখানে ঠিক না। বিয়ের আগে শুধু যশের কথা, রূপের কথা। অন্যান্য কথা এ-সময় শোভা পায় না। তা ছাড়া ইতুর মুখটা ঘুমিয়ে খুব ফুলে গেছে। মুখ গম্ভীর করে রাখলে এমনিতেই ভয় সুবলের। তার ওপর ঘুমোনোর জন্য মুখটা আরও ভারি। সে কেন যে এমন বলতে গেল!

কিন্তু ইতু আর যথার্থই এদিকে এল না বলে সে একটু দমে গেল। তারপর কি বলা যায় এমন ভেবে যেন বলা।

—যাই বলুন হাজারিবাগে করলে আমার যাওয়া কিছুতেই হবে না।

—না গেলে বিয়ে আটকে থাকবে না। দরজার ওপাশ থেকে কে যেন কথাটা বলে চলে গেল।

দুজন চোখে মুখে ইশারা করল প্রথম।

সুবল বলল,—শুনলেন তো? সব শুনছে ও-পাশ থেকে।

—যাকগে বৌদি চা দিন। বেশিক্ষণ বসব না। তারপর সুবল কান খাড়া করে রাখল। আর কোন কথা আসে কি না। না কেউ আর কোন কথা বলছে না। সে এবার উঠে পড়ল। তানপুরাটা জায়গা মত রেখে বলল, এখন তো সবাই এমন বলবে। কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি। এইটুকু বলে সুবল ভাবল আবার জনান্তিকে কথা ভেসে উঠবে। কিন্তু না কোন শব্দ নেই।

বৌদি বললেন, এত তাড়াতাড়ি উঠলে চলবে কেন। তোমার দাদা বার বার বলে গেছে, সুবল এলে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

—আর একদিন করব।

—না সুবল, ওর দরকার তোমাকে। তোমাকে একটু বসতে হবে।

সুবল আর না করতে পারল না। সে টুকুন কোথায় দেখার জন্য ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। বস্তুত সে এখন টুকুনকে খুঁজছে না। খুঁজছে সেই মেয়েকে। যে শুধু সারাজীবন ওর সঙ্গে জনান্তিকে কথা বলে গেল। সে ডাকল, টুকুন, টুকুন।

বৌদি এদিকে নেই। উনি হয়ত এখন রান্নাঘরে। ওর জন্য চা করছেন। এবং কিছু খাবার সঙ্গে। সুবল দেখল, বৌদি আজকে ওর সঙ্গে বড় সমীহ করে কথা বলছেন। এমনিতেই বৌদির ব্যবহার আপনজনের মত, কিন্তু আজকের ব্যবহারটায় কি যেন একটা ফারাক আছে। সে ফের ডাকল, টুকুন, টুকুন।

কোত্থেকে টুকুন এসে, একটা বাচ্চা হরিণের মত ওকে জড়িয়ে ধরল।—তুমি আমাকে ডাকছিলে?

—হ্যাঁ। ডাকছিলাম। মেয়েটা কোথায় গেল! এদিকে খুঁজছি, ওদিকে খুঁজছি, কোথায় সেই মেয়েটা। তখন ডাকলাম।

—মেয়েটা খুব পাজি না কাকু?

—খুব পাজি।

—মেয়েটাকে তুমি ধমক দিতে পার না।

—এবার থেকে তাই দেব।

—বকে দেবে। দুষ্টুমি করলে মারবে।

—তাই করব। বলে সুবল ওকে কোলে তুলে নিতে চাইলে টুকুন উঠল না—আমি কাকু জানো এত বড় একটা ছবি এঁকেছি।

—এতক্ষণ তবে ছবি আঁকছিলে।

—হ্যাঁ। পিসির ছবি।

—ছবিটা আমাকে দেখাবে না?

এমন বলতেই টুকুন ঘরের ভিতরে ছুটে গেল। সে আলমারির ভিতর থেকে খাতাটা টেনে বের করল। এবং বের করতে গিয়ে দোয়াত উল্টে দিল। সব মেঝেতে কালি। ইতু দেখেই ক্ষেপে গেল। সে ছুটে গিয়ে বলল, কি হচ্ছে এ সব! টুকুন ভীতু স্বভাবের মেয়ে। পিসির ধমকে সে ঠোঁট উল্টে দিল। বাইরে দাঁড়িয়ে সুবল এমন দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। সে বলল, এদিকে চলে এস। পিসির সঙ্গে আর কথা বলবে না।

সুবল একটু নুয়ে ছবিটা দেখতে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। মুখ ফোলা গোবিন্দের মা ছবিটার নাম দিয়েছে। টুকুন ভীষণ চালাক, সে যেন সব ধরতে পারে। ছবিতে ইতুর অবয়ব স্পষ্ট নয়। সে শুধু গোল গোল দুটো শূন্য পাশে এঁকে দুটো চোখ বোঝাতে চেয়েছে। সরু একটা টান দিয়ে নাক, লম্বা সরল রেখা এঁকে পিসির শরীর। সে টুকুনের এমন একটা ছবিতে ইতুর ভিতরের ছবিটা ধরে ফেলে কেমন আবার মিইয়ে গেল। সে চারপাশে তাকাল। আবার ইতু এ-ঘর থেকে কখন বের হয়ে গেছে! সে এবার টুকুনকে বলল, দ্যাখতো পিসি কোথায়।

—ওখানে পিসি। কোথায় থাকবে পিসি টুকুন যেন না খুঁজেও বলতে পারে।

এবং সে পাশের ঘরে ঢুকে দেখল ইতু জানালার সামনে বসে রয়েছে। সামনে একটা ছোটমত জায়গা। শুকনো এবং নীরস—পাড়ার ছেলেরা বল খেলে যে সামান্য ঘাস ছিল তা পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। ইতু বসে সেই নীরস মাটির ভিতর কি যেন অনুসন্ধান করছে।

সুবল ডাকল, ইতু।

ইতু মুখ ফেরাল না। এমন কি, কথা বলল না।

সুবল বলল, ইতু মাঠে তুমি কি দেখছ?

ইতু বলল, কিছু দেখছি না।

—এমন চুপচাপ! তুমি নাকি এখন কেবল ঘুমাও?

—ঘুমোই ভাল করি।

—গতকাল নাকি আমার খোঁজে বাড়ি গিয়েছিলে?

ইতু জবাব দিল না।

—কাল দীপুর জন্মদিন গেছে। আমি সেখানে ছিলাম।

—ছিলেন, ভাল করেছেন।

ইতু এখন আবার আপনি আপনি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। সে এই মেয়ের স্বভাব কিছুতেই ধরতে পারে না। সে কেমন ভীতু গলায় বলল, তুমি কেন গিয়েছিলে বললে না তো?

—কেন যাব আবার। বেড়াতে গেছিলাম। মাসিমাকে অনেকদিন দেখি না, তাঁকে দেখতে গেছিলাম।

সুবল কিছু না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তারপর কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে বাড়ি থেকে নেমে গেল।

বৌদি এসে দেখলেন, সুবল নেই। সুবল চলে গেছে। বৌদি টুকুনকে বললেন, তোর সুবলকাকু কোথায় দ্যাখতো।

—নেই মা।

—তোর পিসির ঘরে দ্যাখ!

—পিসির ঘরে নেই।

ইতু মানুষটাকে চুপচাপ হেঁটে চলে যেতে দেখেছে। বৌদির খোঁজাখুঁজি সে শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু কিছু বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তবু টুকুন ফের ওর ঘরে এসে কিছু বললে, সে বৌদিকে বলল, সুবলদা চলে গেছে।

এবার টুকুন ছুটে বের হয়ে গেল। মা মা। পিসি বলল, কাকু চলে গেছে।

বিশ্বাস হল না বৌদির। এমন ভীতু মানুষ, এমন সৌজন্যবোধ সম্পন্ন মানুষ না বলে চলে যাবে, তিনি ভাবতে পারলেন না। তিনি ইতুর ঘরে ঢুকে বললেন, ইতু নিশ্চয়ই ওকে কিছু বলেছিস?

—আমি কি বলব?

—তবে চলে গেল কেন?

—সে ওকে জিজ্ঞাসা করবে।

—সে তো এমন মানুষ নয়। তুই নিশ্চয়ই ওকে অপমান করেছিস।

—বৌদি! ইতু প্রায় চিৎকার করে উঠল—বৌদি, আমি ওঁকে অপমান

করিনি। ওঁকে আমি অপমান করতে পারি না। ওঁর মান অপমান বোধ বড় কম। বলে সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

এ ঘটনায় বৌদি প্রায় ঝড়ের মুখে পড়ে গেলেন। মেয়েমানুষ তিনি, মন জানেন মেয়েমানুষের—তবু এইসব দুর্বলতা একদিন কেটে যায়। বেশিদিন থাকে না। নিজের জীবনের কিছু পুরোনো ঘটনা স্মরণ করে মনে মনে হাসলেন। যেন বলার ইচ্ছা, ওলো ভাগী, আগে বলতে হয়। এখন আর কি করার আছে। তবে দুঃখ করিস না। সোনার টুকরো ছেলে অমল যখন হাত ধরে পদ্মদীঘিতে নিয়ে বলবে, দ্যাখো কেমন স্ফটিক জল, পা ডুবিয়ে বস, জলে মুখ দ্যাখো, নিজের প্রতিবিম্ব দ্যাখো, তখন সময়ে অসময়ে জলে এই মানুষের মুখ সহসা দেখে ফেলবি—কিন্তু সোনার রাজপুত্র হাত ধরে রাখলে বেশিদূর যাওয়া যায় না। পা ডুবিয়ে জলে খেলা করতে ইচ্ছা হবে। তখন এই মানুষের কথা মনে হলে মুখ বিষণ্ণ করে রাখবি। আর যখন রাজপুত্রটি বলবে, কি গো মুখ গোমড়া কেন, তখন বলবি, এই এমনি। মরে গেলেও তোর কষ্টের কথা বলতে চাইবি না।

ইতু চুপচাপ বসে থাকল খাটে। যেমন সে জানালা দিয়ে সেই শুকনো মাঠ দেখছিল এখনও তেমনি সেই মাঠ দেখছে। কিছু কাক উড়ছিল, কিছু শালিক উড়ছিল। মাঠের ভিতর ঘাসের ছায়ায় ওরা হারিয়ে যাচ্ছে। আবার কোথা থেকে উড়ে এসে কক্ কক্ করছে। সামান্য বৃষ্টির জলে মাঠের শুকনো ভাবটা কেটে গেল না। কেবল সে বসে থেকে কিছু পশু পাখির শব্দ শুনতে থাকল।

সুবল হাঁটছিল ক্রমে। সে বড় রাস্তায় গিয়ে বাস ধরতে পারত। কিন্তু বাসে ভিড়। ঠিক ভিড়ের জন্য যে সে যায়নি তা ঠিক না। বরং একটু হেঁটে যেতেই ওর ভাল লাগছিল। সে যখন হেঁটে যায় নিজের ভিতর তখন ডুবে যেতে পারে। নিজের একটা রহস্যময় ভাললাগার ব্যাপার আছে যেখানে সে মাঝে মাঝে একা থাকতে চায়। ইতুর এমন ব্যবহারের পর নিজেকে খুব ওর একা পাবার ইচ্ছা হচ্ছিল। এবং এখন সে যাচ্ছে। দুপাশে ছোট বড় দালান-কোঠা, সরু পথ, মাঝে মাঝে রিকসার টুঙ টাঙ শব্দ, সব কিছুর ভিতর তার একা এক মনোরম রাজ্যের ভিতর ডুবে থাকার সাধ। সে নিজের সঙ্গে নিজে অভিনয় করছে। আর মনে হয় অভিনয়টা বুঝি ইতু ধরে ফেলেছে। অথবা ইতু সব জানে, সব বোঝে। ইতুর পক্ষে যেমন সম্ভব নয়, ওর পক্ষেও আর তেমন কিছু সম্ভব নয়। হাজারিবাগ থেকে ফেরার পর সে একদিনও তানপুরা নিয়ে বসেনি। ইতুকে কেন্দ্র করে গান বাজনার সখ এবং স্বপ্ন দেখার সখ ওর কেমন উবে গেছে। সে মাঝে মাঝে কলেজ শেষে কোন পার্কে চুপচাপ বসে থাকত। বাড়ি ফিরতে তার ভাল লাগত

না। কেমন সে বিষণ্ণতায় ডুবে যাচ্ছিল।

অথচ তার আজকের ব্যবহার একেবারে উল্টো। সে গিয়েই এমন ব্যবহার করেছে, মনেই হবে না ভিতরে তার একটা জ্বালা আছে। এমন কি ইতু অথবা বৌদি ওর দুর্বলতা যাতে টের না পায়—যেমন সে রোজ এসে তানপুরা নিয়ে বসে এবং মাঝে মাঝে ইতু অথবা টুকুনকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে, আজও তেমনি ঠাট্টা-তামাসার ভিতর ডুবে যেতে গিয়ে দেখল, সে ঠিক ডুবে যেতে পারছে না। ইতুকে দেখলে তার কেমন ভয় ভয় লাগছে। ইতুর মুখ খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না।

আর সেই লোকটি যে কে! সুবল সামনের একটা চায়ের দোকানে বসে পড়ল। ছোট বেঞ্চি। বেঞ্চির একপাশে বসে বলল, এক কাপ চা দেবেন। দোকানটা বেশ নিরিবিলি। ওপরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে। গাছের ছায়ায় এই সময়টা খুবই ঝকঝকে মনে হচ্ছে। এবং এখন যদি দীপু ওদের দামী গাড়িটা নিয়ে এই পথে যায় তবে দেখে ফেলবে, ওর সুবলদা একটা ভাঙা বেঞ্চে বসে চা খাচ্ছে। ওর ভারি হাসি পেল এমন একটা ভাবনায়। দীপু ওর চেয়ে অনেক ওপরে—দীপুর কথা ভাবা ঠিক না। ভিতরে সে যে কত বেশি দীন হীন এসব ভাবনায় তা টের পাওয়া যায়। যতই সে অহমিকা নিয়ে থাকুক, মনে মনে দীপুর সৌজন্যবোধকে সে ভুলতে পারছে না। এবং সেই মুখার্জী সাহেবের সঙ্গে কি যে একটা সম্পর্ক দীপু পাতিয়ে নিয়েছে, খুব বেশিদূর দীপুর পক্ষে যাওয়া সম্ভবও নয়, কারণ সে শৈশবের দীপুকে জানে। তারপরই মনে হল—এটাও একটা তার দুর্বলতার ব্যাপার। দীপুকে সে সতী-সাবিত্রী করে রাখতে চায় মনে মনে।

চা খাবার সময় সব এলোমেলো চিন্তা এসে জট পাকাচ্ছে মাথায়। এবং চা মুখে দেবার সময় মনে পড়ল, বৌদিকে সে চা করতে বলেছে। বৌদি চা নিয়ে এসে দেখবে সে নেই। ছিঃ ছিঃ, সে যে কি করল! তা ছাড়া বৌদি বারবার বলেছিল বসতে। আনন্দদা আসবে এবং ওর সঙ্গে কি কথা আছে। সে ভাবল একবার ফিরে যাওয়া দরকার। অথচ সে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। এতটা পথ হেঁটে যাওয়া ফের...সে নানারকমের অজুহাত খুঁজতে গিয়ে দেখল, অজুহাত ঠিক টেকে না। কিন্তু দোকানীকে পয়সা দেবার মুখে মনে হল ইতুর কঠিন মুখ, ইতু একবার ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখেনি পর্যন্ত। কোথায় যে অসম্মানের কাঁটা বাজে, আর কাটা কাটা কথা ইতুর, নিষ্ঠুর জবাব, যেন সুবল ঘুর ঘুর করে ইতুর পাশে সব সময় বেড়াতে চায়। এমন সময়ে এটা ঠিক না। ইতুর কথাবার্তায় সে এমন একটা আঁচ পেয়ে বুঝি বেদনায় স্থির থাকতে পারেনি। অন্যমনস্কভাবে সারাটা পথ হেঁটে এসেছে।

পয়সা দেবার সময় সুবল বলল, দুটো উইলস্ দেবেন। তারপর সুবল একটা উইলস্ ধরিয়ে নিল। আকাশ পরিষ্কার। রাস্তায় আলো জ্বলে গেছে কখন। সে বাকি পথটাও হেঁটে হেঁটে মেরে দেবে ভেবে পা বাড়াল।

সে বাড়ি ফিরে দেখল, ঘরগুলো কেমন অন্ধকার। আলো জ্বালা হয়নি। অথবা গলির মোড় থেকে মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই। এমন হয় না কখনও। মা, ইলু বিলুকে নিয়ে কোথাও বাড়ি খালি ফেলে যায় না। কেউ না কেউ থাকে। কেবল সেদিনই যে মার কি হয়েছিল, সবাই মিলে দীপুদের বাড়ি গেল! আর মার এই বাড়িতে কোথাও যেন কিছু অমূল্য সম্পদ আছে যা মা না থাকলে হারিয়ে যাবার ভয়। কি যে এমন জিনিস! যা কিছু আছে সবই চোখের ওপরে, অথচ মার এমন একটা ভাব যেন তিনি কিছু গুপ্তধন এ-বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন। বাবা মারা যাবার সময় বুঝি কিছু গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে গেছে যা মা কাউকে বলছে না। তখন সুবলের ভারি হাসি পায়। কিছুই নেই অথচ মা বাড়ি থেকে একেবারে কোথাও যায় না। বাড়িটাই মার কাছে এখন বাবার স্মৃতি—সবকিছু। সে এমন সব ভেবে আর একটু এগিয়ে দেখল, ঘরগুলো ঠিক অন্ধকার নয়। ভিতরে মোমবাতি জ্বলছে। সে বুঝল লাইট গেছে। লাইট হামেশাই যায়। অথচ আজ এটা তার মনে হল না কেন? বাড়িটাকে আশ্চর্য অন্ধকার অন্ধকার লাগছে! সেখানে সে কখনও যেন পৌঁছাতে পারবে না এমন মনে হচ্ছিল।

মোমবাতির আলোতেই মার মনে হল, সুবলের মুখটা ভারি। কেমন থম থম করছে। কিছুটা ভীতুগোছের সুবল। কিন্তু আজকের মুখটাতে ভীষণ বেদনার ছাপ। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—আমাকে এক গ্লাস জল দেবে মা।

ইলু এ-সব কথা কি করে যে শুনে ফেলে। সে দৌড়ে এক গ্লাস জল এনে দিল। ইলুর স্বভাবই এমন। সে মাকে বেশি খাটতে দিতে চায় না। মা বেশিদিন খাটলে বেশিদিন বাঁচবে না এমন একটা ধারণা হয়েছে ওর। এবং মাকে সে যতটা পারে না কাজ করিয়ে রাখতে চায়। এমনকি দীপু এসে যখন ওদের গাড়িতে বেড়াবার জন্য নিয়ে যায় তখনও সব কাজ বাড়ির টুকিটাকি যা কিছু আছে সেরে বেড়াতে যায়।

ইলু জল নিয়ে এলে সুবল বলল, রাতে আমি খাব না। শরীরটা ভাল লাগছে না।

মা ও-ঘর থেকে শুনে বলল, খাবে না কেন? কি হয়েছে!

—ভাল লাগছে না। শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে।

—না খেলে শরীর আরও খারাপ লাগে।

সুবলের মনে হল, মা কি করে টের পায় সে একটা দুঃখের ভিতর ডুবে যাচ্ছে—মা কি করে যে জানে সব! এবং মন ভার তার, পুরোনো ছবির মতো চোখে মুখে তার মালিন্য লেগে আছে, নতুন ছবি তুললে আবার সব ঝকঝকে হবে, বোঝাই যাবে না মলিন মুখে কোন করুণা ভেসে আছে—মনে মনে মা যেন নতুন ছবি তোলার কথা ভাবছে। এবং দীপু এলে মা কি যে করবে ভেবে পায় না। সুবল বুঝতে পারল, মা আবার আর একটা দুঃখ পাবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

সেদিন রাতে সুবল একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। প্রথমেই সেই সাদা রঙের গাড়িটা। গাড়িটার বনেট খোলা। পাশে একটা বড় দেবদারু গাছ। গাছে একটাও পাতা নেই। এবং বোধ হয় কোন নদী হবে, নদীর জল বরফ হয়ে গেছে। কাছে নৌকা এবং লঞ্চ। ওদের নিচে চাকা লাগানো। বরফের ওপর দিয়ে ওরা স্কি খেলার মত উঠে যাচ্ছে নেমে যাচ্ছে। এবং দীপুর শরীরে নীল রঙের পোশাক। নীল রঙের মালা গলায়। পায়ে নীল রঙের শ্লিপার। এমনকি ঠোঁটের রঙ নীল। চোখ টানা টানা। যত টানা তার চেয়ে বেশি কাজল টেনে লম্বা করে নিয়েছে। চুলগুলি পর্যন্ত নীল রঙের। সুবলের খুব দীন হীন চেহারা। জোরজার করে সুবলকে সেই চায়ের দোকান থেকে তুলে নিয়েছে। চায়ের দোকানী, সে দুটো উইলস্ নিয়েছিল বলে পাত্তা দিচ্ছিল না, কিন্তু একটা গাড়ি রাস্তায় এসে থামতেই দোকানীর মাথা ঘুরে গেল। মাথা ঘুরে গেল যখন দেখল সুবলকে হাতে পায়ে ধরে সাধ্য-সাধনা করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, লোকটা লাফ দিয়ে নেমেছিল এবং স্যার স্যার আপনার সিগারেট। সুবল বসে বসে সেই সিগারেটটা খাচ্ছে। নীল রঙের আকাশ। কেবল নদীর জল বরফ। এবং একটা রঙই রুপোলি। আঁকাবাঁকা মসৃণ রুপোর পাতের মত অনেক দূরে চলে গেছে। এবং সবাই স্থির। ওর সিগারেটের ধোঁয়াটা পর্যন্ত স্থির। কিছু ওপরে উঠেই স্থির হয়ে আছে। এবং কোন লোকজন নেই। নৌকাগুলো অথবা লঞ্চগুলো কে যে চালাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। দীপু ওর হাত ধরে নিয়ে যায়। বনেট বন্ধ করে দিচ্ছে। তারপর নিচে গড়িয়ে নামতেই বনেটটা আবার খুলে গেল। আর রুপোর পাতের ওপর দিয়ে স্কি খেলার মত ছুটতে থাকল। সে দেখল, বনেটটা লাফাচ্ছে বার বার। দীপু খুব বেগে এঁকেবেঁকে গাড়ি চালাচ্ছে। মনে হচ্ছে কখনও সে নৌকার ওপর অথবা লঞ্চের ওপর তুলে দেবে। কি যে সাহস মেয়ের। অদ্ভুতভাবে টার্ন নিয়ে একেকবার দুর্ঘটনা থেকে ওকে রক্ষা করছে। সে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে দীপু প্লিজ, তুমি এমনভাবে চালিও না। প্লিজ দীপু, তুমি একটা সর্বনাশ করবে। দীপু, লক্ষ্মী মেয়ে তুমি যা বলবে আমি তাই করব। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল গাড়ির বনেট পড়ে গেল। ওরা স্থির হয়ে একজন অন্যজনের ওপর শুয়ে আছে।

শরীরে কোন বসন নেই। সুবলের শরীরের ভিতর থেকে গরম স্রোত নেমে আসছে। সুবল নড়তে পারছে না। সুবল ঘুম ভাঙলেও চুপচাপ শুয়ে থাকল। সে নড়তে পারছে না। যা নেমে আসছে তাকে নামতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হল।

সন্ধ্যার সময় সুবলের মনে হল একবার আনন্দদার বাসায় যাওয়া দরকার। সে কলেজ থেকে দুবার আনন্দদার অফিসে ফোন করেছিল, দুবারই এনগেজ্ড সাউন্ড পেয়েছে। গতকাল সে খুব একটা অন্যায় করে ফেলেছে। বৌদির ওপর কোন রাগ অভিমান নেই। সে ইতুর জন্য এভাবে বাড়ি ছেড়ে এসে ঠিক করেনি। সকাল থেকেই সে কখন কলেজে যাবে এবং গিয়ে ফোন করবে আনন্দদাকে সেই ভেবে ছটফট করছিল। অথচ কলেজে গিয়ে অফিসে কোন যোগাযোগ করতে পারল না। বিকেলে বালীগঞ্জের দিকে একটা গানের কলেজে কিছুক্ষণ থাকেন। সেখানে ফোন থাকে না। সুতরাং একটু রাত হলে সে নিজেই চলে যাবে। তখন আনন্দদা বাড়ি থাকবেন। কালকের ঘটনায় হয়ত বৌদি খুব হাসাহাসি করবেন। বৌদি সুবলকে জানেন বলেই কোন দোষ নেবেন না। এবং সে কতটা অন্যমনস্ক এই ভেবে আনন্দদাও না হেসে পারবেন না। এমনকি রসিকতা করে আনন্দদা যা বলেন, এবার ওকে বিয়ে দাও রানু। মাসিমাকে বলে একটা মেয়ে ঠিক করি। না হলে ওর হয়ে কে যে কি দেখবে!

সুবল সার্ট গায়ে দিয়ে মাকে বলল, আমি একটু বের হচ্ছি মা। ফিরতে একটু রাত হবে।

—তোমার আবার এ অসময়ে কোথায় যাবার দরকার পড়ল!

—অসময় কোথায় দেখলে মা!

—এখনতো তোমার টিউশনি নেই।

—আমি একটু আনন্দদার বাড়ি যাব।

—কাল না একবার গেলে!

—গেছিলাম। কিন্তু যার জন্য গেলাম তারই দেখা পাওয়া গেল না।

—ইতুতো একদিন মাঝে এসেছিল।

—ইতুর কথা বলছি না। আনন্দদা বাড়ি ছিলেন না। ওঁর সঙ্গে আমার দরকার।

—ইতুর বিয়ে কবে ঠিক হল?

—ঠিক জানি না। ইচ্ছে করেই সে সব চেপে গেল।

—তোর আনন্দদাকে বল না, ইলু-বিলুর জন্য দুটো সম্বন্ধ দেখে দিতে। তোকে দিয়ে তো কিছু হবে না!

—সব হবে মা, সব হবে। একটু সময় দাও। আমিও দেখবে রাজার মত গাড়ি

চড়ে বৃন্দাবনে যাব।

—তা যাবে বৃন্দাবনে, যাও। সকাল সকাল ফিরবে। বেশি রাত করবে না। এখন আমি আর জেগে থাকতে পারি না।

—তোমাকে কে জাগতে বলে! অথচ সুবল জানে, এ কথার কোন মানে নেই। মাকে বার বার বলেও এ অভ্যাস সে ত্যাগ করাতে পারেনি। সে না এলে সংসারে কেউ রাতের খাবার খাবে না। সে খেলে ইলু-বিলু তারপর মা। সে তাই ফের বলল, কথা হয়ে গেলেই ফিরব।

সুবল ঘড়ি দেখল, রাত খুব বেশি না, সামান্য রাত। বোধ হয় সাতটাও বাজেনি। তখন দীপুর গাড়ির শব্দ। হর্নের শব্দ। এবং দীপুর গাড়ির শব্দ সে হাজারটা গাড়ির থেকে আলাদা করে চিনতে পারে। দীপু গাড়ি পার্ক করবার সময় কেমন নিমেষে কাজ সেরে ফেলার মত একদিকে গাড়ি রেখে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। তখন দীপুকে মনেই হয় না দীপু মেয়ে, এত স্মার্ট আর চোখে মুখে এমন এক নির্লিপ্ত ছবি যে ওর আঙুলে রিঙ ঘোরালে সমবয়সী বন্ধু বলে মনে হল।

দীপু বাড়িতে ঢুকলেই সুবলকে দেরি করিয়ে দেবে। সে-তাড়াতাড়ি পায়ে জুতো গলিয়ে দরজার মুখে এসে নামতেই দীপু প্রায় পথ আগলে রাখার মত করে বলল, কোথায় যাচ্ছ?

—আনন্দদার বাড়ি।

—এখন আবার আনন্দদার বাড়ি যেয়ে কি হবে!

—ইতুর বিয়ের ব্যাপারে কিছু দরকারী কথা আছে। আনন্দদা যেতে বলেছেন।

—আজই।

—না, তেমন কিছু বলেন নি।

—তবে পরে হলেও যখন চলবে, ভিতরে এস।

—কিন্তু।

—না না, কিন্তুর কিছু নেই। এস। বলে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে যাবার মত সুবলকে ভিতরে নিয়ে গেল।

ইলু-বিলু দীপুদিকে দেখে খুব খুশি। দীপুদিকে ওরা কিছুতেই দূরের মানুষ এখন আর ভাবতে পারে না। বড় আপনজনের মত ব্যবহার দীপুদির। সে থিয়েটার, সিনেমা এবং যত প্রদর্শনী থাকছে এই শহরে সব দেখাচ্ছে। সুবলের ফিরতে প্রায়ই রাত হয়। সে টের প্রায় না দুপুরে দীপু আসে। ইলু-বিলুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মা কিছু বলেন না। কারণ মা জানেন সুবলের এসব পছন্দ না। দীপু

সুবলের অজান্তেই এ কদিনে মার আর একটা মেয়ে হয়ে গেছে প্রায়। মার মন কেড়ে নিচ্ছে। যে সামান্য অভিমান ছিল শশীঠাকুরপোর ওপরে এবং রক্তে যে নীল রঙের গরিমার জন্য এতদিন মা চুপচাপ ছিলেন—এখন সেই মা, কাকীমা এবং দীপুর ব্যবহারে মুগ্ধ। কথায় কথায় দীপুর কথা, সংসারে এমন মেয়ে হয় না—শশীকাকার ইচ্ছার কথা শোনাতেন। সংসারে এমন কোমল-মতি রাজকন্যা এবং অর্ধেক রাজত্বের কথাও শোনাতেন। সুবল খেতে বসে কেবল শুনে যেত—হ্যাঁ বা হুঁ কিছু বলত না। চুপচাপ খেয়ে ইলুকে বলত, একটা লবঙ্গ দে তো। বলে সে তার নিজের ঘরে ঢুকে পর্দা টেনে দিত। যেন এ বাড়িতে সুবল বলে কোন মানুষের আর অস্তিত্ব নেই। একেবারে চুপচাপ সব। সুবল নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে অর্থনীতি বিষয়ক কিছু বই পড়ে কি যেন ভুলে থাকার চেষ্টা করত।

সেই দীপু এসেছে। এখনতো মা এবং মেয়েদের মুখ একেবারে আলাদা। কি খুশি সবাই। মা খুব জোরে জোরে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। ইলু-বিলু কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কে বলবে কিছুক্ষণ আগেও ওর বেরোনো নিয়ে মায়ের সঙ্গে মন কষাকষি হচ্ছিল।

দীপু পর্দা সরিয়ে একবার উঁকি দিল ঘরে। দেখল সুবলদা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জানালা খোলা। সামনের মাঠ এবং রাস্তা দেখা যাচ্ছে। দীপু সুবলের পেছনটা দেখতে পেল। সুবলদা সিগারেট খাচ্ছে এবং জানলায় দাঁড়িয়ে কিছু যেন দেখছে।

দীপু এবার ডাকল, কি সুবলদা তুমি ফিল্মশোর টিকিট কাটোনি?

সুবল ফিরে তাকাল। কিসের ফিল্মশো।

—বাঃ, তুমি কলকাতায় কেন আছো?

—আমি কলকাতায় থাকার মত লোক নই দীপু। জোর করে আছি।

—কলকাতায় আছো অথচ জানো না, কত বড় ফিল্ম ফেস্টিভেল হচ্ছে।

—কি হয় ওখানে!

—এই যা, বলে সে ব্যাগ খুলে কি দেখল। তারপর খুঁজে পেতে কি পেয়ে আশ্বস্ত হল যেন। একটু থেমে সুবলের খাটে গিয়ে বসল। পা দোলাতে দোলাতে বলল, কি হয় জান না?

—না।

—একটু জানার চেষ্টা কর সুবলদা। বোঝার চেষ্টা কর কলকাতাকে। এমনভাবে চোখ কান বন্ধ করে রাখলে চলবে কি করে! কত বড় ফিল্ম ফেস্টিভেল হচ্ছে আর তুমি খবর রাখ না!

—হ্যাঁ, কি যেন কাগজে দেখছিলাম।

—দেখলে অথচ টিকিট কি করে পাওয়া যেতে পারে তার চেষ্টা করলে না।

—সব মানুষের সব কিছু ভাল লাগে না দীপু।

—ভাল লাগে না ঠিক না—বরং বল তুমি ভারি কুঁড়ে প্রকৃতির মানুষ। তোমাকে সব ঠিকঠাক করে না দিলে তুমি ভোগ করতে জান না। বলেই দীপু চোখ তুলে তাকাল। আর দেখল সুবলদা কি যেন দেখছে ওর মুখে। কিছুটা আয়নার মত ব্যবহার যেন। সুবল বোধহয় দীপুর শৈশবের মুখ খুঁজছে। অথবা দীপু, যে দীপু কাল রাতে, শুধু রাতে না বলে সারারাত বলতে হয়, সারারাতে সে যে কতবার একটা বরফের নদীতে ওর সাদা রঙের গাড়িটা চালিয়েছে, কতবার যে বনেটটা খুলে গেছে, গেলেই একটা কালো রঙের এনজিনে কত শত কি আছে, পাতলা পাইপ, এবং কতকটা মানুষের হাড়গোড়ের মত—সুবলের চোখে দীপুর শরীরটা কেন যে বরফের নদী হয়ে যাচ্ছে!

বস্তুত সুবল অবাক, সেদিনের দীপু যেন আর নেই। রাতের বেলা দীপুকে কেমন অসহায় দেখাচ্ছিল অথচ আজ দীপু ভারি উজ্জ্বল। দীপু একটা কমলা রঙের শাড়ি পরেছে এবং যেমন নাভির নিচে ওর শাড়ি থাকে তেমনি। প্রথম দিকে চোখে লাগত খুব। কিন্তু এখন দেখে দেখে মনে হচ্ছে শাড়ি এমনভাবে না পরলে দীপুকে সুন্দর দেখাবে না। দীপুর যা কিছু ভাল দেখতে, যেমন ওর গ্রীক্ প্যাটার্নের মুখ, ববকাটা চুল এবং সাদা, রঙ ঠিক সাদা রঙ বলা যায় না, কেমন যেন শরীরে আশ্চর্য এক আভা—কোমল এবং মমতাময়ী, দীপুকে এমনভাবে না দেখলে যেন ঠিক দেখা হয় না। সুবল বলল, বোস।

—বসব না। তোমাকে নিতে এলাম।

—আমাকে নিতে এলে মানে। আজ কি আবার তোমার জন্মদিন।

দীপু ঠাট্টা গায়ে মাখল না। —তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আমি দেরি করতে পারব না।

সুবল কি বলবে ভেবে পেল না। কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে সে সবের কিছু না, এমনকি যাওয়াটা যে সুবলের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে তা পর্যন্ত দীপুর কথাবার্তায় ধরা যাচ্ছে না। এ ছাড়া সে বললেই সুবল যাবে কেন, তার নানারকম কাজ থাকে, বললেই যাওয়া যায় না। মনে মনে সুবল একটু বিরক্ত হল। সে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—যেতে যেতে বলব।

—কিন্তু আমার যে এক জায়গায় যাওয়া দরকার।

—কাল যাবে।

—না গেলে ওরা চিন্তা করবে।

—ওটা কতদূর। যাবার সময় ওখানে না হয় হয়ে যাব। তুমি কাজ সেরে নেবে।

সুবল ভাবল আচ্ছা ঝামেলা যা হোক। সেখানে এ সময় ওকে নিয়ে যাওয়া আদৌ ঠিক হবে না। ইতু এমনিতেই রেগে আছে, দীপুর সঙ্গে ফের দেখলে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাতে পারে। সে কেমন বিরক্ত বোধ করতে থাকল।

—দেরি করছ কেন?

ইলু এসে একবার দরজার মুখে দাঁড়াল। —দাদা তোরা কোথায় যাচ্ছিস রে।

—কি জানি। কোথাও যেতে হবে।

—দীপুদি, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

—ফিল্ম ফেস্টিভেল হচ্ছে। সুবলদাকে নিয়ে যাচ্ছি, ওতো কলকাতার কিছুই দেখল না।

সুবল ভীষণ রেগে যাচ্ছে। রেগে গেলে ওর মুখটা ঠিক থম থম করে না। মুখটা বরং করুণ দেখায়। তুমি আমাকে মেয়ে কলকাতা চেনাবে! ওর ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছিল বলে, দীপু তোমাকে এ অধিকার কে দিল। অথচ সুবল কেন যে পারে না শক্ত হতে, কেন যে পারে না বলতে আমি দীপু কলকাতা চিনতে চাই না। যেমন আছি থাকতে দাও। আমাকে আর রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে বল না।

অথচ দীপুর প্রতীক্ষা, এবং চুপচাপ বসে থাকা খাটে, সে ঠিকঠাক হয়ে না নিলে যেতে পারছে না, এমন মুখ সুবলকে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে দিল না। বলল, কটায় শো।

—আটটায়।

—কোথায়?

—একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে।

সুবল নিজের ঘড়ি দেখল। এখন সাতটা বেজে বিশ। সে বলল, ইলুকে নিয়ে যাও। আজ আমার পক্ষে যাওয়া একটু অসুবিধা আছে।

—কি অসুবিধা বলবে তো।

—সংসারের সব অসুবিধা তুমি দূর করতে পার না দীপু।

দীপু কেমন চুপসে গেল। মুখের উজ্জ্বল ভাবটা কেমন নিমেষে মুছে গেল। কত ছোট কথায় বড় আঘাত আসে, সুবল দীপুর মুখের দিকে না তাকালে বুঝতে পারত না। আঘাত দিয়ে কথা বলার স্বভাব তার নয়। তার কথায় কেউ আঘাত পেলেও সে ভীষণ কষ্ট পায়। দীপুর মুখ দেখে সুবলের কষ্টটা ধরা যায়। দীপু উঠে দাঁড়াল। কিছু আর বলল না সুবলকে। কিছু বলতে গেলেই এখন অভিমানে ভেঙে

পড়বে।

দরজার বাইরে মা এসে দাঁড়িয়েছেন। দীপুর মুখ দেখে মায়ের কেমন ভাবনা হল। বলল, বোস দীপু। একটু চা খেয়ে যাবে।

—আর একদিন এসে খাব জেঠিমা।

সুবল বলল, মা আজকে দীপুকে কিছু বল না। ও রাগ করেছে। ওকে যেতে দাও।

—তুই কিছু বলেছিস?

—কি বলব? কিছু বলিনি।

—নিশ্চয়ই তুই কিছু বলেছিস।

দীপু কিছু বলল না। কেমন অপলক সুবলকে দেখল। শিশুর মত সরল সহজ চোখে দেখল। আর এমন চোখ দেখলেই কেন জানি সুবল স্থির থাকতে পারে না। দীপুর ভীষণ অভিমান চোখে মুখে। সুবল বলল, তাড়াতাড়ি মা চা কর। আমরা এক জায়গায় যাচ্ছি। দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল, ফিরতে খুব একটা রাত হবে নাতো। বেশি রাত হলে মা কিন্তু আবার চিন্তা করবে।

গাড়িতে দীপু বলল, তুমি আর আগের মত নেই।

—তুমিও না।

—আমার না থাকার অনেক কারণ।

—আমার বুঝি কারণ থাকতে পারে না।

দীপু গাড়িটা মানিকতলার মোড়ে এনে আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে ঘুরিয়ে দিল। সোজা সে যাচ্ছে। একবার ইচ্ছা হয়েছিল সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে যাবে। কিন্তু এখন ও রাস্তায় ভীষণ ভিড়। বরং আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরে বের হয়ে বউবাজারে পড়বে। তারপর এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসের পাশ দিয়ে সেন্ট্রাল এভিনিউ। এ সব রাস্তায় গাড়ি চালাতে ভাল লাগে না দীপুর। কেমন একটা দমবন্ধ ভাব। তবু তাড়াতাড়ি যেতে হবে ভেবে সে এ রাস্তায় এসেছে। পাশে সুবলদা। গায়ে সাদা রঙের হাওয়াই শার্ট। এবং কালো রঙের ট্রাউজার। সুবলদা বোধহয় জানে এমন পোষাকে ওকে ভারি মানায়।

দীপু কথা না বললে কেমন খারাপ লাগে সুবলের। অথচ কথা বললেও একটা ভয়। কথা বললে, অন্যমনস্ক হবার সম্ভাবনা। এবং গাড়ি একসিডেণ্ট হতে পারে। বিশেষ করে সে মেয়েদের ওপর এতটা নির্ভর করতে পারে না। দীপু যে গাড়ি চালাচ্ছে, এবং এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ওতেই ওর ভয়। একটা গাড়ির পাশ দিয়ে এমন র‍্যাস ড্রাইভিং করছিল যে ভয়ে সুবল প্রায় কাঠ হয়ে গেছিল। সুবল

যেন এবার আর না বলে পারল না, একটু আস্তে চালাও।

—আস্তেই চালাচ্ছি।

—এটাকে আস্তে চালানো বলে না।

—একটু তাড়াতাড়ি না করলে সময়মত আমরা পৌঁছাতে পারব না।

—দেরি হলে এমন কিছু হবে না।

—কোন কিছুই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না দেখতে পারলে আমার ভাল লাগে না।

সুবল বলল, তাহলে অবশ্য একটু তাড়াতাড়িই দরকার।

দীপু হেসে দিল।—প্রাণের খুব দাম।

—তা আছে। আমার মার কাছে এ-দামটা আরও বেশি!

দীপু বলল, জেঠিমাকে এর ভিতর টেনে আনছ কেন।

সুবল অন্য কথায় এল, আমরা কি বই দেখতে যাচ্ছি বললে না তো।

—গেলেই দেখতে পাবে। বলে একটু তাকাল সুবলদার দিকে। সুবলদার পায়ে কালো স্ট্র্যাপের স্যাণ্ডেল সু। গোড়ালিটা ভীষণ লাল দেখাচ্ছে এবং শরীরের রঙ উজ্জ্বল বলে পায়ের নিচটা কালো আবছা নরম লোমের ভিতর উজ্জ্বল রঙটা ফুটে বের হচ্ছে। কেন জানি দীপুর ইচ্ছা হল অমন সুন্দর পায়ে হাত রাখে। হাত দিলেই মসৃণ পা, কোমল ত্বকে সাদা রঙ হাতের সঙ্গে যেন লেগে থাকবে। সে বলল বইটার নাম, আ আজার বাল্‌থাজার। পোলিশ ছবি।

সুবল দেখল গাড়ি তখন এয়ার ইন্ডিয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। সে বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখল দুপাশে। সে এখনও যেন কথাবার্তায় ফ্রি হতে পারছে না। মনে মনে দীপুকে ঘৃণা, ঠিক ঘৃণা নয়, কি যেন বলে ওকে অর্থাৎ ওর আচরণ, স্বভাব এবং মদ্যপান সব মিলে সুবলকে কোথায় যেন সামান্য আঘাত দিয়েছে। তবু এই দীপু যখন আসে, কথা বলে তখন সুবলের কেবল দীপুকে চুরি করে দেখতে ইচ্ছা হয়। শরীরে দীপু কি এক জাদু মাখিয়ে রেখেছে যার মায়া সুবলের চোখে শেষ হয় না। দীপুর সহজ আন্তরিকতা কেমন অনুপ্রাণিত করে। দীপু সুবলের ঘরে এতক্ষণ যেন প্রায় একটা জাপানি পুতুলের মত বসেছিল। ওর সুন্দর চোখ, পুষ্ট বাহু, হাতকাটা ব্লাউজের ভিতর সাদা শঙ্খের মত পিঠ সুবলকে কেবল কোথায় যেন নিয়ে যেতে চাইছিল। সে জোরজার করে প্রায় সবটা সময় অভিনয় করে এসেছে। সে শেষ পর্যন্ত দীপুর আগুনের মত শরীর এবং আপনজনের মত ভালবাসা অবহেলা ভরে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। সে উজ্জ্বল রঙের কালো প্যান্ট এবং সাদা রঙের জামা পরে আশ্চর্য এক ভালবাসার জাদুকর হয়ে গেল। সে যেন এবার দীপুর দিকে তাকিয়ে বলতে চাইল, এই দ্যাখো রুমাল ; রুমাল থেকে

পাখি ওড়াচ্ছি। সে রুমাল থেকে টিপে টিপে সব সাদা রঙের পায়রা উড়িয়ে দেবার মত যেন বলল, আমরা বোধ হয় এসে গেছি।

দীপু বলল, আমরা এখানে গাড়ি রাখব না। বলে সে মোড় ঘুরে বড় দেবদারু গাছটার নিচে গাড়ি রাখল। মেমোরিয়ালের নানা রঙের আলো সব জ্বল জ্বল করছিল। এবং এ পাশটায় গাছগুলোর নিচে অন্ধকার। অন্ধকারে মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তেমন। কেউ ছুটে ওদিকটায় যাচ্ছে। এ ধারের আলোগুলো জায়গাটাকে ভারি সুন্দর করে রেখেছে। নানারকমের গাছপালা, পাতার ভিতর আলোর রেখা, বেশ লাল নীল রঙের আলোর ভিতর দীপুর মুখটা আরও নরম এবং উষ্ণ মনে হচ্ছে। লতাপাতা আঁকা সব শাড়ি পরা যুবতীরা যাচ্ছে। এবং যুবকেরা বেশ একটা গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এসব দেখতে ওর ভালই লাগল। দীপু বলল, এখানে তুমি কখনও আসনি।

—না।

—বড় বড় সব ছবির এগজিবিশান হয় জান না?

—আমি অর্থনীতির ছাত্র দীপু। আমি এসব ভাল বুঝি না।

—এটা এমন বোঝাবুঝির কি আছে?

—আছে বোধ হয়। আমি যেমনভাবে দেখব, তুমি নিশ্চয়ই তেমনভাবে দেখবে না।

—সেটাতো ছবির টেকনিকেল ব্যাপার।

—সত্য কথাটা কি জানো, সময় পাই না। বলে সে দীপুর সঙ্গে তর্ক এড়াতে চাইল।

দীপু ওর খুব শরীর ঘেঁসে হাঁটছে। দীপুর গায়ে একটা মিষ্টি গন্ধ। অনেকটা চন্দনের গন্ধের মত। ওর চুল থেকে গন্ধটা উঠছিল না শরীর থেকে ঠিক সে বুঝতে পারছে না। ওর শাড়ির খস খস শব্দ হচ্ছে। দীপু একটা সুতির কাপড় পরে এসেছে। খুব সুন্দর করে শাড়ি পরতে জানে দীপু। এমনকি পায়ের নোখে সোনালি রঙের নেল পালিশ। দীপুকে পাশে নিয়ে হাঁটতে ওর ভীষণ ভাল লাগছিল। এখন ওর ইচ্ছা করছে, কোথাও অন্ধকারে গিয়ে বসে থাকতে।

বুঝি সুবলের ভিতর সেই নীলরক্ত টগবগ করে ফুটছিল। বাসনা যেন, যুবতী কোথায় নিয়ে যাবে মোরে। আমি তোমার কাছে সোনার আপেল হয়ে থাকব না। কিসে কি মেশালে খাবার খেতে ভাল লাগে আমি জানি। তোমার রূপে আমি দগ্ধ হতে চাই না। তোমাকে নিয়ে আমি বস্তুত শীতের রাতে সূর্য খুঁজতে চাই।

আসলে দীপুর মত মেয়ের সঙ্গে সুবল নিজেকে মানাতে পারে না। মনে মনে হেরে গেলে সাহস পাবার জন্য সব কবিতার মত কথা বলতে থাকে। সবই

অর্থহীন, তবু সংগোপনে কথা বলার স্বভাব। এটা ওর চিরকালের। শৈশবে দীপু যখন আসত ফ্রক পরে, দীপুর পায়ের নিচু অংশটুকু সে গোপনে দেখত। ওর ও-বয়সে শরীরের সব কিছু ধরা না পড়লেও দীপুকে সুবল কিছু যেন বলতে চাইত। অথচ বলতে সাহস পেত না। সে একা একা কোন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দীপুকে কি কি বলবে মুখস্থ করত। আর দীপু কাছে এলে সে বোকা বনে যেত। এমনকি দীপু যেদিন ওকে চুমু খেল সেদিন পর্যন্ত সে দীপুর কাছে খোলামেলা হতে পারল না। ভীরু স্বভাবের মানুষ হলে যা হয়। সব মনে মনে। যেমন সে রাতে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন পর্যন্ত দেখে ফেলল।

বস্তুত সুবল সে রাতে দীপুর মোহে পড়ে গিয়ে কেমন হয়ে গেছিল। প্রথম শো দেখল ওরা। চেক চলচ্চিত্র উৎসব। বইয়ের নামটা সে আবার ইংরেজীতে সাব-টাইটেলে দেখতে পেল। আ আজার বালথাজার। এক গাধার কাহিনী। এক কিশোরী মেয়ের হাতবদলের দৃশ্য। গাধার অঙ্ক করার দৃশ্যে সুবল হেসেছিল। এবং যেখানে সেই কিশোরী মেয়েকে রেপ করে ফেলে রেখে গেছে বড় মর্মান্তিক। অথচ পরের দৃশ্যে মেয়েটি উঁবু হয়ে বসে আছে, ওর সুন্দর খালি পিঠ। শিরদাঁড়া এবং নিচের দু-ভাঁজে যে অংশ কি সাদা আর নরম। সে পেছন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ রেখে বসে আছে। ওর চুল, ঘাড়, পিঠ এবং সবকিছু যেন হাত দিলে ছোঁয়া যায়। এমন একটা বয়সেই বোধ হয় দীপু ওকে ছেড়ে চলে এসেছিল। এবং এমন একটা বয়সে দীপু দেখতে হুবহু এমন ছিল। দীপু যে পাশে বসে রয়েছে, চুপচাপ দেখে যাচ্ছে, সে বুঝি জানে না, সে বয়সে পেছন ফিরে খালিগায়ে উবু হয়ে বসে থাকলে দীপুকেও এমন দেখাত।

কিশোরী মেয়েটি প্রায় ফুলের মত অসামান্য। ভীষণ দুর্লভ সামগ্রী। হাত দিলেই ছোঁয়া যায় না। দীপু সুবলের কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে আছে। এমন একটা সময়—যা পর্দায় নড়ছে, দীপু পাশে বসে, ওর ত্বকে এবং ভিতরে যা কিছু লোভনীয় সব তার এখন আয়ত্তে—সে কেমন অস্থির হয়ে উঠছে। পর্দায় একটা পোড়ো বাড়ির ছবি এবং মেয়েটি নগ্ন হয়ে পেছন ফিরে বসে থাকার দরুণ দুপাশে ভাঁজ, ঠিক পানপাতার মত কোমরের দুপাশে দিগন্ত প্রসারিত। আর মাঝে মাঝে সীমান্ত থেকে বন্দুকের গর্জন—কি যেন হায় আছে আমাদের জীবনে, যার স্বাদ এবং স্বপ্ন মরেও মরে না—কেবল আমরা ছুটি। সুবল আজ দীপুর মত জীবনের ওপর পাল খাটিয়ে দ্রুত ছুটতে চাইল।

তারপর সুবল ছবি শেষ হলে বাইরে এসে দাঁড়াল। দীপুকে দেখল। দীপু কেন জানি সোজাসুজি আর তাকাতে পারছে না।

সুবল চুপচাপ গাড়িতে গিয়ে বসে থাকল। কোথায় এখন ওকে নিয়ে যাবে

দীপুই জানে। এবং এমনকি দীপু যদি ওকে বলে তুমি এবার চলে যাও—সে যাবে না। তার ইচ্ছা হবে না সে দীপুকে এখানে ফেলে চলে যায়। এমনকি মনে হয় দীপু ওকে নিয়ে আরও কোথাও যাক। অদ্ভুত একটা নেশা পেয়ে গেছে—দীপু তার রক্তে আশ্চর্য নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। সে বসে থেকে বুঝতে পারছিল—দীপু তাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে।

সে বলল, এখানে?

—আমার টেবিল রিজার্ভ করা আছে।

—আগে বলতে হয়। রাত হলে মা ভাববে।

—ভাবনে না। আমি ইলুকে বলে এসেছি, তুমি আজ আমাদের বাড়িতে থাকবে।

—দীপু, তুমি আমাকে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছি না।

—আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না, সুবলদা।

সুবল দেখল কত সব আলো গেটের মুখে। একটা মানুষ মাথায় জরির টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে। শরীরে তার ঝালরের পোশাক। আর একটু বেশি কিছু হলে সে যাত্রাগানের রাজা সাজতে পারত। দীপুকে দেখেই মাথা নিচু করে সেলাম দিল। দরজা খুলতেই সব নানা রঙের আলো, এবং সাদা চাদরে ঢাকা টেবিল, সব দামি কাচের গেলাস, জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতী এবং ডায়াসে একটা লোক ক্লেরিওনেট বাজাচ্ছে। নানারকম সব ম্যাণ্ডোলিন, গীটার এবং এক যুবতী, মাইকের সামনে গাইছে—তখন হেমন্তকাল...।

তখন হেমন্তকাল গানটা বেশ লাগছিল। বেশ লাগছিল বললে ভুল হবে, রক্তের ভিতর কি যেন ইচ্ছার কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুবল ভিতরে ঢুকতেই চোখে মুখে আলোর ঝলক। সে এত আলো এবং বৈভব যেন জীবনেও দেখেনি। যেন বলার ইচ্ছা সুবলের, এমন সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ আমি জীবনে দেখিনি দীপু। এমন লাল নীল পানীয় আর কাচের শব্দ, যুবক-যুবতীদের মদ্যপান, নাচ গান টুইস্ট—তুমি দীপু আমায় কোথায় নিয়ে এলে!

দীপু বয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করতে টেবিল দেখিয়ে দিল।

দীপু বলল, এস।

সুবল ইতস্তত করছে।

দীপু বলল, তুমি না খেতে চাইলে জোর করব না।

—তুমি এ সব খাও!

—মন খারাপ থাকলে খাই। সব সময় খাই না।

তখনও গান হচ্ছিল—তখন হেমন্তকাল।

মেয়েটার শরীরে স্বল্প বাস। স্তন উঁচু। চোখে লম্বা কাজল। দুপাশে সব লম্বা যুবক। কালো প্যান্ট পরনে। জুলপি নিচে নেমে গেছে। চুল কোঁকড়ানো। ঘাড়ের কাছে চুল এবং রঙ-বেরঙের জামা। ওরা বড় বড় গীটার, ড্রাম, অথবা ক্লেরিওনেট বাজাচ্ছে।

এইসব গানের ভিতর, অথবা মেয়েটা যে মাইক মুখের কাছে রেখে আশ্চর্য সব ভঙ্গি করে গাইছে—তখন হেমন্তকাল, সুবল শুনতে শুনতে যেন মুহ্যমান হয়ে যাচ্ছে, সে টের পাচ্ছে না—এখানে এলে স্বাভাবিকতা মানুষ হারিয়ে ফেলে অথবা এটাই হয়ত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, ভিতরে ভিতরে সব ইচ্ছা নিয়ে এক সঙ্গে পাগল হয়ে যাওয়া। সে যে নিজেকে ভালমানুষ সাজিয়ে রেখেছে, সে যে ইতুকে ভালবেসেও তার বিয়ে ঠিক করে যাচ্ছে, এবং দীপুর প্রতি যে তার আশ্চর্য টান আছে—সে দীপুকে, দীপুর মাখনের মত শরীর নিয়ে সারারাত যে গোপনে খেলা করে বেড়ায় কেউ জানে না। সে নিজেকে এইসব নাচগান হল্লার ভিতর কেমন হিপোক্র্যাট ভাবল। বস্তুত তার ভীষণ ইচ্ছা সবার মত নাচে, কারণ রক্তে ভারি নেশা টগবগ করে। গানের সঙ্গে বাজনার সঙ্গে এবং মেয়েদের হাল্কা বসন-ভূষণের ভিতর কেমন হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না বা ইতস্তত করতে পারল না। সে একজন কেমন গোবেচারা, প্রতিপত্তিহীন মানুষ হয়ে বেঁচেছিল এতদিন, এখানে এসে সে আবার যেন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে। সে দীপুর পিছনে হেঁটে গেল।

দীপু একটা মেনু এগিয়ে দিয়ে বলল,—কি খাবে?

—তুমি যা খাবে।

—আমি যা খাব তুমি তা খেতে পারবে না।

—চেষ্টা করে দেখি না খেতে পারি কি না!

সুবল দীপুর পাশে বসে বলল, শুনছ মেয়েটা কি গাইছে!

—গাইছে, তখন হেমন্তকাল।

—হেমন্তকালের কথা তোমার মনে আছে?

—খুব।

—আমাদের চরের জমিতে তখন শুধু কাশফুল।

—কাশফুল আর সাদা রঙ। দুটোই আমার প্রিয় সুবলদা।

—হেমন্তকালে আর কি থাকে মনে করতে পার?

দীপু বলল, পারি। তবে এখন আর মনে করতে ইচ্ছা হয় না। এতে শুধু কষ্টটা বাড়ে। বয় এলে, সুবলের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি হাফ নাও। ভাল লাগলে আবার বলব।

সুবল হাফও বোঝে না পুরোও বোঝে না। সে বলল, আচ্ছা।

দীপু বয়ের দিকে না তাকিয়ে মেনু দেখতে দেখতে বলল, সাবকো হাফ, আওর হামারা লিয়ে পুরা লে আও। তারপরও বয়কে যেতে না দেখে বুঝল, কি দেবে সে বলেনি। হোয়াইট হর্স দেনা।

তখনও গান হচ্ছে। সুবল ভিতরে ভিতের বেশ উত্তেজিত হয়ে আছে। সে এখানে আসার পর এমন একটা জীবনের দেখা পাবে আশা করেনি। আনন্দদা খুব সাদাসিধে মানুষ। পানাহার ব্যাপারটা তার কাছে খুব দূরের ব্যাপার। কারণ সে শিক্ষক হিসাবেও একটা আদর্শ মেনে চলে। কিন্তু আজ এটা তার কি হচ্ছে! সে ঠিক কথা বলতে পারছে না। সে ঠিক মত দীপুকে দেখতে পাচ্ছে না। দীপুর শরীর থেকে চন্দনের মত যে গন্ধটা উঠছিল, সেটা এখন নেই। সেটা আর একটা চড়া গন্ধে ডুবে গেছে।

দীপু বলল, তোমার ভয় লাগছে!

—তা লাগা স্বাভাবিক।

—এসব জায়গায় তুমি একেবারে আসনি ভাবতে পারিনি।

এমন সময় বয় গ্লাসে মদ ঢালতেই ন্যাপকিন খুলে দীপু সামনে রাখল। এবং সুবলের ন্যাপকিনটাও সামনে রেখে ওর কাছে গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি এসব খাও আমার পছন্দ নয় সুবলদা।

—তুমি খেতে পারলে আমার খেতে দোষ কি?

দীপু চুপ করে থাকল। তোমাকে অনেক কথা বলার আছে। আমি চেষ্টা করে দেখেছি সব বলতে পারি না। আমি আজ তোমাকে কিছু বলতে চেষ্টা করব। ও সব বলবে ভাবল। কিন্তু চোখবুজে এক সিপ খেলে দীপুর ঠোঁট কেমন নীল হয়ে গেল। সে কিছু বলতে পারল না। সে নির্জলা খাচ্ছে দেখে সুবলও চেষ্টা করতে গেল। আর দীপু তখন হা হা করে উঠল, করছ কি! দাঁড়াও। সে সুবলের গ্লাসে সোডা ঢেলে দিল।

গলায় ঝাঁঝ, কেমন তেতো তেতো—সে মুখ বিকৃত করে ফেলল। সে জানে না বলে অনেকটা একসঙ্গে খাচ্ছে। সে ঠিক জানে না। দীপুর সুবলদার কাণ্ড দেখে হাসি পাচ্ছিল। সে বয়কে কিছু স্ন্যাকস্ দিতে বলে সামান্য সোডা ঢেলে তাকাল চারপাশে। ইতিমধ্যেই ফ্লোরে অনেকে চলে গেছে। এটা বোধ হয় দ্বিতীয় রাউণ্ড। এখন সুবলদাকে নিয়ে এই রাউণ্ডে নেচে এলে হয়। সে সুবলদাকে নিয়ে কেন যে এখানে এল। প্রথম ভেবেছিল, কিছু বলবে, বলবে সুবলদা তুমি আমাকে বৈভব থেকে রক্ষা কর। আমি এই বৈভবের ভিতর থাকলে আর বাঁচব না। আমাকে তুমি ইচ্ছা করলেই একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে যেতে পার—অথবা কেন যে ইচ্ছা হয়

অনেক দূরে, কোন পাহাড়ের নির্জন জায়গায় তুমি আমি থাকি, ছোট্ট সরোবরে আমরা স্নান করি—কেন যে এমন সব ইচ্ছা হয় ঠিক বলতে পারি না। তুমি আসার পর আমার জ্যাঠামশায়ের মুখ আবার মনে পড়ে গেছে। আমি জ্যাঠামশাইকে যে কি ভালবাসতাম!

দীপু বলল, সুবলদা তুমি খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছ। সুবল তাকিয়ে মুচকি হাসল।

—এটাকে আস্তে বলে না।

—তোমার তো প্রায় শেষ হয়ে এল।

—আমি খেয়েছি কত। কতবার খেয়েছি তুমি জান না। ইচ্ছে করলে আমি কত খেতে পারি তুমি ভাবতে পার না। কিন্তু বিশ্বাস কর সুবলদা, আমার এ-সব খেতে এতটুকু ভাল লাগে না। বলেই একটু থামল। জানো আমাকে আবার দিল্লি যেতে হবে। মুখার্জী সাহেবের সঙ্গে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি তুমিও জানো।

—না, আমি জানি না।

—আমার না গিয়ে উপায় নেই। আমাদের স্টেটমেণ্টে আগলি সব রিপোর্ট ছিল। ওটা ধরা পড়েছে। এখন আমাকে একমাত্র মুখার্জীই রক্ষা করতে পারেন।

সুবল বলল, আমি আরও নেব।

—পারবে তো স্ট্যাণ্ড করতে।

—তুমি পারছ আমি পারব না।

—আমার কি হয় জানো। কেবল ভাবি, এত কেন আমাদের হল। আরো কিছু কম হলে ক্ষতি কী ছিল। অথচ কি আমাদের স্বভাব, কোন কারণে ইউনিয়ান থেকে চাপ এলেই মনে হয়, সব আমার, আমি করেছি—ওদের কোন কিছু বলার অধিকার নেই। আমার যা খুশি দেব। এমন হয় কেন সুবলদা?

সুবল তাকাল, বলতে ইচ্ছা হল, ন্যাকা, কিন্তু ন্যাকা বললে দীপু ভাবতে পারে সুবলদার হয়ে এসেছে। সে বলল, কি দীপু প্রায় ফুল হয়ে গেল, কিছুই তো হল না।

দীপু বলল, তোমাকে নিয়ে আমার ভারি ভয়। তুমি একটা আবার কেলেঙ্কারি করে না ফেল।

সুবল পীড়াপীড়ি করলে আরও হাফ এল। খাবার এল। সুবলের পক্ষে মাত্রা [illegible]শি হয়ে গেছে। দীপু তাড়াতাড়ি বাকিটা শেষ করে আর কিছু খেল না। সুবল [illegible]ও বুঝতে পারছে না। শুধু মাথাটা সামান্য ভারি লাগছে—এবং একটা অসাড় ভাব শরীরে খেলা করে বেড়াচ্ছে। জিভের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। সে খাবার মুখে দিয়ে কোন স্বাদ পেল না। সে উঠে দাঁড়াল। সুবলের কেন জানি চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ইতুর মুখ ভেসে উঠছে। মেয়েটা আমাকে যা খুশি বলে,

আমাকে নিয়ে যা খুশি করে। আমার সঙ্গে কথা বলে না। ওর চিৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে কেন এত। সে বাথরুমে যাবে—বাথরুমে যাবে বলে উঠে দাঁড়াল। অথচ ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না—পা টলছে।-এবং ধীরে ধীরে এটা যে কি হয়ে যাচ্ছে—চোখ ঘোলা ঘোলা, কেবল চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, ইতু আমাকে নিয়ে যা খুশি করে! আমি তোমার গোলাম! এমন সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ আমি জীবনে দেখিনি দীপু। এমন লাল নীল পানীয় আর কাচের শব্দ, যুবতীদের মদ্যপান, নাচ-গান টুইস্ট—তুমি দীপু আমায় এ কোথায় নিয়ে এলে! সুবল দীপুকে একগাদা মানুযের ভিতর কোমর জড়িয়ে ধরে, মদ্যপানের দরুণ বেসামাল হয়ে গেলে, দীপু ওকে ধরে এনে ব্যালকনিতে বসাল। ডাকল, সুবলদা।

—হুঁ।

—আমি কি হয়ে গেছি না?

সুবল কথা বলতে পারছিল না। ওর চোখ কেবল বুজে আসছিল। যত চোখ বুজে আসছিল তত যেন এক অভিমান ইতুর ওপর। ওর বলার ইচ্ছা হল, ওর কথা স্পষ্ট নয় তবু বলার ইচ্ছা হল, ইতু, আমি আদৌ ভাল মানুষ নই। চার বছর ইতু আমি তোমার পিছনে পিছনে ঘুরেছি। আমি বড় দুর্বল ভালবাসার ব্যাপারে। তুমি আমায় এতটুকু সম্মান দেওনি। আমরা এমন গরিব ছিলাম না। আমাদের সব কিছু ছিল। আমি তোমাকে ভালবাসি, নাটক করে বলতে পারিনি।

দীপু দেখল সুবল রেলিঙে ভর দিয়ে বিড় বিড় করে বকছে। দীপু কাছে এসে বলল, সুবলদা, তুমি আমাকে কিছু বলছ?

—না। কি বলব বল?

—আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে সুবলদা?

—কোথায়?

—যেখানে কোন মনোরঞ্জনের দায় নেই। একেবারে স্বাধীন। ছোট্ট তপোবনের মত আশ্রম থাকবে। সামনে ছোট্ট নদী থাকবে। তুমি ফসল তুলে আনবে, আমি নদী থেকে জল তুলে আনব।

দীপুর মত সুবলেরও ভাল ভাল কথা বলছে ইচ্ছা হল। বড় বড় কথা। যা সে স্বাভাবিক অবস্থাতে কিছুতেই বলতে পারে না। খুব কম কথা, হাঁ বা হুঁ এই বলে সংসারে যে-সব দায় শেষ করে সেই এখন সুন্দর সুন্দর কথা বলার চেষ্টা করছে।

সুবল কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, স্বপ্ন তাই দীপু। এ-সব তো স্বপ্ন দীপু। বড় হবার সময় সবাই এমন স্বপ্ন দেখে। কিন্তু আমরা সেখানে যেতে পারি না। শুধু যাবার ইচ্ছা থাকে। আমাদের স্বভাব কেবল রাতের আঁধারে সূর্য খুঁজে বেড়ানো।

পরে দুজনেই চুপ হয়ে গেল। কলকাতার মাথায় চাঁদ উঠে এল। ভিতরে গান বাজনা থেমে গেছে। যে মানুষটা উটের মত মুখটি তুলে ক্ল্যারিওনেট বাজাচ্ছিল, সে এখন কাঁধে গামছা ফেলে বাথরুমে যাচ্ছে। দীপু ধীরে ধীরে সিঁড়ি থেকে সুবলকে ধরে ধরে নামিয়ে আনল। সুবলকে ঘরে দিয়ে এল না। রাত্রিবাসের জন্য নিজের মহলে রাখবে বলে গাড়ি স্টার্ট দিল।

আর তখনই সুবল দেখল রিকসার সেই লোকটা ওপাশের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। সুবল ভয়ে দীপুকে জড়িয়ে ধরল। ওপাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে দীপু। ও আমাকে কিছু করতে চায়। বলেই শরীর এলিয়ে দীপুর গায়ে ঢলে পড়ল।

ভোরবেলা সুবলের কেমন সব ধূসর চিন্তায় মাথাটা ভারি লাগছিল। সারারাত কে যেন ওর শিয়রে বসেছিল। মায়ের যত্ন এবং স্নেহ দিয়ে প্রায় সেবা শুশ্রূষা করেছে। সে কে! কেমন মুখ তার—এখন সুবল স্পষ্ট মনে করতে পারছে না। সে বার বার অল্প আলোর ভিতর চোখ মেলে চেনার চেষ্টা করেছে—অথচ পারেনি। কেমন চোখের ওপর হিজিবিজি দাগ কেটে গেছে মুখটা। কখনও মনে হয়েছে মুখটা মরিচিকার মত—কেবল দূরে যেন ঝলমল করছে। সে হাত তুলে ইশারায় কাছে ডাকতে চেয়েছে—পারেনি। মুখটা তার কাছ থেকে দূরে সরে সরে গেছে। কিছুটা প্রায় ছায়া ধরার মত সে অনেক রাত পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছে তাকে ছোঁয়ার। তারপর কখন চোখে ঘুম এসে গেল—সে জানে না। এখন ঘর খালি। জানালায় ভোরের রোদে একটা ছোট পাখি বসে আছে সে দেখতে পেল। পাখিটা কখনও ঘাড় তুলে কখনও নুয়ে তাকে দেখছে। সুবল এবার বুঝতে পারল এটা দীপুর ঘর। এ-ঘরে সে রাত্রিবাস করেছে। এবং সে একটা গাধার ছবি সারারাত ধরে স্বপ্নে দেখেছে এমন মনে হল তার।

মনে হচ্ছে একটা খট খট শব্দ হচ্ছে শিয়রে। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। মাথার জানালায় খুব ধীরে ধীরে দীপু হাঁটাচলা করছে। খুব আস্তে আস্তে সে জানালা খুলে দিচ্ছে। ওর ঘুম ভেঙে না যায় তার জন্য দীপু সন্তর্পণে চলাফেরা করছে।

দীপুর হাঁটাচলা টের পেয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকতে ইচ্ছা হল তার। বেশ একটা জগত, যে জগতটা সে মনে মনে ভাবতে ভালবাসে, এমন একটা জগতে দীপু ওকে এনে তুলেছে। সে চোখ খুলে রাখল না। কাত হয়ে শুল। যেন ঘুম এখনও চোখে লেগে আছে—অথচ সে টের পাচ্ছে, দীপু এসে এখন দাঁড়িয়েছে ওর পায়ের কাছে, খাটের কাঠ ধরে অপলক চুরি করে সে সুবলকে দেখছে।

দীপু বোধ হয় এতেও শান্তি পাচ্ছে না। আবার ওর পায়ের শব্দ ক্রমশ মাথার

কাছে চলে আসছে। খুব ধীরে ধীরে বসছে শিয়রে। এবং কপালে খুব আস্তে হাত রাখছে।

সুবল এবার চোখ মেলে তাকাল।

দীপু কপাল থেকে হাত সরাল না। দীপু কপালে হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকল। দীপু এখন কি বলবে বুঝতে পারছে না। গতরাতের ছবির সঙ্গে দীপুর এ-ছবির কোন মিল নেই। খুব সকালে বোধ হয় দীপু স্নান করেছে। সে একটা সাদা জমিনের শাড়ি পরেছে। পাড়টা সুবজ রঙের। খুব চওড়া পাড়। হাতে সরু সোনার চুড়ি। স্নান করায় সারা শরীরে দামী পাম-অলিভের গন্ধ। এবং চোখের নিচে আশ্চর্য মায়ার খেলা। হাতটা দীপুর ভারি ঠাণ্ডা। হাতের আঙুল বড় সরু। এবং সে এই প্রথম যেন দীপুর বাহুর পুষ্টতা এবং লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। দীপুর অনাড়ম্বর এই মুখ চোখ, কারণ চোখে মুখে কোন প্রসাধনের চিহ্ন নেই—দীপুকে এত বেশি সুন্দর লাগছে যে সেও কতক্ষণ থেকে অপলক দীপুকে দেখে যাচ্ছে টের পাচ্ছে না। কারণ এতক্ষণ এভাবে কেউ কখনও কাউকে দেখে না।

সুবল ডাকল, দীপু!

—বল।

—তুমি আমাকে এনে এখানে রাখলে, কাকীমা রাগ করবে না।

—না।

—কিন্তু এটা তো ঠিক না দীপু।

—এ-বাড়ির নিয়ম কানুন পাল্টে গেছে।

সুবল বলল, তোমাকে বড় ভাল লাগছে দেখতে।

—যাঃ।

—হ্যাঁ দীপু। এমন সুন্দর চোখ মুখ, অথচ সাজগোজ করে মুখটাকে যে কি করে রাখ!

—সাজলে খুব খারাপ দেখায়।

—তোমার এমন শান্ত ভাবটা থাকে না। কেমন খুব উগ্র মনে হয়। আমার উগ্রতা ভাল লাগে না।

দীপু অনেক কথা বলতে পারত। কিন্তু এই সকাল, আর যখন রোদ জানালায় এবং একটা পাখি আনমনে বসে আছে, তখন নিজের অনুতাপের কথা আর ভাবতে ভাল লাগছে না। বলতেও ভাল লাগছে না।

দীপু বলল, এখন কেমন লাগছে।

—ভাল।

—চোখ মুখ দেখে ভাল মনে হচ্ছে না।

—রাতে ভাল ঘুম হয়নি। হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

দীপু মাথার কাছ থেকে উঠল না। মুর্শিদাবাদ সিল্ক এবং খুব নতুন বোধ হয়, ফলে আঁচলটা কাঁধে থাকছে না। বারবার গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওর একটা পা প্রায় খাটের ওপর, অন্য পা-টা নিচে, অনেকটা সে সরস্বতী ঠাকুরের মত বসে আছে। ওর চুল বড় নয়, ববকাটা, তবু সে চুলে বড় একটা তোয়ালে দিয়ে জল শোষার জন্য বেঁধে রেখেছে। ফলে চোখদুটো আরও টানা টানা লাগছে। সুবলের ইচ্ছা হল দীপুর হাতের ওপর নিজের হাতটা রাখে। এবং দীপুর কোমল শরীরে কতটা লাবণ্য আছে ছুঁয়ে দেখে।

সুবল এবার উঠতে গেল। বলল, দীপু উঠি। বেলা হয়ে গেছে।

দীপু বলল, আমি ইলুকে ফোন করে দিয়েছি। আজ তুমি এখানে থাকছ।

—সে কি করে হয় দীপু। আমার কলেজ আছে।

—তোমার শরীরটা ভাল না।

—বাড়ি গেলে ভাল হয়ে যাবে। সুবলের ভিতর সেই গোঁ-টা আবার চাড়া দিয়ে উঠল।

দীপু বলল, তুমি এখানে খাবে।

সুবল উঠে বসল। সে পাজামা পরে আছে। গায়ে লম্বা ডোরাকাটা জামা। জামার বোতাম খোলা। বুকটা খালি, এবং প্রশস্ত বলে বুকের ভিতর এক নিবিড় অরণ্য, সেখানে হাত রাখার বাসনা যুবতীদের, এবং সুবল টের পায় একবার রাখলে, যতক্ষণ না সে-বনে যুবতী হারিয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি পাবে না। সে তাড়াতাড়ি জামার বোতাম লাগিয়ে দিল।

দীপু বলল, বাথরুমে যাবে?

—না।

—চোখ মুখ ধুয়ে নাও।

—আমার ব্রাশ পেস্ট নেই।

—সব আনিয়ে রেখেছি।

দীপুর এতটা আতিথেয়তা কেন জানি ভাল লাগল না সুবলের। সে বলল, তুমি আমার জন্য এত কেন কর কিছু বুঝি না?—এ-বেলা থাকলে দীপু, ভাববে।

দীপু একটা লকার খুলে তোয়ালে বের করল। নতুন সাবান পেস্ট ব্রাশ সব একটা ট্রেতে সাজানো। যেন কোথাও এ-ঘরে একজন কল লাগানো মানুষ আছে। সে যেন সুবলের সব কিছু আগে থেকেই ঠিক করে রেখে গেছে। অথবা কল

লাগানো মানুষটা জানে সুবলের পর পর কি দরকার হবে। কেবল দীপুর কাজ সে-সব এনে সামনে পৌঁছে দেওয়া।

দীপু তোয়ালেটা ওর কাঁধে ফেলে রেখেছে। সুবলের দাঁত ব্রাশ করা হলে তোয়ালেটা দেবে হাতে। সুবল বিছানাতেই বসে থাকল। কিছু বলছে না। হাতে ওর ব্রাশটা। কি যেন ভাবছে। সেই পাখিটা তেমনি জানালায় বসে রয়েছে। রোদ তেমনি লম্বা হয়ে পড়ে আছে ঘরে। এবং হাতে ব্রাশ, দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ সুবলের।

—কাল তোমার অবস্থা দেখে আমার ভয় ধরে গেছিল। সুবলকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেই বুঝি এমন বলল দীপু এবং পেছন ফিরে কি যেন দেখল দরজার দিকে। দুবার বয় এসে ফিরে গেছে। অন্যদিন বয় বাবুর্চিরা এতক্ষণে দীপুর ব্রেকফাস্টের জন্য তৈরি হয়ে যায়। মা এসে একবার খবরাখবর নিয়ে গেছে, সুবল কেমন আছে। দীপু বলেছিল, ভাল আছে। বয় বাবুর্চিরা দিদিমনির আদেশের জন্য ঘোরাফেরা করছে। ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। না ডাকলে কারো ভিতরে যাবার নিয়ম নেই। দীপুর যেন মনে মনে নিজেকে বলার মত বলা, আমি আর কোনদিন তোমাকে নিয়ে ছলনা করব না সুবলদা। এমন নির্মল জলের মত যে মানুষ তাকে নিয়ে আর যাই করা যাক ছলনা করা যায় না।

সুবল না তাকিয়েই বলল, এ কথা কেন দীপু?

—সুবলদা, একটা কথা বলব?

—কি কথা বল।

—তুমি ইতুকে ভালবাস!

—যাঃ!

—না সুবলদা, আমাকে ছুঁয়ে বল, তুমি আমার মাথায় হাত রেখে বল, তুমি ভালবাস কি না? আমি এতদিনে সব টের পেয়ে গেছি। আমি সুবলদা মনে মনে হিংসায় জ্বলে যাচ্ছিলাম। তোমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমার কেন জানি মরণ খেলার সখ হয়। কখনও দূরের এক নদীর চরে আমাদের ছোটাছুটির কথা মনে হয়। ছোট বয়সের মুখ মনে পড়ে। তখন আমি ঠিক থাকতে পারি না সুবলদা। তোমাকে আমি জিতে নিতে পারছি না, বলে আবেগে কেমন নুয়ে পড়ল দীপু।

সুবল এবার ঘুরে বসল সহসা। বলল, দীপু তোমার হাত ধরছি, এমন সময়ে তুমি ওর কলঙ্ক রটিও না। তুমি আমাকে ছুঁয়ে বল, এমন কথা আর বলবে না।

দীপু উত্তর করল না। মাথা নুইয়ে রাখল। তারপর অনেকক্ষণ বাদে দীপু থেমে থেমে বহুদূর থেকে যেন কথা বলছে—আমি কেন বলতে যাব সুবলদা। বাড়ির লোকেরা টের পেয়েছে। মামাবাবু জেনেছেন ইতুর সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক আছে।

সুবল আঁতকে উঠল! সে কি করবে ভেবে পেল না। সে কেমন এখন হতাশ মানুষের মত মুখ করে রেখেছে।

দীপু তাকাল সুবলের দিকে। ঠিক সোজাসুজি নয়—কিছুটা সংগোপনে। সে দেখল সুবলদার মুখ। বড় করুণ দেখাচ্ছে সুবলদাকে।

সুবল বলল, দীপু সত্যি বলছি কোন সম্পর্ক নেই। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার। সে কোনদিন কোনো অশালীন আচরণ করেনি। ইতু বড় ভাল মেয়ে।

দীপু বলল, পুরীতে তোমরা কিছুদিন ছিলে। ওর দাদার সঙ্গে তুমি বেড়াতে গিয়েছিলে।

—গিয়েছিলাম।

—রোজ, তুমি ইতু বিকেল হলে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতে।

—সে তো সবাই যায় দীপু। আমিও গেছি।

—একবার ওর জ্বর হয়েছিল ভীষণ।

—সে তো কতবার জ্বরে ভুগেছে।

—না, সেবার ভীষণ জ্বরে ভুগেছিল। বাসায় কেউ ছিল না। তুমি একা ওর সেবা-শুশ্রূষা করেছ?

—কেউ না থাকলে তো করতেই হয়। আমিও করেছি।

আরও কি যেন বলতে পারত দীপু। কিন্তু বলল না। চুপ করে গেল। সে উঠে লকারটা খুলল ফের। ভিতর থেকে একটা ব্যাগ বের করল। যেন খুব যত্নের সঙ্গে রেখে দেওয়া পুরোনো জিনিস সে খুঁজে বের করছে। সুবল আসামীর মত লক্ষ্য করছে। আর কি সাপটাপ দীপু ঝাঁপি থেকে বের করে আনবে সে বুঝতে পারছে না।

দীপু কাছে এসে একটা চিঠি দিল সুবলের হাতে। বলল, এটা পড়লে বুঝতে পারবে।

সে পড়ে বলল, দীপু, এটা একটা উড়ো চিঠি। উড়ো চিঠিতে বিশ্বাস করতে নেই। বিশ্বাস কর এটা উড়ো চিঠি। বিশ্বাস কর ইতুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

—মামাবাবুকে তাই বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

—বিয়ের আগে এমন সব চিঠি আসে। তোমরা দীপু, মেয়েটাকে মিছে কলঙ্ক দিও না।

—আমি জানি তুমি কোন ছোট কাজ করতে পার না সুবলদা। তারপর চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দেবার জন্য লকারটার কাছে চলে গেল। ওটা রাখতে

রাখতে বলল, তবু বলছি সুবলদা, মনে মনে বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম। এমন এক সামান্য মেয়ের জন্য তুমি প্রাণপাত করছ! তোমাকে আমি তাই গতরাতে খেলাতে চেয়েছিলাম—পারিনি। আমি এই প্রথম মানুষ দেখেছি, যে আমার আগুনে পুড়ে মরতে চায়নি।

—তুমি আজকে দীপু নাটক-নভেলের মত কথা বলছ।

দীপু বলল, যতই ঠাট্টা কর, রাগ করব না।

এ-সময় বয় এসে বলল, দিদিমনি খাবার দেবে?

দীপু জানালার পর্দা একটু টেনে দিচ্ছিল পাশে। বয় দাঁড়িয়ে আছে—যাচ্ছে না। সে বলল, এখন তোমাদের কিছু করতে হবে না। তোমাদের আজ ছুটি।

সুবল বলল, ছেলেমানুষি কর না। বাড়ি না গেলে মা ভাববে। আর একদিন এসে খাব।

—তুমি কি সুবলদা, তোমার মুখে গন্ধ লেগে আছে!

—মা বুঝতে পারবে না। সত্যি গন্ধ লেগে আছে! যা!

দীপু বলল, সুবলদা, বুঝতে পারুক না পারুক, তোমাকে আমি যেতে দিচ্ছি না।

—তুমি বড্ড জেদি মেয়ে।

—যা খুশি বল। বলেই সে দরজার দিকে হাঁটতে থাকলে সুবল ডাকল, এই দীপু, প্লিজ আজ আমি যাচ্ছি। আজকে আমাকে আটকে রেখ না। ওদিকে গিয়ে তোমার কিছু বলতে হবে না।

—দেখি কি হয়! বলে সে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তারপর সুবল কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। না দীপু, না অবিনাশ। অবিনাশ আবার টের পায়নিতো। কাকীমা! সে কেমন গতকালের ঘটনার জন্য নিজেকেই দায়ী করল। ওর ইচ্ছা না থাকলে দীপু কখনও সেই রহস্যময় জায়গায় নিয়ে যেতে পারত না। একটা অদ্ভুত জায়গা, যা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, অথবা যেন নানারকম গান বাজনা, কি সুন্দর সুন্দর সব যুবক-যুবতী, ওদের আচরণ এবং বেলেল্লাপনা সব মিলে সুবলকে কিছুক্ষণের জন্য প্রায় স্থবির করে রেখেছিল। এতবড় বাড়িতে সে একা বসে আছে। কোথাও কোন শব্দ উঠছে না। এবং অলিন্দে কারুকাজ করা ছবি, সব মিলে সুবলের মনে হল একটা ষড়যন্ত্রের ভিতর সে আটকা পড়ে গেছে।

কিন্তু দীপু আসতেই সবকিছু আশ্চর্য রকমের সরল সহজ মনে হল। তারপর সারাটাক্ষণ ঘরের মানুষের মত দীপু রেঁধে বেড়ে সুবলকে দুটো শাক-অন্ন খেতে দিল। বলল, সুবলদা, আমি রান্না করেছি। তুমি খাও। যেন বলার ইচ্ছা আমার মানুষকে আর কবে খাওয়াতে পারব ফের জানি না। তুমি খাও।

—এত খাবার আমি খেতে পারি না।

—আমিতো আছি সুবলদা।

—বাকিটা তুমি খাবে! কি যে বল না! বলেই সে সব কিছু একটু একটু করে পাতে তুলে নিল।

সুবল খুব নিবিষ্ট মনে খাচ্ছিল। কাকীমা মাঝে মাঝে আর কি লাগবে না লাগবে দেখে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে কাকীমা এরই ফাঁকে দেশবাড়ির গল্প যে দু-একবার না তুলেছেন তাও নয়। তবু মনে হয়েছে, সুবল অথবা দীপু তিনি থাকলে স্বস্তি বোধ করছে না। সুতরাং কাকীমা যতটা পারছেন তাঁর এলাকাতেই থাকছেন। বড় বেশি এদিকে আসছেন না।

আর সুবলের কি কারণে যে মনে হল—এই বাড়িতে দীপুর একটা আলাদা মর্যাদা আছে। দীপুকে সবার তোয়াজ করে চলার স্বভাব। দীপু যা পছন্দ করে—সবারই সেটা মেনে নেওয়ার অভ্যাস। সে খেতে খেতে বলল, এত কেন আমার জন্য।

—তোমার জন্য কিছু করিনি সুবলদা। সবটাই আমার জন্য, আমার ভাল লাগার জন্য করেছি।

সুবল খেতে খেতে হঠাৎ হাত তুলে বসে পড়ল। বলল, এত যখন আমার জন্য করছ, খাবার শেষ করার আগে, তোমাকে একটা শপথ করতে হবে দীপু।

—কি শপথ বল।

—এক নম্বর, তুমি ভাল মেয়ে হবে। দু নম্বর, তুমি ইতুর বিয়ে যাতে ভেঙে না যায় তা দেখবে।

দেখব, কথা দিলাম।

·

·

উৎসবের দুদিন আগে আনন্দদা এসে হাজির। বললেন, সুবল, তুমি আর যাচ্ছ না কেন?

সুবল বলল, শরীরটা ক'দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। পরীক্ষার একগাদা খাতা। এসব দেখে টিউশনি সেরে আর যাবার সময় করে উঠতে পারছি না।

—তোমরা সবাই হাত না মেলালে আমার পক্ষে সম্ভব এ-কাজ উদ্ধার করা!

—আজই যাব দাদা। সুবল না গিয়ে যেন সত্যি খুব অন্যায় করেছে। খুব কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, বসুন, চা খেয়ে যান। বলে সে ডাকল, মা দ্যাখো কে এসেছেন।

মা রান্নাঘরে ছিলেন বলে টের পাননি আনন্দ এসেছে। এই ছেলেটি তার পরিবারের খুব কাছের মানুষ। বিশেষ করে এখানে আসার পর আনন্দ ওদের জায়গা দেখে দেওয়া, জমিটা সস্তা দরে পাইয়ে দেওয়া, সুবলের কাজ, সব

দেখেশুনে এমন একটা কাছাকাছি ব্যাপার ঘটিয়ে ফেলেছে যে আনন্দদা এলে মা কি করবেন ভেবে পান না।

—আনন্দ তুমি! ওমা! ইতুর বিয়ে ভাবতে যে কি ভাল লাগছে!

—আপনাদের সবাইকে কিন্তু যেতে হবে।

—সে যাব বাবা।

সুবল বলল, দাদা, মা তো যেতে পারবেন না। সুবল মার হয়ে কথাটা বলল। বোধ হয় মুখের ওপর মা যে যেতে পারবেন না, বলতে পারছেন না। তাই মা কোনরকমে 'সে যাব বাবা' বলে কথা শেষ করেছেন। বাবার মৃত্যুর পর মা কোন উৎসবে যান না। কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। কিন্তু আনন্দদাকে মা আর তেমন বলতে না পারায় সুবল বুঝতে পারছিল, কথাটা বলতে মার সংকোচ হচ্ছে।

আনন্দদা বললেন, ইলু-বিলু যাবে। তুমি ইলু-বিলুকে নিয়ে যাবে।

মা চা এনে বললেন, তুমি এবার একটা ইলু বিলুর সম্বন্ধ দেখে দাও বাবা। সুবলকে দিয়ে কিছু হবে না।

—কেন মাসিমা, এমন কথা বলছেন! সুবল না থাকলে আমাদের ইতুর এমন বড় ঘরে বিয়েই হত না। আপনার ছেলে কত কাজের আপনি জানেন না মাসিমা।

—আমি বাবা এখানে এসে পর্যন্ত তা আর টের পেলাম না। এমন কুঁড়ে মানুষ, যে ওর বাবার পুরো ধাতটা পেয়েছে। কিছুতেই কোন হুঁস নেই। কত জায়গায় যে আমরা মার খেয়েছি বাবা, ওর ঐ এক স্বভাবের জন্য।

সুবলের এ-সব কথা ভাল লাগছিল না। মার আজকাল এটা হয়েছে। যত সুবল মার পছন্দ মত চলতে পারছে না তত নালিশ সবার কাছে—এবং কেউ এলেই সংসারের নানারকম দুঃখের কথা টেনে আনা, এবং মা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। দীপুদের বাড়ি, অথবা দীপু যে আসে, একটু বেশি যোগাযোগ রাখলে দীপু হয়ত এ-ঘরের বৌ হয়ে যেতে পারে—মা এমনও একটা আশা পোষণ করছেন। সুবলের কেবল মনে হল—আশা কুহকিনী। সে বলল, ইলু বিলু সকালেই চলে যাবে।

—তাই পাঠিও। তোমার বৌদির তবে খুব সুবিধা হবে। হাতের কাছে ওর বড় লোকের অভাব।

আনন্দদা চা খেতে খেতে বললেন, নিমন্ত্রণের চিঠি এখনও অনেককে দেওয়া হয়নি। হাতে মাত্র দুদিন সময়। বিকেলে তুমি তোমার বৌদিকে নিয়ে বের হয়ে যাও। চিঠিগুলো দিয়ে এস। তারপর কি করতে হবে দেখেশুনে কর।

সুবল বলল, আজ থেকে দরকার হয় ওখানেই থাকছি। ছুটির দরখাস্ত করে দেব। তিনদিন ছুটি নিলেই মনে হয় হয়ে যাবে। কমলেশ ওরা আসছে না!

—আসছে সবাই। কিন্তু ওদেরতো তুমি জানো!

—মাসিমা মেসোমশাই চলে এসেছেন?

—সবাই চলে এসেছে। তুমি যে বাড়িটা ঠিক করেছিলে বিয়ের জন্য, সব দিক থেকে বাড়িটা ভাল হবে ভেবে ঐ বাড়িটাই নিলাম। বড় রাস্তার ওপর। সামনে একটা বড় মাঠ আছে। বেশ ফাঁকা জায়গাটা। হাত পা মেলে কাজ করা যাবে।

—বাড়িটার জন্য কিছু আগাম দেবার কথা ছিল।

—ওটা দেওয়া হয়ে গেছে।

ইলু বিলু কোথায় ছিল, আনন্দদার গলা পেয়ে ওরা এখন এ-ঘরে এসে গেছে। আনন্দদা এলেই ওদের ঘিরে ধরার স্বভাব—দাদা একটা গান গেয়ে শোনাও। আনন্দদা বড় গায়ক, কোন অহঙ্কার নেই, বিশেষ করে এ-দুটো মেয়ের কাছে আনন্দদা সাধারণ মানুষ। ইলু বিলুর আবদারে নানাভাবে বিরক্ত হবার কথা। এবং ইলু বিলুকে দেখেই সুবলের মনে হল, ওরা এখন আনন্দদাকে ধরে বসতে পারে—সেজন্য সুবল, ইলু বিলুকে না বলে যেন পারল না, আজ আনন্দদাকে গান গাইতে অনুরোধ করবে না। ওঁর অনেক কাজ।

আনন্দদা বললেন, আজ সত্যি গাইব নারে। তোরা খুব আশা করে আছিস! কিন্তু অনেক কাজ। আমি তো কখনও কারো বিয়ে দাঁড়িয়ে দিইনি। সব বাবাই করেছেন।

ইলু বলল, আমি বুঝি কিছু বুঝি না!

সুবল বলল, না তোমরা কিছু বোঝ না। সেবার মনে নেই আনন্দদা, রিষড়াতে একটা ফাংশান করতে যাব, আমার দেরি দেখে আপনি আমাকে তুলে নিতে এলেন, তাড়াতাড়ি আমাদের পৌছানো দরকার—তখন কিনা মেয়েদের বায়না, একটা গান! আমার যে কি রাগ হয়েছিল না সেদিন। আর আনন্দদাও তেমনি। সে এবার ইলু বিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান সব সময়েই একটু কম থাকে।

ইলু বলল, হ্যাঁ বলেছে!

বিলু বলল, মেয়েরা বেশি প্র্যাক্টিক্যাল।

সুবল এবার ধমক দিল, নে রাখ পাকা পাকা কথা।

আনন্দদা বললেন, এটা তোমার অন্যায় সুবল, কথায় না পারলে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেওয়ার স্বভাবটা তোমার গেল না। তারপর হাতে সময় কম বলে তিনি আগের কথায় চলে এলেন, আলো খাওয়া সাজসজ্জা বাবদ 'আর্ট ডেকরেটিঙ হাউজ' চার হাজার টাকা চাইছে। বাবা তাতেই রাজি। বাবার শেষ কাজ।

সুবল বলল, সুতরাং বাজি কম ফাটানো হবে—এটা বলতে চান?

—না না, তা বলছি না।

—তবে!

—কোত্থেকে যে কি হবে ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমি কিন্তু দাদা সে-সব শুনছি না। বাজির কমতি থাকবে না। বিয়ের দিন আমার ছুটি! আমি কেবল বাজি ফাটানোর কাজটা তদারক করব। সে এসব কেমন ছেলেমানুষের মত বলতে বলতে সহসা একটা জায়গায় এসে থেমে গেল। সে যে আরও কি বলে ফেলত। সে বুঝি এখনই একটা কেলেঙ্কারী করে ফেলত।

আনন্দদা হাসলেন।—তোমার ছেলেমানুষী যাবে না আর। সে হবেখন। তাহলে তুমি আসছ বিকেলে। বলে তিনি চলে যেতেই মনে হল একবার দীপুকে ফোন করে জানানো দরকার—সব প্রস্তুত। ওর বুকটা কেমন সহসা কেঁপে উঠল। কি হয় কিনা হয়, দীপু একমাত্র ভরসা। দীপুকে সে ফোনে দুপুরে পেল না। দীপু ওর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে কি কারণে গেছে। সে এখন কি করবে বুঝতে পারল না। দীপুকে এখন কি করে ধরা যায়, দীপুর সঙ্গে ওব খুব তাড়াতাড়ি দেখা হওয়া দরকার। দীপুদের বাড়ি থেকে সব খবরটা নেওয়া যাবে ভেবে সে বের হয়ে পড়ল।

রাস্তায় সে কিছু ভাবতে পারছিল না। কারণ ওর জন্য একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যেতে পারে! সে প্রথম ভাবল বাসে যাবে, বাসে গেলে দেরি হবে, অথচ একটা ট্যাক্সি কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সে যে কি করে! ইতুর মুখটা ভেসে উঠছে। সে ভয়ে কেমন গুটিয়ে গেল। ওর মুখের কাছে তবে আর টিকতে পারবে না সুবল। সে মনে মনে বলল, দীপু, আমাকে উদ্ধার করে দাও। তুমি যা বলবে আমি করব। এবং এ-সময় একটা ট্যাকসি সামনে, সে কিছু না বলেই উঠে পড়ল। আজকাল ওদের মর্জিমত যেতে হয়—যদি পছন্দ না হয় নেবে না। সেজন্য কোন কথা না বলে দরজা খুলে প্রথম উঠে পড়ল—তারপর কোথায় যাবে, এবং কতক্ষণ লাগতে পারে মনে মনে চিন্তা করল। ট্যাকসি ড্রাইভার বলল, কোথায় যাবেন?

এতক্ষণে মনে হল সুবলের, ওর বলা উচিত কোথায় যাবে। সে বলল, আলিপুরের দিকে চল।

এবার সুবল দীপুকে ওদের এক নম্বর ফ্যাক্টরির বোর্ডরুমে পেয়ে গেল। সুবলকে এই ফ্যাক্টরি পর্যন্ত ছুটে আসতে দেখে দীপু বিস্মিত। সে বলল, তুমি এখানে!

সুবল বলল, আমি জল খাব।

দীপুর কি যে আছে এখানে, সে চারদিকে তাকাল, কি সুন্দর বোর্ডরুম। বড় টেবিল কাচের, দামী ক্যালেণ্ডার টেবিলে। চারপাশের দেয়াল সাদা রঙের। নীল রঙের কাচের জানলা এবং ওয়ারড্রোবে ওর জন্য দামী কাচের গ্লাস। বেয়ারার মাথায় সেই ঝালরের টুপি। দীপু কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে না, খুব ভেবেচিন্তে

যেন কথা বলছে। কে একজন টাই-পরা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেল। দীপুর কোথায় যে কি ইঙ্গিত আছে—লোকটা চলে গেল। জল এল বড় একটা ট্রেতে। সঙ্গে ন্যাপকিন। সুন্দর রঙ-বেরঙের জলের ঢাকনা, রঙ-বেরঙের কাজ করা কাচের গ্লাসে জল, জলের ভিতর নির্মল ছবি দীপুর—সে হতবাক হয়ে এইসব ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে দীপুকে কি বলতে হবে ভুলে গেল। সে সন্দেশ খেল না। শুধু জলটা এক নিঃশ্বাসে খেয়ে কেমন এক জড়তা নিয়ে বসে থাকল দীপুর কাছে। তার মুখে কোন কথা জোগাল না।

—তোমাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।

সুবলের মনে হল দীপু সময় বুঝে ঠাট্টা করছে। ওর মনে হল দীপুরই বলা উচিত এখন কতটা সে কি করতে পেরেছে। অথচ দীপু যেন কিছুই জানে না। সে কেন আসতে পারে কিছুই বোঝে না। সে বিরক্ত হয়ে বলল, মামাবাবু কিছু বললেন?

আবার তখন দরজায় মুখ। কেউ উঁকি দিচ্ছে। বেয়ারার মুখ, সুবল চিনতে পারে। কিন্তু আসতে সাহস পাচ্ছে না। কেউ হয়তো দীপুর সঙ্গে দেখা করার জন্য বাইরে বসে আছে। দীপুর এখন কাজের সময়। ওর অসুবিধা হয় এমন কিছু করা উচিত না। সে তাড়াতাড়ি ওঠার জন্য ফের বলল, কি কিছু বলছ না যে!

দীপু কেমন নিরুত্তাপ গলায় বলল, মামাবাবুকে বলা হয়নি। কাল বলব ভাবছি।

সুবল যে একটা অফিসে বসে আছে অথবা কোম্পানির বড় কর্তার ঘরে—সে বুঝি মুহূর্তে ভুলে গেল। অথবা দীপু এখানে এমন একটা পজিশানে আছে যা সবার কাছে খুব লোভনীয়। দীপুর কাছে এখানে সবাই বিনীত ভদ্র। দীপুর ঘরে ঢোকার জন্য অনুমতি প্রয়োজন। ওর সঙ্গে দেখা করা অনেকের কাছে খুব কঠিন, তখন সুবল এক সামান্য মানুষ কেমন ক্ষেপে গেল। এবং দীপু যেন সেই নদীর চরে খেলা করতে করতে হঠাৎ ভয় দেখাবার জন্য কাশ-বনে লুকিয়ে পড়েছে, দীপুকে দেখা যাচ্ছে না অথচ সূর্যাস্ত হচ্ছে, নদীর চরে অন্ধকার নামবে, দীপুকে নিয়ে ঘরে ফেরা উচিত আর কিনা দীপু লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই এক অধিকারেই বুঝি সুবল কেমন চিৎকার করে উঠল, তুমি দীপু এটা ছেলেখেলা ভেবেছ! আনন্দদা সব ঠিক করে ফেলেছেন। বাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে। আশীর্বাদ হয়ে গেছে। ডেকরেটার্সদের এ্যাডভান্স করা হয়েছে—আর এখনও তুমি এটাকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছ না। কিছু যদি হয় তবে আমার মুখ দ্যাখানোর জায়গা থাকবে!

এবার দীপু সুবলদাকে রেগে যেতে দেখে বলল, আরে বাবা বলেছি। তবে এখনও ফাইন্যাল কিছু বলতে পারছি না বলে, তোমাকে কিছু বলতে চাইছি না।

—ওঁরা কি বলেছেন?

—মামাবাবু বলেছেন, তিনি আরও খোঁজখবর নেবেন।

—আমার চেয়ে খোঁজখবর কে ভাল দিতে পারবে?

—তিনি বলেছেন, খোঁজখবর নিয়ে যা হয় স্থির করবেন।

—তবে তুমি আমাকে নিয়ে চল। আমি সব বলব।

—তোমার ওপর ওদের আর বিশ্বাস নেই। একটা লোক তোমার সব খবর রাখে।

লোকটা কি তবে সেই লোকটা—যে কখনও রিকসাতে থাকে, কখনও পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অথবা সিনেমা থিয়েটারে—সে ইতুকে নিয়ে হাজারিবাগ থেকে কোথায় যায়, কোনো সিনেমায় গিয়েছিল কিনা মনে করতে পারে না, সে একদিন ইতুকে নিয়ে কিছু কেনাকাটার জন্য বের হয়েছিল। একদিন ইতুর কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হওয়ায় সে ফেরার পথে দেখা পেয়ে গেছিল—তখন ইতু বলেছিল, আমার খুব খিদে পেয়েছে। খাব। সে এবং ইতু ভালো একটা রেস্তোরাঁতে বসে বেশ জমিয়ে আড্ডা দিয়েছিল। ইতুর ঐ স্বভাব। মন ভালো থাকলে ইতু ওকে নিয়ে কি যে করবে ভেবেই পায় না! যত বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে তত ইতু ওকে দেখলে ভীষণ ক্ষেপে যাচ্ছে। প্রায় বলতে গেলে শেষ ক'দিন সে ইতুর ভয়েই আনন্দদার বাড়ি যায়নি। তারপর এমন একটা ঘটনা ঘটলে—সে যে কি করবে! সে কোন অবলম্বন খুঁজে না পেয়ে বলল, তবু তুমি আমাকে নিয়ে চল। আমি ওদের হাতে পায়ে ধরে কিছু করতে পারি কিনা দেখি।

—তুমি যখন বলছ, তোমাকে নিয়ে আমি কাল যাব। দীপু একটা বড় রকমের হাই তুলল। সুবল বুঝতে পারল দেখে, দীপুর যেন এ-সব পেটি ব্যাপারে একেবারেই উৎসাহ নেই। ওর হাই ওঠা দেখে সুবল দমে গেল। অথবা এও হতে পারে দীপু আসলে কি ঘটবে, না ঘটবে সব জানে। কিছু বলছে না অথবা ভাঙছে না—এই ভেবে যে মামাবাবুর মুখ থেকেই আনন্দদা ব্যাপারটা জানুক। এবং দীপুর হাই ওঠা দেখে আরও যা মনে হল সুবলের, খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও দীপু সুবলকে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্য সময় হলে সুবল কি করত বলা যায় না। মাছের কাঁটা আটকে যাওয়ার মত ব্যাপারটা। কেন যে সে মরতে গেল, এসব ব্যাপারে নাক গলানোই ঠিক না—তবু সে খুব অসহায় গলায় ওঠার সময় না বলে পারল না, তুমি দীপু আমাকে কথা দিয়েছ! অবশ্য এ-সব কথার কোন দাম নেই। আমরা কথার দাম বড় কেউ আজকাল দিই না। অসহায় ভেঙে-পড়া মানুষের মত সুবলকে দেখাচ্ছে।

সুবল একটু থেমে বলল, তা হ'লে যাচ্ছি।

—একটু বোস। দীপু খুব আন্তরিকতার সঙ্গে কথাটা বলল। এবং ঘণ্টা টিপতেই বেয়ারা এসে হাজির। দীপু বলল, আমাদের প্লাইমাউথটা বের করতে

বল। সাহাবকো লেকে যায়ে গা।

—আরে না না। এখন আমার গাড়ির দরকার হবে না।

দীপু বলল, তুমি আমার ওপর রাগ করছ।

সুবল আর কিছু বলল না। দীপু লকারের চাবিটা অন্যমনস্কভাবে আঙুলে ঘোরাচ্ছিল। এবং খুব আয়েসে দিন কেটে যাচ্ছে, চোখ মুখ দেখে এমন মনে হচ্ছে। তারপর দীপু কেমন স্মার্ট গলায় বলে উঠল, বিয়ের ব্যাপারটাকে তোমরা যে কেন এত বড় করে দ্যাখো বুঝি না। আসলে...।

সুবল খুব বিনীতভাবে বলল, এখন তর্কে যেতে ভাল লাগছে না দীপু। ইতুর বিয়ে হয়ে গেলে এ-সম্পর্কে একটা লেকচার দেওয়া যাবে। এবং দীপু যতটা স্মার্ট গলায় কথাটা বলেছিল, সুবল যেন তার চেয়ে এক কাঠি ওপরে। দীপু সুবলের এমন চেহারার সঙ্গে কখনও পরিচিত ছিল না। সুবলের আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব সামান্য কথায় এত বেশি ধরা পড়েছে যে দীপু খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকল, কখন সুবলদা বের হয়ে গেল এবং কখন সে নিজের ভিতরে ডুব দিয়ে জীবনের সবচেয়ে দামী মুহূর্তটিকে স্মরণ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল আদৌ টের পায়নি।

বেয়ারা এসে বলল, মেমসাব, শেঠ বিশ্বেশ্বর আগরওয়াল।

দীপু বলল, বল আজ কোন কথা হবে না। আমি বের হয়ে যাচ্ছি। সেক্রেটারি সাবকো বল আসতে।

সেক্রেটারি মিঃ মজুমদার এলে দীপু বলল, মজুমদার কাকা, আমি ক'দিন ছুটি নিচ্ছি। আসছি না।

সুবল সোজা আনন্দদার বাড়িতে ঢুকে দেখল কেমন সবাই চুপচাপ। আত্মীয় স্বজনে বাড়ি ভরে গেছে। অথচ কেউ কথা বলছে না। কেবল টুকুন আপন মনে বাগানে খেলে বেড়াচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি করছে কোথাও। বৌদিকে সে খুঁজে পেল না। আনন্দদা নেই, ওরা কোথায় গেল!

সে ইতুর ঘরে উঁকি দিল। সেখানেও কেউ নেই। সুবল এ-সব দেখে পায়ে কেমন শক্তি পাচ্ছিল না।

সে বাড়ি ফিরে যাবে বলে দরজার সিঁড়িতে নামতেই দেখল আনন্দদা, বৌদি আর ইতু গাড়ি থেকে নামছে। আনন্দদা সুবলকে দেখে বললেন, তুমি যাবে না সুবল। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কি কথা শুনতে হবে, আনন্দদা কি বলবেন! আনন্দদা কি এতক্ষণে আসল খবরটা পেয়ে গেছেন। বৌদি পাশ কাটিয়ে গেলেন। খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না সুবলকে দেখে। ইতু মুখ ঘুরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। আনন্দদা এখন তাকে শেষ পর্যন্ত কি বলবেন সেই ভয়ে সে কোনরকমে নিজের ভিতর তৈরি হতে

দেখল, টুকুন এসে পায়ের কাছে দাঁড়িয়েছে। এ-পরিবারে এই ছোট্ট মেয়েটি কেবল তাকে নিজের ভাবছে। সে সুবলের কোমর জড়িয়ে ধরে বলছে, কাকু তুমি একা এখানে দাঁড়িয়ে আছ! ভিতরে যাবে না!

—যাচ্ছি।

সুবল ধীরে ধীরে আনন্দদার ঘরে গিয়ে বসল। ওর গলা শুকিয়ে উঠছে। সে বলল, আমি জল খাব, আনন্দদা। সে যে কতবার জল খাচ্ছে। ওর এত জলতেষ্টা পাচ্ছে কেন বুঝতে পারছে না।

আনন্দদা বললেন, ইতু, সুবলকে এক গ্লাস জল দে।

সুবল কিছুটা জড়সড় হয়ে বসে আছে। আনন্দদা জল দিতে বলে পাশের ঘরে কাপড় ছাড়তে চলে গেলেন। সুবল এখন এ-ঘরে একা। সুবলের মনে হল আনন্দদা ইতুকে জল না দিতে বললে ভাল করতেন। বাড়িতে আরও কত সব মানুষ আছে, কেউ দিলেই হত। ইতু এ-ঘরে জল নিয়ে এলে সে যে কি বলবে! ইতুর মুখোমুখি হতে সে ভয় পাচ্ছে। এবং ঘরে পায়চারি করতে করতে দেখল, টুকুন বড় এক গ্লাসে জল নিয়ে আসছে। ইতু আসেনি—রক্ষা। কিন্তু পরমুহূর্তেই এক আশ্চর্য বিষণ্নতা এবং অপমানের মত খোঁচা লাগল বুকে। সে বসে জলটা নেবার সময় টুকুনকে আদর করার কথা ভুলে গেল। সে জলটা খেল এক নিশ্বাসে। তারপর গ্লাসটা টুকুনের হাতে দিয়ে বলল, টুকুন তোর পিসি কি করছে রে!

—পিসি শুয়ে আছে। পিসির ক'দিন থেকে মাথা ধরছে। খুব কষ্ট।

—কেবল শুয়ে থাকে।

—শুয়ে থাকে। খায় না। মা রাগ করে। বাবা বকেছে পিসিকে।

—ওকে বকার ওপরই রাখা দরকার। ও যা মেয়ে। বস্তুত সুবলের এ-সব কথা মনের। কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনের কথা কি করে যে বের হয়ে আসে। সুবল তাড়াতাড়ি বলল, তুমি আবার পিসিকে এ-সব বলে দিও না।

টুকুন মাথা দুলিয়ে বলল, আচ্ছা।

কারণ সুবল জানে ইতু এখন টুকুনকে নানারকম প্রশ্ন করবে। কি বলল রে! সুবলদা আমার কথা কিছু বলল! এবং বললে যেন সে ঝগড়া করতে আসবে। আপনি কি বলেছেন সুবলদা! আপনি তো ভারি খারাপ মানুষ। সারাটা জীবন পেছনে লেগে রয়েছেন।

সে মনে মনে সওয়াল করল, না ইতু, সারাজীবন বলবে না। সেই যে একদিন জলসায় নিয়ে গেলাম আনন্দদাকে, আমার আলাপ তার সঙ্গে সেখানে, তিনি কেন যে আমাকে আপন ভেবে ফেললেন এত, আর বললেন, সময় করে একদিন

এস, সেই থেকে আসা-যাওয়া, কি যে আকর্ষণ তোমাদের বাড়ির, পরে ভেবে দেখেছি গানের আকর্ষণ বোধ হয়, কিন্তু আরও পরে মনে হয়েছে আমার ভিতরে আর একটা গানের কলি বাজছে—তার অর্থ স্পষ্ট না হলেও খুব সংগোপনে টের পেতাম—গানের কলিতে একটা মাত্র শব্দ ঘুরে-ফিরে বাজছে—ইতু, তুমি আমার। ইতু, তুমি আমার। এমন ভাবতে ভাবতে সুবল কেমন ছেলেমানুষের মত আপন মনে হেসে দিল।

তারপর সুবল নিজেকে বলল, ইতু, তোমার বিয়ে হয়ে গেলে দেখবে আমি সব ভুলে যাব। তোমাকে আর জ্বালাব না। তুমি বেশ একটা নতুন জীবনে ঢুকে গেলে আমার মুক্তি। আমি বেশ একজন তোমার কাছে তখন দূরদেশের যাত্রী হয়ে যাব। তুমি মাঝে মাঝে জানালা খুললে দেখতে পাবে অনেক দূর দিয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি। ঠিক চিনতে পারবে না, অথচ মনে হবে সেই মানুষটা যেন।

এ-সময় আনন্দদা ফিরে এলেন। সে যে কি ছাইপাশ ভাবছিল। একটু মনটাকে চাঙ্গা করে নিল সুবল। সবকিছু সাহসের সঙ্গে ফেস্ করা ভাল।

আনন্দদা ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

সুবল বুঝতে পারল খুব খারাপ কিছু খবর আছে। সে প্রায় দম বন্ধ করে বসে থাকার মত বসে থাকল।

আনন্দদা পাশের একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ছেলের বাপ ইতুকে দেখতে চেয়েছিল। তাই নিয়ে গেছিলাম।

—ওরা এখানে আসতে পারল না।

—মোকাম্বোতে ওরা টেবিল রিজার্ভ করেছিল! পার্টিতে আমাদের নিমন্ত্রণ—এভাবে কিছু দরকারী কথাবার্তা সেরে নেওয়া আর কি!

সুবল বলল, ওঃ।

আনন্দদাই আবার বললেন, মনে হয় ইতুর কিছু দুর্নাম ওদের কানে উঠেছে। ওরা তেমন কিছু অবশ্য ভেঙে বলল না। ওরা অন্য কথা বলল, ওদের পারিবারিক কি সব অসুবিধার জন্য আগামীকাল হয়ত বিয়েটা নাও হয়ে উঠতে পারে।

সুবল বলল, ওরা আর কিছু বলেনি?

—না। ব্যবহার খুব ভাল। ছেলের বাবা ভীষণ অমায়িক লোক।

—তিনি জানেন না যে আপনি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

—জানেন। কেবল বললেন, নিরাশ হবেন না। কালকের দিনটাতো হাতে আছে।

—ওরা ছোটলোক আনন্দদা। সুবল এমন কথা কখনও বলে না। আনন্দদা

বুঝতে পারল না সুবলের ক্ষোভটা কোথায়। তিনি বললেন, মাথা গরম করে কি হবে!

সুবল বলল, দীপুরা এত ছোট! কাকীমা এত ছোট!

—তুমি ওদের দোষ দিচ্ছ কেন?

আর আপনি, যেন সুবলের বলার ইচ্ছা, একদিন হাতে রেখে এই রিসক্ নিচ্ছেন! কিন্তু বলতে পারল না। বললে যেন এমন শোনাবে—আমি তো দাদা রয়েছি, আপনি বলে আসতে পারলেন না—না, এ-বিয়ে এ-ভাবে হবে না। এটা আমাদের পক্ষে ভারি অসম্মানের ব্যাপার। সুতরাং চুপচাপ থাকল। সব কথাই যেন ওর স্বপক্ষে হয়ে যাবে। ওর নিজের জন্য ওকালতি করা হবে। ইতু পাশে কোথাও কান পেতে থাকতে পারে। এবং ওকে এমন বলতে শুনলে ইতু ক্ষেপে যাবে। তলে তলে তোমার এই দুর্বুদ্ধি। আমাকে হাত করার ষড়যন্ত্র। সে ভয়ে ভয়ে বলল, ওরা ইতুকে কিছু বলেছে!

—পাত্রের বাবা কিছু অসংলগ্ন কথা বললেন।

সুবল চুপ করে আছে। বাকিটা আনন্দদা নিজেই বলবেন। সে সেজন্য কোন প্রশ্ন করল না।

—তোমার সম্পর্কেই বেশি কথা। কবে থেকে আলাপ, কিভাবে আলাপ। অবশ্য পরে বলতে হয় বলে বলা, ওর মত ছেলে হয় না। খুব ভাল ছেলে।

সুবল আর চুপ করে থাকতে পারল না।—আপনি কি বললেন?

—আমি আর কি বলব! আমি তো এখন বলির পাঁঠা। ওদের হাতে দা। যেদিকে খুশি সেদিকে কাটবে। কাল দুপুরে জানিয়ে দেবে বিয়ে হচ্ছে, কি হচ্ছে না।

সুবল স্থির থাকতে পারছিল না। সে বলতে চাইল, আনন্দদা, এতবড় অপমান আপনি হজম করে ফিরলেন! কিন্তু সে কিছু বলতে পারল না। বললেই বুঝি তেমনি শোনাবে আমিতো আছি আনন্দদা। কিন্তু তুমি যে 'পেটি অধ্যাপক', দুবেলা টিউশনি না করলে ভালভাবে চলে না। সুতরাং সুবলের মনে নানারকম দুঃস্বপ্ন ভেসে বেড়াতে থাকল। সুবল উঠে দাঁড়ালে আনন্দদা বললেন, তুমি শেষবার চেষ্টা করে দেখতে পার। তুমি এবং তোমার কাকীমা।

ওরা তবে সব খুলে বলেনি। অথবা চিঠিটা দেখায়নি। দেখালে আনন্দদা নিশ্চয়ই ওকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে বলতেন না। সে বলল, দাদা আপনি বিশ্বাস রাখুন, আমি এ-ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

—সে আমি জানি না! আনন্দদা এগিয়ে দেবার মত কথাটা বললেন।

সুবলের মনে হল সে যা যা বলছে এখন সবটাই যেন অপরাধ স্খালনের জন্য। সে যা যা করলে সব ঠিকঠাক হয়ে যায় তার জন্য বার বার কথা দিচ্ছে,

কথা রাখতে পারলে একটা বোঝা নেমে যায় মাথার ওপর থেকে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, মেসোমশাই জানেন!

—না। কেবল আমি, তোমার বৌদি আর ইতু জানে ব্যাপারটা! সবাই এসেছে, অনর্থক বলে লাভ কি। যা হবার তো কাল হবে। যা খরচপত্র সব তো আগেই হয়ে গেছে। কেনা-কাটার তো আমি কিছু বাকি রাখিনি সুবল।

—বাড়িতে ঢুকে দেখলাম সবাই চুপচাপ, আমার মনে হল, কিছু একটা হয়েছে।

—না, কেউ জানে না।

সুবল কলেজে গিয়েই ফোন করল দীপুকে।

—কে?

—আমি সুবলদা বলছি।

—সুবলদা, পরশু বিকেলের দিকে তোমার হাতে কোন কাজ রেখ না।

—মানে?

—তোমাকে নিয়ে আমি এক জায়গায় যাব। ওদের কথা দিয়েছি।

আমার হয়ে তুমি কথা দাও কি করে! আশ্চর্য! তবু সে মুখে কিছু বলল না। গলার স্বর পাল্টে দিল। বলল, সে হবে।

তারপর সুবল একটু গলা সাফ করে বলল, তুমি কোন কাজ রাখবে না হাতে। কাল সকালে আমার সঙ্গে তোমারও যেতে হবে।

—তোমার এত দয়া।

—হ্যাঁ, এটা তোমার দয়া না হয়ে আমারই হবে।

—এই প্রথম তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছ। তোমার কাছ থেকে এমন সাড়া পাব আশাই করতে পারিনি। কিন্তু কি ব্যাপার বলতো? আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে না!

সুবল ভাবল এক ধমক লাগায়। কিন্তু সুবলের স্বভাব উল্টো। সে যা চায় তা কখনও চেয়ে নিতে পারে না অথবা বলে দিতে পারে না, দীপু এখন আমার আনন্দ করার সময় নয়। এটা আমার জীবন-মরণ সমস্যা। হয়ত এটুকু বলেই সে ফোন ছেড়ে দিত। কিন্তু অন্যপ্রান্তে মেয়েটির গলায় ভারি খুশির আমেজ। খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, এখন আমার ছুটি। তুমি আমায় যেখানে বলবে চলে যাব। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। দীপু আরও কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ফোন কেটে গেল। সুবল বলল, যাঃ।

কিন্তু একটু পরেই দীপুর ফের রিঙ।—তুমি ফোন কেটে দিলে কেন!

—কেটে দিইনি, কেটে গেল।

—শোনো, গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তুমি আবার মাতব্বরের মত বের হয়ে পড় না।

—গাড়ি পাঠালে খুব সকালে পাঠাতে হবে।

—যখন বলবে।

তারপর সুবলের মনে হল এই রাতে গেলে হয়ত ভাল হত। কিন্তু দীপুর মামাবাবু নাকি ক্লাব-জীবনে অভ্যস্ত। সন্ধ্যা হলেই কোথায় একটা বড় ক্লাব আছে সেখানে যান। এবং খুব একটা সুস্থ থাকেন না। নানাদিক ভেবে সুবল বলল, তুমি একটা কাজ করতে পারবে।

—কি কাজ?

—তোমার মামাবাবুকে একটা এপয়েণ্টমেণ্ট করে রাখতে হবে।

—কেন বলতো? যেন দীপু কিছু জানে না। গলার স্বরে এমন একটা ভাব।

—সকালে সব বলব।

—এই!

—কেন হতাশ হলে।

—কত কিছু ভেবেছিলাম।

—বিপদটা কাটুক। তারপর যা খুশি আমাকে নিয়ে কর। বলেই সুবলের মনে হল এতটা কেনা গোলামের মত কথা না বললেই হত। তবু সে জানে এখন এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারে না। মাথাটা কেমন ভার হয়ে আছে। বেশি কিছু বললে আরও ভুলভাল বলে ফেলবে।

ভোরে উঠে সুবল দেখল, দরজায় গাড়ি হাজির। খুব নতুন মনে হল গাড়িটা। এবং কি মডেল, কি নাম সে কাছে না গেলে বুঝতে পারছে না। অবশ্য এসব দেখার উৎসাহ তার এখন একেবারেই নেই। সে ধুতি পরল। গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি গায়ে দিল এবং মুগা রঙের চপ্পল। এই পোশাকে ওকে ভালো মানায়। কেমন একটা আদর্শবান যুবকের মত লাগে।

সে গাড়িতে উঠে সোজা দীপুদের বাড়ি এসে জলখাবার খেল। খাবার সময় দীপু পাশে বসেছিল। এত সকালে হয়ত দীপুর ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস নয়। দীপুর চোখ মুখ দেখে এমন মনে হল! দীপুর কেবল হাই উঠছে। রাতে ভাল ঘুম না হলে যা হয়। বোধ হয় খুব সকালে উঠতে হবে বলেই রাতে ঘুমোতে পারেনি। তারপর মনে হল এটা কেন হবে। দীপুর কত লোকজন, ওকে ডেকে দেবার লোকের অভাব নেই। দীপু কি তবে ওর মামাবাবুকে ফেস্ করবে বলে ভয়ে অথবা চিন্তায় ঘুমায়নি।

সুবলের চেহারা দেখে দীপু কেমন অবাক হয়ে গেছে। এমন পোশাকে সে কখনও দেখেনি সুবলদাকে। অনেকটা সিনেমাতে দেখা হিরোদের মত। আর তা

ছাড়া চোখে কি যে আছে সুবলদার। কেমন সরল সহজ মানুষ। কলকাতায় এসে এতটুকু বদলায়নি। সে সুবলের মুখ দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। এমন মানুষ পাশে বসে থাকলে কি যেন এক কোমল উদাসী জীবনের ছবি সারা মন জুড়ে বসে।

সুবল সহসা চোখ তুলে তাকাতেই দেখল দীপু চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। চুরি করে এতক্ষণ তবে দীপু ওকে দেখছিল। ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পাচ্ছে। সুবল নিজেও কেন জানি আর সোজা দীপুর মুখের দিকে তাকাতে পারল না। সে যেন খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে এমনভাবে বলল, দীপু তুমি যা বলবে, আমি তাই করব। তুমি আমার এ কাজটা উদ্ধার করে দাও দীপু।

দীপু বলল, তুমি বিশ্বাস কর, আমি কোন ত্রুটি রাখব না এ কাজে।

—শুনেছি তোমার মামাবাবু তোমাকে খুব সমীহ করেন।

—স্বার্থে সবাই করে সুবলদা। তোমাকে আগেও বলেছি, এখন আবার বলছি, পরিবারের সব কথা জানতে চেও না। জানলে দুঃখ পাবে কেবল। তোমার দীপু কি না করতে পারে তুমি জান না।

—আমি সব জানি, বুঝি। সংসারে সব কিছুই ফলাও করে বললেই মানে বোঝা যায়, না হলে বোঝা যায় না, ঠিক না। আমি তোমাদের বাড়ি প্রথম দিন এসেই সব ধরতে পেরেছি। আমাকে আর কিছু বলতে হবে না।

তারপর দীপু বলল, তুমি এত সকালে গিয়ে ওদের পাবে কি করে ভাবলে।

—কেন, ওরা কোথায় যায়।

—ওদের উঠতে আটটা-নটা বাজে। বরং আমরা একটু ঘুরে ওদের ওখানে যাব।

—যদি তিনি বের হয়ে যান।

—বলে রেখেছি, নটায় যাচ্ছি। খুব জরুরি কাজ। বিয়ের ব্যাপারে—ইচ্ছা করেই লুকিয়ে গেছি।

—বলে রাখলে ভাল হত।

—ভাল হত না। ওরা পরামর্শ করার বেশি সময় পাবে। আমার মামীমাটি হচ্ছেন একটি নাপিতের মেয়ে।

—যা, কি যা তা বলছ!

—ভীষণ ধূর্ত। মামাবাবুকে বুঝিয়ে বললে বুঝবেন। কিন্তু মামীমা যদি আগে কোন পরমর্শ দিয়ে দেন তবে তা থেকে এক চুলও নড়বেন না।

—তুমি কিভাবে এগোবে।

—সে দেখা যাবে। আমি আসছি। বলে, দীপু পোশাক পাল্টাতে বোধ হয় চলে গেল।

কাকীমা মাঝে একবার এসে শুধু বললেন, কি সব শুনছি।

—কী বলব, বলুন!

—এখন এ-জন্য কি বিয়ে আটকে থাকতে পারে। যত সব উড়ো চিঠির ঝামেলা। কাকীমা এখন ধোয়া তুলসীপাতা সেজে গেছেন। সুবলের কেন জানি মনে হচ্ছিল, কাকীমার এ-ব্যাপারে একটা হাত আছে। দেশ-বাড়িতে কাকীমা সম্পর্কে ওর খুব ভাল ধারণা ছিল না। দীপুকে বড়বাবুর সংসারে পাঠাবার জন্য একটা জাল ফেলেছিলেন—সেটা অবশ্য মার কথা। দীপুকে সময়ে অসময়ে বড়বাবুর সেবা-যত্নে পাঠিয়ে মন ভেজাতে চেয়েছিলেন। এখানে আসার পর, একটা খোঁজখবর পর্যন্ত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ এখন দীপুরা ওদের নাগালের বাইরে। এবং এই যে সুবল কথায় কথায় এসে হাজির হচ্ছে এটাও বোধ হয় পছন্দ নয়। কিন্তু দীপুর কাছে সবাই বাঁধা বলে খুব একটা অবহেলা দেখাতে পারে না বুঝি। সুবল বলল, আজ যাচ্ছি আবার।

—যাও, গিয়ে দ্যাখো, কিছু হয় কিনা।

এবং দীপু এলে সুবল দীপুকে নিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে থাকল। বড় বড় আয়নায় ওদের প্রতিবিম্ব পড়লে কেমন দেখায় দীপুর দেখার বাসনা। একবার আয়নায় ওদের দুজনেরই চোখে চোখ পড়ে গেল। দীপুর শরীরটা কেমন কেঁপে উঠল। এবং খুব অসহায় ভাবল নিজেকে। যেন এই একমাত্র মানুষ আছে যে তাকে রক্ষা করতে পারে।

দীপু মামাবাবুকে রাজি করিয়ে ফেরার পথে বলল, এবারে বল আমায় তুমি কি দেবে?

—বলেছি তো যা চাইবে।

—আমি জানি, কথাটা বললে সেই নাটক-নভেলের মত শোনাবে। তবু বলছি, কারণ এভাবে না বললে তুমি আমার অসহায়তার কথা ঠিক বুঝতে পারবে না।

সুবল বলল, দীপু, কখনও কখনও মানুষকে নাটক-নভেলের মত কথা বলতে হয়। না বললে, সে মানুষ থাকে না, মানুষের আবেগ ধরা পড়ে না। আবেগ না থাকলে আমরা ঠিক ভালবাসার গুরুত্ব দিতে পারি না। না পারলে যন্ত্রের সামিল হয়ে যেতে হয় দীপু।

দীপু অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আমার সব পাপ সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে মুছিয়ে দাও তবে।

দীপু কেন যে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, কেন যে ওর দিকে তাকাতে পারছে না, সে বুঝতে পারছে না। মনে হল দীপু কাঁদছে। দীপুর ভিতরটা কোথাও ভেঙে যাচ্ছিল। সুখের আস্বাদে ওর চোখ ভার হয়ে এসেছে। সে বলল, দীপু আমি

সামান্য মানুষ। এত বড় পুণ্য কি করেছি, না করতে পারব?

দীপু বলল, আমি কথা রেখেছি, এবার তোমার পালা। বলে দীপু যেমন মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল, তেমনি রাখল। শহরের ইট কাঠ ফেলে কোন দূরবর্তী জলাশয়ের ছবি কেবল চোখের ওপর ভেসে উঠছে। তার প্রিয়জন এই মানুষ সে জানে, দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়ছে। দীপু সেখানে কিছুতেই আজ আলো জ্বালতে পারল না।

সুবল গাড়ি থেকে নামার সময় বলল, কথা দিলাম। সিঁথিতে সিঁদুর দিলে সব পাপ যদি তোমার মুছে যায় তবে দেব। আমি কথা দিলাম দীপু। আজ তোমার সঙ্গে আমি নাটক-নভেলের মতোই কথা বললাম।

দীপু সুবলের হাত টেনে নিজের মাথায় রাখল।—সুবলদা আমি বড় অসহায়। তুমি পাশে থাকলে আমি সাঁতরে নদী পার হতে পারি। দীপু আর কোন কথা বলতে পারল না। ওর কথা যেন সহসা সব ফুরিয়ে গেল। সে কেমন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাঠের ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটতে দেখল। তারপর সব ছায়া ছায়া হয়ে গেল। বৃষ্টি এল আকাশ ভরে। বৃষ্টির জলে ভিজে দুজনে গাড়ি বারান্দায় উঠে এল।

সুবল সোজা চলে এল আনন্দদার বাড়ি। সে দীপুকে নামিয়ে দিয়ে একমুহূর্ত দেরি করেনি। সে ড্রাইভারকে বলছিল, একটু তাড়াতাড়ি আমার পৌঁছানো দরকার। সে এই প্রথম নিজে দীপুকে গাড়িটার কথা বলেছিল,—দীপু তোমার গাড়িটা আজ আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। কাল একটা দিন আছে। কালকে বিয়ে। একদিনে এদিক-ওদিকে কিছু হবে না।

দীপু বলেছিল, একবার যখন মামাবাবু রাজি হয়ে গেছেন তখন একটু দেরি হলেও ক্ষতি ছিল না।

—আত্মীয় স্বজনদের খবর দেবার একটা ব্যাপার আছে।

—ওর জন্য কিছু আটকাবে না। বাড়ি গিয়ে দেখব, মা সব এতক্ষণে জেনে গেছেন। বিয়ের সব আচার একেবারে টু দি পাই সেরে ফেলেছেন।

অর্থাৎ দীপু বলতে চাইল, কিছুই আটকাবে না। এখন তুমি ওদিকটা সামলাও। আমার ওপর এদিকটার ভার যখন আছে তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। বিয়ের দিন-ক্ষণ পাল্টে আর লোক হাসানোর কি দরকার।

—কিন্তু মেসোমশাইর শেষ কাজ। অন্তত দধিমঙ্গলটা না করতে পারলে—

—তুমি খুব সেকেলে থেকে গেছ সুবলদা। এ-সব আচার আচরণ না হলে চণ্ডীপাঠ অশুদ্ধ হয়ে যায় না।

—কিন্তু কি জান দীপু, সারাজীবনের জন্য একটা ব্যাপার। আমাদের জীবনে

সাধারণত এটাতো দুবার ঘটে না। মেয়েদের বেলায় আরও কম।

দীপুর মনে হল, সত্যি ; তার আজেবাজে তর্ক করার স্বভাব হয়ে গেছে। সুবলদার কাছে তার স্মার্ট হয়ে কি লাভ। বরং মানুষটা সাধাসিধে ব্যাপারটাকে পছন্দ করে বেশি। সে বলল, তুমি যা ভাল বুঝবে করবে সুবলদা। এতে আমার অমত থাকার কথা নয়।

সুবল প্রায় ছুটে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল। —আনন্দদা, আনন্দদা কোথায়?

বৌদি সুবলকে জানে, সে হয়ত সবার সামনেই সব বলতে শুরু করবে। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে সুবলের গলা পেয়েই বের হয়ে এল। সব সময় কান খাড়া করে রেখেছে, কখন সুবল আসে। সব সময় ফোনের কাছে থেকেছে আনন্দ, কখন ফোনটা বেজে ওঠে।

সুবল ঘরে ঢুকে দেখল, আনন্দদা চাদর গায়ে শুয়ে আছেন। সুবলকে দেখেই ধড়ফড় করে উঠে বসলেন।

—কি হল সুবল।

—হবে।

—বিয়ে হবে!

—আজই।

—আজ, কাল যেদিন খুশি।

—পাত্রের বাবা তোমাকে কোন অপমান করেনি ত?

—না না। খুব সজ্জন। খুব ভাল ব্যবহার। দীপুই করে দিল। দীপু না থাকলে এটা হত না।

ইতু ও-পাশের ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিল সব। —দীপুই সব, দীপু না থাকলে এটা হত না।

দীপুই সব, দীপু না থাকলে এটা হত না! সারাক্ষণ কথাটা ইতুর মাথায় ভাঙা রেকর্ডের মত বাজতে থাকল। সে যেখানে যাচ্ছে, সেই কথাটা ওর মাথার ভিতর কখনও কানের ভিতর বাজছে, দীপুই সব, দীপু না থাকলে এটা হত না।

আর কি, আর কি বলেছে সুবলদা! তোমার দীপু আমার জন্য আর কি উপকার করেছে।

তখনও সুবল বলে যাচ্ছিল, দীপুকে নিয়ে গেলাম ওর মামাবাবুর কাছে। দীপুকে দেখলাম তিনি খুব সমীহ করেন। দীপুর কথাবার্তার কাছে মামাবাবু টিকতে পারলেন না।

—কি বলল দীপু!

—এই আমাকে নিয়ে ইতুকে নিয়ে কথাটা তিনি অন্যভাবে বলতে চাইলেন।

ইতু পাশের ঘরে থেকে চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল যেন, সেটা যে মিথ্যা

নয় তার প্রমাণ তোমার কাছে কি আছে সুবলদা? সুবলদা তুমি কি! তুমি নিজের ভাগটা চেয়ে নিয়ে খেতে জান না। তোমাকে নিয়ে আমার কি হবে! তোমার লজ্জা করছে না। এসব কথা আবার এখানে বলছ!

—তা দীপুতো খুব স্পষ্ট কথাবার্তা বলে, সে বলল, বিয়ের আগে এমন সবারই হামেশা ঘটে থাকে। কার থাকে না বলুন। আমাদের পরিবারে, আপনাদের পরিবারে কার ছিল না বলুন। বিয়ে হয়ে গেলে কিছুই আর থাকে না। আর এখানে যে মানুষটি সম্পর্কে আপনাদের সন্দেহ, তাঁকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি। জানি বলেই ব্যাপারটা এত রিডিকুলাস। এ প্রসঙ্গে কথা বাড়িয়ে তাঁকে আর ছোট করতে চাই না।

রিডিকুলাস! ইতু ভাবল, রিডিকুলাস কি! আমার সঙ্গে সুবলদার প্রেম ভালবাসা রিডিকুলাস হতে যাবে কেন! সুবলদা আমাকে ভালবাসতে পারে না দীপু! দীপু তুমি ভাবছ সুবলদা এত উঁচুতে যে সামান্য ইতুকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করার মত সময় তার নেই! কিন্তু দীপু তুমি জান না মানুষটাকে। তুমি যা জানো, তার চেয়ে আমি অনেকগুণ বেশি জানি। ইতু এখন সুবলের ওপর রাগ করে ফষ্টিনষ্টি কথাটাই ব্যবহার করতে চাইল। অবশ্য ইতু জানে সুবল সম্পর্কে এসব কথা ঠিক খাটে না। সে ভিতরে জ্বালা বোধ করছে। ঠিক জ্বালা না, কি যে হচ্ছে ভিতরে। যেন সে এখন সুবলদাকে সামনে পেলে আঁচড়ে খাঁমচে ওকে পাগল করে দেবে। কিন্তু ইতুর যা হয়, রেগে গেলে কেবল কান্না পায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এত যে বলছ তুমি, তোমার কিছু হচ্ছে না! তুমি পাষাণ! না, তুমি ঠিক পাষাণ নও, তুমি আমাকে শাস্তি দিয়ে সুখ পাচ্ছ।

বস্তুত যখন এ-বাড়িতে একটা হৈচৈ এবং বিয়ে হবে, সব আবার ঠিকঠাক করা হচ্ছে, ম্যারাপ বাঁধা হচ্ছে, আনন্দদা ছুটোছুটি করছেন, সুবল তখন ছাদে উঠে গেছে। সে শুধু বাজি পোড়াবে বলছিল। সে টুকুনকে নিয়ে ওপরে উঠে গেছে। এবং সে তার জায়গা ঠিক করে নিচ্ছে। পাশে ছোট্ট মত একটা ম্যারাপ। সেখানে কাঠের বড় বাক্সে নানা রকমের তুবড়ি এবং হাউই। নিচে তুবড়ি ফাটানো হবে। ছাদের ওপর থেকে হাউই। সে কেবল হাউই ছাড়বে আকাশে। সে নিজেই জল ছিটিয়ে ছাদ পরিষ্কার করে নিচ্ছে। সে একজনকে কেবল তার সঙ্গী নিয়েছে। সে টুকুন। সারাদিনে একবারও সে ইতুকে দেখেনি। ইতুকে নিয়ে নিচে সবাই ব্যস্ত। খুব একবার ইচ্ছে হয়েছিল, সে ইতুকে দেখে আসে। কিন্তু কেন জানি সাহসে কুলায়নি। যেন সে গেলেই অথবা সুবলের মুখ দেখলে ইতু ভেঙে পড়বে। ইতু, না সে নিজে ঠিক বুঝতে পারছে না

সে বলল, টুকুন, তোর পিসি এখন কি করছে বলত।

টুকুনের হাতে মগ। মগে জল। সে একটু একটু জল দিয়ে সাহায্য করছে সুবল কাকাকে। তাকে এখানে নিয়ে আসা বৌদির জন্য। না হলে টুকুন বৌদিকে জ্বালাবে। বৌদির এখন অনেক কাজ। সে টুকুনকে নিয়ে এই ছাদের ওপর একটা সাম্রাজ্য তৈরি করে ফেলছে। যত কথা এখন তার টুকুনের সঙ্গে। যত কাজ এবং পরামর্শ টুকুনের সঙ্গে।

সে বলল, কি বলতে পারলি না?

টুকুন কাকুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। বলল, পিসি, পিসি?

—হ্যাঁ, পিসি।

—পিসি বসে কাঁদছে।

—যাঃ কাঁদবে কেন?

—কাঁদবে না। আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, কাঁদবে না!

সুবল বলল, মেয়েরা পেছন ফিরে কাঁদে না! মেয়েরা সামনের দিকে তাকিয়ে কাঁদে। সুবলের এই স্বভাব। যা সে ইতুকে সামনে পেলে বলতে পারত, টুকুনকে কাছে পেয়ে তাই বলছে। ইতু কাছে এলে সে কিছুই বলতে পারত না। হয়ত খুব বললে, তুমি এখানে কেন ইতু। নিচে যাও। এখন বেশি ওপর নীচে করতে নেই। ভালয় ভালয় আমাদের কাজ সারতে দাও।

সব সময় এটা আছে সুবলের—কিছুটা মাতব্বর মানুষের মত কথা বলা। সে ইতুকে নিয়ে যেন সারাটা জীবন এভাবে কাটিয়েছে। আজও ইতুকে দেখলে হয়ত এমনই বলবে। সুতরাং যাতে ইতুর সঙ্গে ওর দেখা না হয়, সন্ধ্যার আগেই সে ছাদে উঠে এসেছে। যখন সদরে সানাই বাজাতে শুরু করবে ফের, সে এক দুই করে হাউই পোড়াবে।

সূর্যাস্ত গেলে এবং সদরে সানাই বাজতে থাকলে, সুবল বাজি পোড়াতে থাকল। অতিথি অভ্যাগতেরা এসেছেন। আসছেন। কমলেশ, নির্মল এবং আনন্দদার অন্য ভক্তজনেরা ভিন্ন ভিন্ন দিক সামলাচ্ছে। সুবল সামলাচ্ছে বাজি পোড়ানোর দিকটা। বাড়ির ছেলেপুলেরা সুবলকে ঘিরে রেখেছে। সে হাউই পোড়াচ্ছে। একটা হাউই অনেক উঁচুতে উঠে লিখে ফেলল, শুভ বিবাহ। পরেরটা লিখল—শ্রীমতী ইতুর সঙ্গে অমলের শুভ বিবাহ।

এমনি হাজার লক্ষ নক্ষত্রের মত হাউই আকাশে উঠে কখনও ময়ূরের ছবি কখনও প্রতিমার ছবি এঁকে দিল। অথবা কখনও মনে হচ্ছে সমস্ত আকাশ ভরে নীলবসনা এক পরী গগনভেরী পাখির মত উড়ছে।

নিচের জানলায় তখন সেই মেয়েটির মুখ।

ইতু চুপচাপ দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে আকাশে সেই সব লেখা পড়ে কেমন কুঁকড়ে যাচ্ছে। শরীরে বিছুটি দিলে যেমন হয়, জ্বালা, ভীষণ জ্বালা,

অপমান—এমন এক মানুষের সঙ্গে তার অপমান জড়িয়ে দিয়েছে—সে ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে! সে জানালায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছিল। সুবলদা তুমি কি! তোমার কি এতটুকু ইজ্জত বলতে কিছু নেই! এ-দিনে তুমি ছাদে উঠে বাজি পোড়াচ্ছ। তোমার দুঃখ বলে কোন বস্তু নেই! তুমি কি আমাকে বুঝতে দিতে চাও না, তুমি ভিতরে ভিতরে মরে যাচ্ছ! এ-কথা কি তুমি বাজি পুড়িয়ে আকাশে লিখে রাখতে চাও!

সে একটু থেমে চোখ মুছে নিল। কেউ দেখে ফেলতে পারে। সবাই যাওয়া আসা করছে। ওকে সাজাবার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে অন্য ঘরে। সে আকাশে নানা রঙের বাজি পুড়তে দেখে কেমন পাথর হয়ে যাচ্ছে।—সুবলদা, ওরা কি বলেছে জানো! ওরা তোমাকে কেন্দ্র করে কি অপমানকর কথা বলেছে জানো? দাদার গলায় কাঁটা ফুটেছে বলে দাদা সব হজম করে গেছে—কিন্তু আমি? আমার গলায় কিসের কাঁটা! ওদের করুণা ভিক্ষা! ওদের দয়া! এমন কি যেন এই মেয়ে যার চরিত্রে কলঙ্ক আছে তাকে ঘরে তুলে নাও—তারপর দেখা যাবে! তুমি কি ভাবো সুবলদা, তুমি আমাকে পার করে দিতে পারলেই রক্ষা পাও। আমার জন্য তুমি ভিক্ষার পাত্র হাতে করে গেছিলে! আমি কিছু ভাবতে পারছি না। চিৎকার করে কেবল কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। অথচ কি আশ্চর্য চোখ ফেটে জল আসছে কিন্তু গলা ফাটিয়ে কাঁদতে পারছি না। সবাই মিলে তোমরা আমাকে করুণা করছ।

ক্রমে এক একটা ভাবনা আসছে আবার হাউইর মত খানিকক্ষণ জ্বলেই নিঃশেষে মুছে যাচ্ছে। তখন সেই অদৃশ্য আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত একটা হাউই রাজ-সিংহাসন এঁকে দিল। বর-বধূ বসে। সে হাউই সামান্য সময় আকাশে ওদের রাজা-রানীর সম্মান দিয়ে নিভে গেল।

আর তখনই জানালা বন্ধ করে দিল ইতু। আর এ-সব দেখতে পারছে না। তাকে আর কেউ অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছে না। এ-ঘরেই সব বান্ধবীরা হাজির। ওকে ওরা সাজাতে এসেছে। কেউ বুঝি একটা নির্মল পাটি পেতে দিল। ওপরে মখমলের সুজনি। ওর গায়ে চন্দনের গন্ধ। মুখে নানারকমের প্রসাধন। এবং দামী জড়োয়া সেট। এক এক করে পরিয়ে দিচ্ছে এবং ইতু সাপের মত স্পর্শে আঁৎকে উঠছে।

ঘামে মুখের প্রসাধন গলে যাচ্ছিল ইতুর। কপালে চন্দনের ফোঁটা ভিজে গেছে। বান্ধবীদের চিৎকার চেঁচামেচিতে সে কেমন পাগলের মত হয়ে যাচ্ছে। রিডিকুলাস! বার বার ভাঙা রেকর্ডের মত দীপুর কথা কানের কাছে বেজে চলেছে। ইতু ক্রমে ভিতরে ভিতরে ক্ষোভে দুঃখে কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ভিতরে ভিতরে সে সবার প্রতি প্রতিশোধের স্পৃহাতে বিশেষ করে সেই মানুষের

অহঙ্কার, অমলের বাবার অহঙ্কার ভেঙে দেবার জন্য মনে মনে উচ্চারণ করল, আমিও প্রতিশোধ নিতে জানি। সে বলল, আমি একটু বাথরুমে যাব চন্দনা।

ইতু বাথরুমের নাম করে বের হয়ে এল। যেন তার ইচ্ছা এখন ছাদে যাবে। সেই মানুষটাকে খুঁজে বের করবে। বেহায়ার মত ছাদে বাজি পোড়ানো হচ্ছে। —তুমি এখানে বাজি পোড়াবার কে হে! তুমি যাও, বলছি যাও। আমার ফাঁসি কাঠের সামনে তোমাকে ধূপধুনো দিতে হবে না।

বাইরে এসে সেই প্রতিশোধের স্পৃহা অথবা বলা যায় মনের যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা, সব তাকে কেমন পাগল করে দিচ্ছে। কোথায় কিভাবে গেলে যে এ-বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে—কোথায় এখন কে আছে, ওকে পালিয়ে নেমে যেতে হবে। অথচ বাড়ির পেছনটা কেমন সে জানে না। আর কিনা তখনই আলো নিভে গেল। সট সারকিট হয়ে যত গোলমাল। এবং এই ফাঁকে এক যুবতী কোথাও পালাচ্ছে।

সব বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেলে যা হয়, সবার তখন ছোটাছুটি। মোমবাতি জ্বালানো হল। ইতু ফিরে এলে সব হবে—বান্ধবীরা মোমবাতির আলোতে সব বসে বসে ঠিকঠাক করছে, কিন্তু ইতু আসছে না। বাড়ি অন্ধকার। আলো জ্বালাবার জন্য ছোটাছুটি হচ্ছে। সদরে বর এসেছে তখন। শঙ্খ বাজাতে হয়। কে কার তখন শঙ্খ বাজাবে। শুধু সানাই বাজছিল। ভাঙা স্বরে কাঁসর বাজছে আর থেকে থেকে এক পাখি করুণ স্বরে ডেকে চলেছে।

কনের সাজে ইতু মাঠের ওপর দিয়ে ছুটছে। কোথায় ছুটছে কেউ জানে না। পাগলের মত ছুটছে, ওর মনে হচ্ছিল সবাই মিলে ওকে ধরার জন্য ছুটছে। সুবলদা এবং অমল সবাইকে নিয়ে পেছনে দৌড়ে আসছে ওকে ধরার জন্য। দাদা পেছনে পড়ে যাচ্ছেন, কিছুতেই সবার সঙ্গে সমানভাবে ছুটতে পারছেন না।

অন্ধকারে ইতু সেই এক অঞ্চলে, যেখানে এখনও শহর তেমন জমে ওঠেনি, যেখানে আলো তেমন রাস্তায় নেই এবং মাঠ পার হলে একটা রেল-লাইন পড়বে এবং তারপরই কিছুদূর হেঁটে গেলে সেই বাড়িটা। রেল-লাইনের ধারে গভীর নীশিথে সে ট্যাকসির জন্য দাঁড়িয়ে থাকল।

আলো জ্বললে সবাই দেখল ঘর ফাঁকা। বৌদি, দাদার মুখ শুকিয়ে গেল। ইতু বাথরুমে নেই। কোথায় ইতু? ইতু নেই। দক্ষিণের ঘরে, উত্তরের ঘরগুলোতে এবং নিচে কোথাও নেই। সুবলের কাছে যদি যায়, ছাদে। না, সে সেখানেও যায়নি। হাঁটু মুড়ে আনন্দদা বসে পড়লেন। সুবল পাশে বসে থাকল। এখন ইতুকে সে কাছে পেলে সত্যি গালে একটা চড় বসিয়ে দিত। সবার মাথা নিচু করে দিয়ে এটা কি করল ইতু! কি লাভ হল ইতুর। কিন্তু এ-ভাবে বসেও থাকা যায় না। থানা পুলিশ কি বিশ্রী ব্যাপার—সুবলের মাথা ঠিক থাকছে না। দীপু এসে

হাজির। সে শুনে হাঁ। সবাই এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে।

এমনকি আনন্দদা হাতজোড় করে সবার কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারলেন না। ক্রমে রাত গভীর হতে থাকল।

*   *   *

সুবল ধীরে ধীরে বড় বাড়িটা থেকে বের হয়ে এল। মাঠে অন্ধকার। একটা সরু মত রাস্তা তাকে পার হতে হচ্ছে। সে যেন নিজের ছায়াকেও এখন বিশ্বাস করতে পারছে না। সেও পালাচ্ছিল যেন। যার জন্য এত উঁচু গলায় বলা, যার চরিত্রের অহঙ্কারে ওর মাথা উঁচু ছিল, সে সবাইকে অপমানের দড়ি গলায় ঝুলিয়ে চলে গেল। কোথায় গেল মেয়েটা? পুলিশ এবং আত্মহত্যার ছবি চোখে ভেসে উঠল ওর।

সে আর দাঁড়াতে পারছিল না। সে কোনরকমে নিজের বাড়িতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। আর না। অনেক শিক্ষা হয়েছে। হতচ্ছাড়া এই মেয়ে সারা মাস কাল বৎসর ধরে তাকে জব্দ করে এসেছে। এবং শেষে এতবড় অপমান মাথায় ঢেলে দিয়ে ভেগে পড়ল। একবার ইতুর হোস্টেলে খবর নেবে কিনা ভাবল। ওর কোনো বান্ধবীর বাড়িতে গেলে হয়। কিন্তু শরীর এ কদিনের পরিশ্রমে আর চলছে না। সে যথার্থই ক্লিষ্ট এবং অবসন্ন।

সে ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির দিকে হেঁটে আসার সময় ভাবল, যাক্ সব সম্পর্ক ত্যাগ করা গেল। ভেবে বাড়ি ঢুকতেই মা বললেন, কি অলুক্ষণে ব্যাপার দ্যাখ!

সে আর দাঁড়াল না। মা কি বলছেন তার শোনার আদৌ কোন আগ্রহ নেই। সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে এখন শুয়ে পড়বে। চোখে মুখে সে অন্ধকার দেখছিল।

মা ফের বললেন, কি অলুক্ষণে ব্যাপার দ্যাখ। ইতু তোর ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

মনে হল সুবলের সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে—কি, কি বললে মা?

—কি আর বলব। কখন থেকে ডাকছি দরজা খুলছে না।

—শেষ পর্যন্ত আমার বাড়িতে এসে আপদ আমাকে জ্বালাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে ফোন করল—আনন্দদা, ইতু আমাদের বাড়িতে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সে দরজা খুলছে না।

সে দীপুকে ফোন করল, ইতু আমাদের বাড়িতে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সে দরজা খুলছে না।

সে এবার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ডাকল, ইতু দরজা খোল। তুমি আমাকে আর কত জব্দ করবে।

কোন শব্দ নেই ভিতরে।

—ইতু, দরজা না খুললে পুলিশ ডাকতে হবে। দরজা আমি ভেঙে ফেলব।

মা বললেন, কি যে হবে না!

ইলু বিলু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে কি হচ্ছে কে জানে!

সুবল বলল, কি আপদ বলতো মা!

মা বললেন, মেয়েটা তোর আসকারাতে এমন হয়েছে।

সুবলের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হল, তোমরা সবাই মিলে এটা কি বলছ, আমি ওকে কখন আসকারা দিলাম। ওর ভালোর জন্য মা এত কিছু করেছি, ওকে কখনও ছোট হতে দিইনি, মা মা তোমরা এসব কি বলছ...কিন্তু সে কিছুতেই কখনও নিজের কথাটা বলতে পারে না, লাজুক ম্রিয়মান এক মানুষ সে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে আবার জোরে জোরে ডাকল, ইতু, ছিঃ লোকে কি বলবে!

একে একে সবাই হাজির। বাড়িটা লোকে ভরে গেল। ইতু দরজা খুলছে না। এবার সুবল পেছনের জানালাতে চলে গেল। দেখল জানলাটা খোলা। ভিতরে মৃদু নীল আলো জ্বলছে। ইতু হাঁটু মুড়ে সুবলের বিছানায় শুয়ে আছে। বোধহয় দীর্ঘদিনের এক ইচ্ছা যাকে লালন করে সন্তান-স্নেহে বড় করে তুলেছে। এখন এই মুহূর্তে সব মান-অপমানের ভয় পরিত্যাগ করে সেই ইচ্ছার প্রকাশে সব গ্লানি ধুয়ে যাচ্ছে জীবনের। নিশ্চিন্ত এক আশ্রয়ে এসে ইতু আপন মহিমায় সব করুণা অথবা অপমানের কথা ভুলে বুঝি বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে। দীপু জানালা থেকে সরে এল। সুবলকে হাত ধরে টেনে আনল। আনন্দদার দিকে তাকিয়ে বলল, আর চেঁচামেচি করে দরকার নেই আনন্দদা। এখানে ওকে থাকতে দিন।

সুবলকে ডেকে বলল দীপু, যাও আজ আর নিজের ঘরে তোমার রাত্রিবাস হল না। ইতু নিজের জোরে তা দখল করে নিয়েছে। এখন তুমি দরজায় বিছানা পেতে শুয়ে থাক। ভোর হলে যেন সে দরজা খুলে তোমার মুখ দেখতে পায়। আমরা তারপর ইতুকে স্বয়ম্বর সভায় নিয়ে যাব। দরজা খুলে প্রথমে সে তোমার মুখ দেখেছে বলে, মালা তোমাকেই দিতে হবে। বলে হাসতে গিয়ে দু চোখ ভরে জল এল তার। তারপর দীপু আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। গাড়ির হেড-লাইট জ্বলতে দেখা গেল। অন্ধকারে দীপুর গাড়িটা নিশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে—এবং একটা বাজনা সেই থেকে বাজছে, থেকে থেকে বাজছে—আর গান। কেউ যেন ক্লেরিওনেট বাজিয়ে দীর্ঘ উটের মত মুখটি তুলে গাইছে—তখন... হে...ম...ন্ত.. কা...ল।

●

রোদ্দুরে জ্যোৎস্নায়

—আর কতদূর বাবা?

—ঐ তো দেখছ, দূরে গরিপরদির মঠ। দ্যাখো মঠের চুড়ো দেখা যাচ্ছে।

—কয় বাবা?

—দেখছ না, দ্যাখো, আকাশের নীচে ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে তাকাও, দেখতে পাচ্ছ?

অনল বাবার পাশে পাশে হাঁটছে। সে নানাভাবে চেষ্টা করেও দেখতে পাচ্ছে না। বাবা হয়তো তাকে আড়াল করে রেখেছে। সে লাফিয়ে দু-পা সামনে এগিয়ে গেল। দেখল, মাথা তুলে দেখল, মাঠের শেষে, অনেক দূরে গাছগাছালির ভেতর থেকে ইস্পাতের চক্র জ্বলজ্বল করছে। প্রায় আকাশে ঝুলে থাকার মতো, এবং বাবা এখন কী বলবে সে জানে। তারপর নীল, ছোট্ট খাড়ি নদী, বাঁশের সাঁকো পার হয়ে যাব। বড় একটা দরগা দেখতে পাবে কিছু দূরে গেলে। সোজা সড়কে উঠে গেলে বেশি দূর আর হাঁটতে হবে না। অলিপুরা পার হয়ে গেলে মাইলখানেকের মতো পথ। সূর্য মাথার ওপর উঠে যাবে তখন। রোদে হাঁটতে পারবে না। কষ্ট হবে। পা চালিয়ে হাঁটো।

অনল এতক্ষণ খুব পা চালিয়ে হেঁটেছে। সকাল থেকে ভেবেছে বাবার মনে কোনো কষ্ট দেবে না। বাবা যা বলবে তাই সে করবে। রাতে মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। মা হয়তো ভেবেছিল, অনল ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবাকে মা কত সব কষ্টের কথা বলেছে। কখনও কখনও রাগে অভিমানে খারাপ কথা পর্যন্ত বলে ফেলেছে। তখন বাবার জন্য অনলের কষ্টটা আরও বেড়ে যায়। সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনতে পায়, তুমি বে-আককেল মানুষ, সারা-জীবন আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছ। কত বয়স ছেলেটার, তাকে রেখে আসছ পরের বাড়িতে। বাবা বুঝিয়েছে, পরের বাড়ি কোথায় দেখছ—অনল তো মামার বাড়িতে পড়তে যাচ্ছে। তোমার বাবা নেই, তাতে কি হয়েছে, তোমার ছোটকাকা তো বেঁচে আছেন।

সাগর বলল, তুমি ভাল হয়ে থেক নীল।

—আমি খুব ভাল হয়ে থাকব।

—মেজ-মামীর কথা শুনবে।

অনল মেজ-মামীকে দেখেনি। একটা রূপকথার মতো মেজমামী এবং তার মেয়ে পদ্ম। ওরা কলকাতার লোক। কলকাতায় থাকলে মানুষেরা রূপকথার মানুষ হয়ে যায় অনল টের পেত। কলকাতায় বোমা পড়ার ভয়ে মেজমামীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মেজমামা। বড়দা, পদ্ম সবাই কলকাতা থেকে বছরখানেক আগে চলে এসেছে। এবং মার কাছে বাবা পদ্মর খুব প্রশংসা করেছে। কলকাতায় থাকলে সবাই বুঝি খুব ভালো হয়, সুন্দর হয়। একবার মা অনলকে নিয়ে যাবে বলেছিল, তারপর কী যে হয়ে যায় মা, কেমন গুম মেরে থেকেছিল কিছুদিন, আর যায়নি।

অনল বলল, বাবা তুমি আমাকে আবার কবে নিয়ে আসবে?

—গ্রীষ্মের ছুটিতে নিয়ে আসব। বড় গাছে তখন আম পাকবে। পুকুরে বেশি জল থাকবে না। কম জলে আমি তোমার জন্য মাছ ধরতে পারব।

আরও কত সব কথা, বারবার অনল বলতে চেয়েছে। সে আসার সময় মাকে কথা দিয়েছে, কোনো দুষ্টুমী করবে না। ভাল করে লেখাপড়া করবে। মেজমামীর কথা শুনবে।

অনলের হাতে ছোট্ট টিনের সুটকেস। পাশিংশোর বাক্‌সটা তার একমাত্র সম্পত্তি। বাবা নারানগঞ্জ শহর থেকে কিনে এনেছিল। ওতে অনলের বই খাতা পেন্সিল। বাবার হাতে বড় একটা পুঁটলি। ওতে ওর জামা-প্যান্ট। শীতের রং-ওঠা চাদর। বাবা বারবার টিনের বাক্‌সটা ওর হাত থেকে নিতে চেয়েছে—বারবার অনল বলেছে, আমি পারব বাবা।

ওরা এ-ভাবে কখনও পার হয়ে যায় মাঠের পর মাঠ। এবং বসন্তকাল বলে, মাঠে যব গমের খেত, সোনালি যবগাছ ওর প্রায় মাথার সমান। জমির আলে হাঁটলে সোনালি যবে ওর মাথা ঢেকে যাচ্ছে। তখন শুধু বাবার শরীর গাছের মাথার ওপর। রাস্তায় দু-একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে বাবা দাঁড়িয়ে কথা বলছে। কথা বলার সময় কেমন বিনয়ী এবং অপরাধীর মত মুখ বাবার—অনলকে ওর মামার বাড়িতে রেখে আসছি। কথাটা যেন না বলতে পারলেই বাবা খুশি হতেন। কিন্তু একটুখানি ছেলেকে নিয়ে বড়বাবু কোথায় যাচ্ছেন এমন বললে, অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বলা, যাচ্ছি ছেলেটাকে রেখে আসতে। বাড়িতে একদম পড়াশোনা করে না। অনল কাছে না থাকলে বাবা হয়তো এমনই বলতেন। কিন্তু অনল যেহেতু বাবা কথা বললে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সেজন্য বাবা আর বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে সাহস পায় না। সত্যি কথা বলে ফেলে বাবা। তখন অনলের কান্না পায় ভীষণ।

দরগার কাছে আসতেই সাগর বললে, আয় এখানে একটু বসি, তুই হাঁটতে

পারছিস না। কেবল পেছনে পড়ে থাকছিস।

বাবা প্রায় অনেক দূরে থেকে ডেকে ডেকে এমন কথা বলছিল। প্রায় তিন ক্রোশের মত পথ হেঁটে এসেছে—দু-বার গাছের নীচে ওরা জিরিয়ে নিয়েছে। এখানেও বেশ একটা সুন্দর জায়গা, লম্বা ইঁদারা। হিজিবিজি অক্ষরে কী সব লেখা। পাশটা সান বাঁধানো। চারপাশে কাঁফিলা গাছের বেড়া। মাঝখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে মসৃণ ঘাসের চত্বর। লোকজন নেই। দূরে একেবারে পশ্চিমে ছোট বেদীর মত কিছু এবং নতুন চুনকাম করা। বড় একটা বকুল গাছ পাশে। বকুল ফুল ছড়িয়ে আছে। তাজা বাসি এবং শুকনো বকুল ফুল। আর চারপাশে শুধু মাঠ, ফসলের খেত, দূরে সব গ্রাম। শান বাঁধানো চত্বরে একটা মাটির কলসি। গলায় দড়ি বাঁধা। যেন লেখা থাকে নামাজের সময় পার হয়ে যায় মানুষের। কারা এখানে রেখে দিয়েছে মাটির কলসিটা। জল তুলে নামাজ পড়ে নিতে পারে ধার্মিক মানুষেরা। জলে কোনো অস্পৃশ্যতা নেই। এবং সাগর জল তুলে হাত মুখ ধুয়ে নিল। অনলও জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে রোদের তাপ থেকে একটু ঠাণ্ডা হতে চাইল। এবং তখনই বুঝতে পারছে অনলের মুখ রোদে পুড়ে গেছে! মুখের ওপর রোদ, কতকাল থেকে অনল যেন বাবার সঙ্গে রোদে পুড়ে এভাবে হাঁটছে।

বাবা একসময় বলল, খিদে পেয়েছে। খেয়ে নে।

অনলের মনে পড়ল, মা মুড়ি পাটালি গুড় দিয়েছে, রাস্তায় খেয়ে নেবার জন্য। কখন তারা পৌঁছাবে কে জানে।

সাগর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে?

অনল মুখ না তুলেই বলল, না বাবা।

মাথার ওপর তখন গাছের ছায়া। টুপটাপ দুটো একটা সাদা ফুল ঝরছে। বসন্তের হাওয়া—বেশ ঠাণ্ডা, গত বছর দুর্ভিক্ষের বছর গেছে। এ-সব অঞ্চলে খুব মানুষ মারা গিয়েছিল, এবং কলেরার প্রকোপে, গাঁ সব উজাড় হয়ে গেছিল।

সাগর বলল, দেখি হাত।

অনল হাত মেলে দেখাল।

পাটালি গুড় দিল হাতে।—আর একটু নিবি?

অনল বলল, না বাবা।

সাগর বুঝতে পারে ছেলেটার ভেতর চাপা অভিমান ক-দিন থেকে কাজ করেছে। বেশি কথা বলছে না। দুঃসময় যে ভীষণ ছেলেটা বুঝতে পারছে। তবু সে আশা করতে পারেনি, মা ভাইবোনদের ছেড়ে তাকে কখনও দূরে চলে যেতে হবে।

সাগর বলল, ওখানে দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবি নীল। স্কুলে যেতে পারবি। কত বড় স্কুল। যদিও প্রায় ক্রোশখানেক দূরে স্কুল তবু বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল, এত কাছে স্কুল আর কোথায় আছে এমন।

মুড়ি দু-মুঠো খেয়েই অনল বলল, আর খাব না বাবা। ভাল লাগছে না।

শুকনো মুড়ি, পাটালি গুড় দিয়ে খেতে বেশ ভাল লাগে, অথচ অনল খাচ্ছে না। গলায় আটকে যাচ্ছে। সেই সকালে সূর্য উঠতে ওরা বের হয়েছে। ক্ষুধায় চোখমুখ কাতর অনলের। অথচ খাচ্ছে না। ছেলের দিকে ভালভাবে তাকাতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। কোনোরকমে বলল, লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। বিদ্যাসাগর মশাই কত ছোট বয়সে বাবার হাত ধরে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। এসব বলে বোধহয় সাগর সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করল। গরিব মানুষের জন্য বিদ্যাসাগর মশাই এমন একটা সম্বল রেখে গেছেন তবু। নয়তো ছেলের হাত ধরে খাঁ-খাঁ প্রান্তরে বসে অক্ষমতার জন্য চোখের জল না ফেলে তার বোধ হয় উপায় ছিল না।

অনল বাবার কথা ফেলতে পারে না। বুঝতে পারছে সে না-খেলে বাবাও আর খাবে না। ইঁদারা থেকে জল তুলে এনেছিল সাগর। সামান্য জল খেয়ে গলার শুকনো ভাবটা সে কাটিয়ে দিতে চাইল। অথচ অনল ভেবে পায় না এই গুড় আর মুড়ি বাড়িতে তার অমৃতের সমান ছিল। ভাগে কম পড়লে মার সঙ্গে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিত। ওর মনে হত ইচ্ছে করেই মা তাকে কম দেয়। মা আজ ক-দিন থেকে ওকে সবচেয়ে বেশি তোয়াজ করছে। ভাল খাবার হলেই ওর জন্য বেশি বেশি রেখে দিত। ওদের জন্য সব পাটালি পুঁটুলিতে মা বেঁধে দিয়েছে। মার দুঃখী মুখের কথা ভেবে কেন জানি আর বলতে পারছে না, আমার খেতে ভাল লাগছে না বাবা। আর খেতে পারছি না। খুব আগ্রহের সঙ্গে যেন খাচ্ছে, খেতে খেতে বাবার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। বাবা কিছুতে আর টের পাবে না তার খেতে কষ্ট হচ্ছে। জল সে খাচ্ছে মাঝে মাঝে। বাবার দিকে তার মুড়ি ঠেলে না দিয়ে চোখ গোল করে প্রায় সবটা খেয়ে ফেলল।

সাগর বুঝতে পারছিল তারও খুব হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। এতটা পথ সে অনেকবার হেঁটেছে। আজকের মতো এত ক্লান্তিকর কোনো রাস্তা আছে পৃথিবীতে তার জানা নেই। সে কেমন গাছের নীচে পুঁটুলি মাথায় খানিকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে থাকল। মাথার কাছে অনল বসে আছে। চুপচাপ। সূর্য মাথার ওপর উঠে গেছে। বাবার পেছনে সে প্রায় সবটা পথ দৌড়ে এসেছে। তবু কেন যে বাবার নাগাল পাচ্ছিল না। কেবল দেখেছে কিছুক্ষণ পরপর বাবার সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। সে দৌড়েও বাবাকে আর ছুঁতে পারছিল না।

দুই

রাতে পদ্মর ভাল ঘুম হয়নি। নীলদা আসছে। বাড়িতে সবার মুখ বিমর্ষ, কেবল ছোট দাদু তাকে গাছপালা এবং মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে নীলদা কেমন দুরন্ত হয়ে যায় তার কথা বলেছে। দাদুর কাছে সোনাপিসির গল্প, সোনাপিসেমশাইর গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত। তার পড়ার কথা মনে থাকত না। মা দাদুর মুখের ওপর কিছু এখনও বলতে পারে না। সে বুঝতে পারে ছোটদাদু সোনাপিসিকে ভীষণ ভালবাসে। আর মা যে কেমন সোনাপিসির কথা উঠলেই মুখ ভার করে থাকে। নীলদা আসছে, এখানে থাকবে শুনে মা মুখ ভার করে রেখেছে ক-দিন থেকে। মাকে সে আর আজকাল হাসতে দেখছে না। তার খারাপ লাগছিল নীলদার কথা ভেবে।

অন্যদিন রোদ না উঠলে তার ঘুম ভাঙে না। আজকে সে সবার আগে উঠে পড়েছে। এখানকার দিনগুলো কলকাতার মত নয়। একটা এঁদো গলিতে তাদের দু-কামরার বাসায়, কখনও রোদের মুখ দেখা যেত না। ভ্যাপসা গরম আর অন্ধকার। শীতের সময় হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে থাকত। সর্দি জ্বর লেগে থাকত তার।

এখানে এসে অনেক কাজ বেড়ে গেছে। যেমন ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি কুয়োর জলে হাত-মুখ ধোওয়া, ঠাকুর ঘর থেকে সাজি বের করে ফুল তোলা। ওর তখন আলাদা মনে হয় জীবনটা। অসুখে-বিসুখে একদম আর ভুগতে হয় না। ফুলের ভেতর সে আশ্চর্য সৌরভ পেয়ে গেছে বাঁচার। তারপর আবার নীলদা আসছে। নীলদাকে সে কখনও দেখেনি। নীলদা পড়াশোনায় ভীষণ ভালো। কম বয়সে বেশি লম্বা হয়ে গেছে। নীলদার মাথায় কোঁকড়ানো চুল। নীলদার ইজের ছেড়ে দেবার বয়স এবং তার থেকে দু-এক বছরের বড়। যদিও মা বলবেন, তোর চেয়ে ওর বয়স তিন বছরের ফারাক, মা সব সময় কেন যে ওর বয়েসটা কমিয়ে রাখে বুঝতে পারে না।

সে সকালে গাছে গাছে ফুল তুলেছে। যাকে দেখেছে, বলেছে, আজ নীলদা আসবে। সোনাপিসেমশাই আসবে। সকালে ছোটদাদু বাজারে গেছে—ভাল মাছ আসবে, যেমন বড় সোনালি পাবদা। সোনাপিসেমশাই সোনালি পাবদার ঝোল খেতে খুব ভালবাসেন।

পদ্ম ঝুমকোলতার গাছে উঠে গেল। সাজিতে ফুল সাজিয়ে রাখল। শ্বেতজবা, চন্দন ফুল, অপরাজিতা এবং এ-সময়টায় দুটো একটা টগর ফুটব ফুটব করছে, সে নুয়ে যখন বুঝল এখনও ফোটেনি, তখন দামাল মেয়ের মত দৌড়ে পুকুর পাড়ে চলে গেল। রাস্তাটা পুকুরের পাশ দিয়ে দত্তদের আমবাগান

পার হয়ে, সেনেদের অর্জুন গাছটার নীচে থেমেছে। কত রকমের সব পাখিদের বাস গাছে গাছে। আমের মুকুল আসছে, মৌমাছি উড়ছে, গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালেই সে তাদের গুঞ্জন শুনতে পায়। অবিরাম এক গুঞ্জন গাছে গাছে, গাছের নীচে, দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভীষণ ভাল লাগে। তখনই কে যে ডাকল, পদ্ম আয়। সে চারপাশে তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না। কেমন এক অপরিচিত মিষ্টি স্বর।

মা কুয়োতলায় জল তুলছে। পদ্ম তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে চলে গেল। পড়তে বসতে হবে। দাদার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। মা সকাল থেকেই শুরু করে দেয়, কিরে উঠবি না। কখন পড়তে বসবি। মার হয়ে দাদাকে ঠেলে ঠুলে তুলে দেওয়াও তার একটা কাজ সকালে। দাদাটা যে কি! সে ছুটে ঠাকুরঘরের পাশে চলে গেল। দরজা খুলে সাজিটা ভেতরে ঠেলে দিল। ঠুকঠুক করে দুবার মাথা ঠুকল চৌকাঠে। নিত্য সকালে সে এটা করে থাকে। ছোট দাদু তাকে এ-সব শিখিয়েছে। এবং এক দৌড়ে সে ঘরে ঢুকে ডাকল, এই দাদা ওঠ। তুই উঠবি না। কত বেলা হয়েছে! সে বালিস টেনে নিল। তবু উঠছে না। ঘর ঝাঁট দেবে, জল ছিটিয়ে দেবে, দাদা তবু উঠছে না। সকালে সুধন্য গোয়াল থেকে গরু-বাছুর বের করে ফেললেই, ফুলু পিসি গোবর বের করে নেবে। সারা উঠোনে এবং বাড়ির চারপাশে ফলু পিসি গোবরছড়া দেবে। এর ভেতর দাদা না উঠলে, মা বকবে। সে দাদাকে টেনে প্রায় তুলে দেবার সময় বুঝল, মা রান্নাঘরে।

সে ডাকল, এই দাদা ওঠ। আজ নীলদা আসবে।

—ধুস্ তোর নীলদা। বলে সে ও-পাশের তক্তপোশে ফের গড়িয়ে পড়ল।

পদ্মর স্বভাব এমনিতেই ভারি নরম। তাকে কেউ পদ্ম বলে যখন ডাকে, যখন সে বারান্দায় তক্তপোশে পড়তে বসে অথবা সবার বাধ্য বলে যখন দাদু তাকে ভীষণ ভালবাসতে চায়, পদ্ম তখন আরও ভাল হয়ে যায়। অন্যদিন হলে যেভাবে হাতে ঝটকা মেরেছে দাদা, সে কেঁদেকেটে অস্থির করে তুলত। আজ কিছু বলল না। দাদা পর্যন্ত কেমন ক্ষেপে আছে। সে চুপচাপ তার বইপত্র গুছিয়ে বারান্দায় পড়তে বসে গেল। পড়া ঠিক হচ্ছে না, কেন যে বারবার সে পুবের ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। ও-ঘরের পাশ দিয়েই মানুষজনেরা বাড়িতে আসে। থেকে থেকে সে এভাবে তাকাচ্ছিল আর গুনগুন করে, রেখ মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে, পড়ছিল।

ফুলু পিসি উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। সূর্য উঠে যাচ্ছে। গাছ-গাছালি ভরা বাড়িটার ভেতর তখন কুরচি ফুলের মত সব সাদা পায়রা উড়ছে যেন। ফুলু পিসির মুখে কখনও সামান্য রোদ কখনও ছায়া। মা রান্নাঘরে উনুনে শুকনো ডাল-পাতা

গুঁজে দিচ্ছে। ঠাকুমা সিম-মাচানের নিচে উবু হয়ে বসে আছে। পুজোর দুব্বো তুলছে। দুব্বো তুলে ঠাকুমা কুয়োতলায় ঠাকুরের বাসন মাজতে বসবে। কোনো দিন সকালে গরম ফেনাভাত কৈ মাছ ভাজা। কোনোদিন দুধ-মুড়ি পাকাকলা গুড়। নীলদা আসছে, থাকবে, মা নীলদা থাকবে শুনে কেমন একটা নেই নেই, সংসারে অভাব অনটন বেড়ে গেছে মতো মুখে সবাইকে ডাক খোঁজ করছে। মাকে তার কদিন থেকে একদম ভাল লাগছে না। ছোটদাদুর ছেলে ন-কাকা অনেক টাকা পাঠায়, বাবা পাঠায়, তবু মার মুখে হাসি নেই। মা কেমন ভয় পেয়ে গেছে যেন। পদ্মর কেন জানি কিছুতেই আজ আর পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না।

ফুলু পিসি বলল, এই কি ঘ্যানর ঘ্যানর করছিস। স্পষ্ট করে পড়।

পদ্ম জোরে জোরে পড়ল। সে আঁক কষল, তখন দাদা হাই তুলতে তুলতে তক্তপোশে এসে বসেছে। মা রান্নাঘর থেকে চিৎকার করছে, মানু উঠেছিস। বেলা হয় না! তোরা সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দিবি!

পদ্ম চিৎকার করে বলল, মা দাদা উঠেছে।

—উঠেছে! তবে আর কি! আমার রাজ্যোদ্ধার হয়েছে। দাদাকে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে যেতে বল। তুমি খেয়ে নাও।

খেতে বসে মানু দেখল, সেই দুধ কলা মুড়ি। বিরক্তিতে মুখ ভার হয়ে গেছে। খাচ্ছে না। চুপচাপ বসে আছে।

—খা দাদা।

—রোজ রোজ একঘেয়ে খাওয়া ভাল লাগে!

সহসা বজ্রপাতের মতো চিৎকার শোনা গেল। পদ্ম আড়ষ্ট চোখে লক্ষ্য করল মা প্রায় তেড়ে আসছে দাদাকে—তোমরা কি পেয়েছ আমাকে! খাবে না তো ফেলে দাও। কোথাকার রাজার ছেলে এয়েছেন। দুধ কলা একঘেয়ে। তবু তো জুটছে। দেখ না দিনকে দিন তোমাদের কি হয়।

পদ্ম বলল, খা না দাদা, দেখছিস না মা রেগে যাচ্ছে।

—এক থাপ্পড় মারব। আমি খাচ্ছি না তো তোর কি!

—মা রেগে গেলে জানিস না শরীর খারাপ করে।

—করুক। তেল মেখে মুড়ি খাব। দুধ মুড়ি খাব না।

—তোমার দুধ তবে কে গিলবে!

—দাও না মা, দাদা তেল মেখে মুড়ি খাবে।

হঠাৎ কেমন ক্ষেপে গিয়ে নলিনী ছেলের চুল ধরে টেনে তুলল। বলল, যাও বের হয়ে যাও। তোমায় খেতে হবে না।

কেন যে অকারণ এ সব অশান্তি পদ্ম বুঝতে পারে না। ঠাকুমা ছুটে এসে

দাদাকে জড়িয়ে ধরেছে—তুমি বৌমা এত বড় ছেলের গায়ে হাত তোলো।

নলিনী কিছু বলছে না। ছেলের দুধ মুড়ি তুলে নিয়ে গেছে। এবং যা জেদ, হয়তো আজ আর নিজেও খাবে না, দাদাকেও খেতে দেবে না।

পদ্ম চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়ল। এখন মার কাছে-পিঠে থাকা খুব নিরাপদ নয়। বরং পড়াশোনায় আরও বেশি মনোযোগী হয়ে যাওয়া ভাল। অনেক বেলা পর্যন্ত পড়লে মার রাগ উবে আসে। সে এবার খুব উচ্চস্বরে পড়তে শুরু করে দিল—কপিলাবস্তু নগরে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন...

তিন

ছোট দাদু বললেন, এত বেলা হল, ওরা এখনও এল না দেখছি।

পদ্ম বলল, কতদূর দাদু?

—তা চার ক্রোশের মতো পথ হবে। বলে এসেছিলাম, রাত থাকতে বের হয়ে পড়তে। যা রোদ, খুব কাহিল হয়ে পড়বে ছেলেটা।

পদ্ম আজকাল দাদুকে নানাভাবে সাহায্য করতে ভালোবাসে। সে দাদুর পূজার আয়োজন করে দেয়। ঠাকুমা নিরামিষ ঘরে তবে সকাল সকাল ঢুকতে পারে। ঠিক সময় সবাই খেতে পায়। সে বলল, একুশটা তুলসী-পাতা দিলাম। এবং কি যে হয় মাঝে মাঝে কোথাও দাদু অমঙ্গলের আভাষ পেলে ঠাকুরকে তুলসী দেন। আজও দেবেন বলেছেন। বাজার থেকে বড় চাপিলা মাছ এনেছেন দাদু। কি তাজা আর রূপালী রং। মাছ এলেই পদ্মর ছুটে যাবার স্বভাব। সে পুঁটুলি থেকে মাছ খুলে কাঁসার থালায় মেলে রাখতে ভালবাসে। সামান্য জল দিয়ে রাখে। তার মাছ কুটে দিতে ইচ্ছে হয়। মার জন্য পারে না। ফুলু পিসি তাকে কিছুতেই মাছ কুটতে দেয় না। সংসারে তখন তার অভিমান বাড়ে।

সারাটা সকাল দুপুর পদ্ম প্রায় ঘর বার হল বার বার। অড়হর গাছের নিচে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কতবার। লোকজন কত গেল, বাজার করে যারা ফিরেছে, তাদের ভেতর থেকে কেউ না কেউ হয়তো সহসা ঢুকে যাবে বাড়িটাতে। খবর দেবে, আসছে। বড়বাবু আসছে। পেছনে সেই ছোট মানুষটি। তার সমবয়সী না হলেও খুব বড় নয়। এভাবে তার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে।

আর এভাবেই পদ্ম দেখল দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। দাদু কিছুটা হেঁটে গিয়েছিলেন। দাদুর খালি পা, লম্বা সাদা পৈতা, চুল সাদা, হাঁটুর নিচে কাপড় নামে না দাদুর। ফিরে এসে বললেন, আসছে।

আর শোনা মাত্র, পদ্ম ছুটে এসে বলল, মা আসছে। নীলদা সোনাপিসে আসছে। ঠাকুমাকে বলল। ফুলু পিসি, দাদা সবাইকে সে ডেকে হেঁকে বলে গেল,

আসছে। ওর গায়ে লতাপাতা আঁকা ফ্রক, এবং ছোট্ট বিনুনি দুলছিল পিঠে। এত হৈচৈর ভেতরও সে মার কোনও শব্দ পেল না। দাদু এসে ঠাকুমাকে বলল, বৌঠান, ওরা আসছে। পদ্ম ছুটে গেল পুকুরপাড়ে, তারপর আরও দূরে। এবং দত্তদের বাড়ি পার হয়ে কাছারি বাড়িতে নেমে গেল। সেখানে সে একটা লটকন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, খারে কাচা কাপড় জামা পরে একজন ক্লান্ত মানুষ। সে চিনতে পেরেই ডাকল, পিসেমশাই। পেছনে যে আছে তাকে দেখে, পলকে চোখ ফিরিয়ে নিল। যেন সে ভারি অপরিচিত মানুষ। পিসেমশাইয়ের মতো সে নীলদা বলে ডেকে উঠতে পারল না। লজ্জায় সে কেমন গুটিয়ে গেল।

সাগল বলল, কিরে তুই এখানে?

পদ্ম কাছে গিয়ে পিসেমশাইর পুঁটুলিটা তুলে নিতে চাইল হাতে।

সাগর বলল, তুই পারবি না।

পদ্ম বলল, দাও না। আমি পারব।

সাগর বলল, এই তো এসে গেছি। নীল, এই পদ্ম। তোমার মেজমামার মেয়ে।

অনলের নিজের মামা বেঁচে নেই। মামীমা বাপের বাড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গেছে। মেজমামা ওর মার খুড়তুতো ভাই। ছোট দাদুর দুই ছেলে। ওরা কোথায় বিহারের দিকে থাকে। বড়-জন কয়লা খনিতে একটা কী বড় কাজ করে। এবং এই পরিবার সম্পর্কে তার ধারণা এত কম যে পদ্মকে দেখে কেমন প্রথমে গুটিয়ে গেল। পদ্মর গায়ে সুন্দর ফ্রক। পদ্ম কলকাতার মেয়ে বলে ভারি ফিটফাট। আর ওর হাঁটু পর্যন্ত ধুলোতে সাদা, মুখ ভারি বিশ্রি হয়ে গেছে ঘামে ভিজে। আয়নায় সে মুখ না দেখেও টের পায়, মুখটা পুড়ে গেছে তার রোদে। ঘামের গন্ধ, যেন কাছে গেলেই বলবে, কি গন্ধ গায়! সে বাবার পেছনে, যেন পদ্ম ওকে দেখতে না পায়। পদ্ম আগে আগে যাচ্ছে, পুঁটুলিটা কাঁখে নিয়েছে, পিসেমশাই তখন বলছেন—তোরা সবাই ভালতো, তোর বাবার চিঠি এয়েছে! ওঁর তো আসার কথা ছিল। পদ্ম খুব চটপট কথা বলতে পারে, যা বলার নয়, কখনও কখনও তাও বলে ফেলে, এবং অনলের খুক খুক করে হাসি পাচ্ছিল তখন। দত্ত বাড়ির নিবারণ দত্ত দেখে বলল, কি বড়বাবু অনেকদিন পর এদিকে আসা হল! পরিচিত আরও দু-একজন মানুষ বাবার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে—এই আপনার বড় ছেলে?

বাবা বলছেন, আমার না ঈশ্বরের। যেন আমার বললেই ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ লেগে যাবে। তোমার কি হে, তুমি কে, তুমি তো নিমিত্তি মাত্র। বাবা ঈশ্বরকে খুব ভয় পায়। বাবা যত গরিব হয়ে যাচ্ছে তত ঈশ্বরকে বেশি তার

ভয়।

চার পাশে খাঁ খাঁ রোদ ছিল, এখন এই গাছপালার ভেতর ঢুকে যেন জুড়িয়ে গেল শরীর। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বার বার কোথাও জল খেতে চেয়েছে অনল, সাগর বলেছে, আরে ঐ তো এসে গেলাম! বাবা অনেক দূরের পথ ঐ তো এসে গেছি বলে হাঁটিয়ে এনেছে। ছায়ার ভেতর ঢুকে ঝুপ করে বসে পড়তে ইচ্ছে হল অনলের। এক পা আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। পা দুটো কেমন ভারি আর নির্জীব।

বাড়ির পথে উঠে আসার সময় পদ্ম কথা বলতে বলতে কেমন চুপ মেরে গেল। সকাল থেকে মা যা আরম্ভ করেছে। সোনা পিসেমশাইর সামনে যদি কিছু হয়ে যায়! মা'তো মাঝে মাঝে ভীষণ অবুঝ এবং নীলদার মুখের দিকে তাকিয়ে তখন কেন যে তার আরও মায়া বেড়ে যায়। যত মায়া বেড়ে যায়, এ বয়সে পিসিকে ছেড়ে নীলদার থাকতে কি যে কষ্ট সে বুঝতে পারে। সে তার ঈশ্বরকে বলল, ঠাকুর মার রাগ কমিয়ে দাও। মাকে তুমি হাসি খুশি রাখো।

আর আশ্চর্য পদ্ম, সে তখন দেখল দাদু বারান্দা থেকে নেমে এসেছেন, পেছনে মা। পিসেমশাই দাদুকে গড় হয়ে প্রণাম করছে। মাকে করছে ঠাকুমাকে করছে। মার মুখে কি উজ্জ্বল হাসি! মা ডেকে তাকে বলছে, মানু কোথায়রে। পদ্ম তুই প্রণাম করেছিস।

পদ্ম জিভ কেটে ফেলল। এক দৌড়ে সে এসে পিসেমশাইকে টুক করে প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াল, আবার টুক করে ছোট্ট ছেলেটার পায়ে টিপ-টিপ করে দুবার মাথা ঠুকেই ছুটে কোথায় হারিয়ে গেল। আর কেউ তাকে ডাকাডাকি করেও খুঁজে পেল না।

সাগর বলল, নীল, সবাইকে প্রণাম কর।

ছোট দাদু বললেন, এত বেলা হল তোমাদের।

—যা রোদ। নীল হাঁটতে পারছিল না।

ছোটদাদু বললেন, একটু বিশ্রাম করে চান-টান করো। খাও। খুশির শরীর কেমন?

—ভালো।

ওরা সবাই পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় আছে। পুঁটুলিটা কোথায় রাখল পদ্ম, এবং সেজ-দিদিমার উনুনে কি পুড়ে যাচ্ছিল, সেজ-দিদিমা তাড়াতাড়ি নিরামিষ ঘরে ঢুকে গেলেন। এইসব অপরিচিত মানুষের ভেতর অনলকে থাকতে হবে। সে বাবার কাছছাড়া হতে ভয় পাচ্ছিল।

বাড়িটা বেশ খোলামেলা। তিনদিকে বড় টিনকাঠের ঘর। উত্তরে সীমের

মাচান, দক্ষিণে পাতকুয়ো। পেয়ারা গাছের নীচে গোয়ালঘর। এ-পাশে ঠাকুরঘর। ঘরের লাগোয়া সব ফুলের গাছ। ভেতর বাড়িতে নিরামিষ ঘর, রান্নাঘর, ঘরের পেছনে বড় একটা জামরুল গাছ, এবং নীচে খাল। খালের পাড়ে বাঁশের জঙ্গল এবং আরও দক্ষিণে আমের বাগান। তারপর হাজামজা পুকুর, পুকুর পার হলে দক্ষিণের বাড়ি। গাছপালার ভিতর ঘেঁসাঘেঁসি করে সব বাড়ি ঘরে মানুষেরা রয়েছে।

রাতে খেতে বসে মেজমামী বাবাকে বলল, বুঝলে সাগর, আমার তো এক ছেলে, বায়না অনেক। এটা খায়না, ওটা খায়না। দুধে ভাতে খেতে চায় না। কি যে চায় বুঝি না। তোমার ছেলে তো দেখছি খুব ভাল, কথা কম বলে। শান্ত। সব তো সব সময় দিতে পারব না, পরে কথা হলে...!

—না না। কথা হবে কেন। দু-বেলা দু-মুঠো দেবেন। ওর কোনো কষ্ট হবে না। সাগর যতটা সহজে বলে ফেলল, যত সহজে সে স্বীকার করে নিল, চোখে মুখে তার চিহ্নমাত্র নেই। মাথা নিচু করে খাচ্ছে। অনল বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। লম্ফর আলোটা দপদপ করে জ্বলছে। ছোট দাদুর খাওয়া হয়ে গেছে। পদ্ম খেতে খেতে মার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। মানুদা কিছুটা খেয়েছে, কিছুটা ফেলেছে। দুধের বাটিতে দুধ, গুড়। বাবার সামনে দুধ, ওর বাটিতেও দুধ গুড়, খাওয়া শেষের মুখে। তখন তোমরা খাও, আমি উঠি বলে ছোট দাদু কিছুটা বিরক্ত মুখে উঠে গেলেন।

পদ্মর কি যে হয় তখন সে মাকে খুব ভয় পায়—মা কত ছোট হয়ে যাচ্ছে—মার জন্য সেও যেন খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে—তার খেতে ইচ্ছে করছে না—সে বলল আমি আর খাব না। পেট ভরে গেছে।

মানু বলল, পিসেমশাই কাল থাকছেন তো! বড় পুকুরে মাছ ধরব।

সাগর যেন কিছুটা এ-কথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, কাল সকালে যেতে হবে মানু। গ্রীষ্মের ছুটিতে যেও তোমরা।

পদ্ম বলল, থাকতে হবে।

অনলের ভারি ইচ্ছে ছিল বলে, থাকো। কিন্তু তার ভীষণ ভয় করছিল। সে বাবার মুখই ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না। মেজ মামী দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুলু মাসি গ্লাসে জল ভরে দিচ্ছে। সেজ-দিদিমা নিরামিষ রান্না বাটিতে রেঁখে গেছিল। সেটা খালি হলে নিয়ে গেছে। সুধন্য বাইরে খোলা উঠোনে কলাই করা থালাতে খাচ্ছে। মাথার ওপর জোনাকী উড়ছিল। এবং ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। সে আর বলতে সাহস পেল না—বাবা থাকো, তুমি চলে গেলে আমি ভারি একা হয়ে যাবো। আমার কষ্ট হবে।

অনল চুপচাপ খেয়ে উঠে গেল। হাত মুখ ধুলো কুয়োতলায়। পদ্ম জল তুলে দিচ্ছে। এবং সে অন্ধকারে রান্নাঘরের উঠোন পার হয়ে বাইরের উঠোনে দাঁড়াবার মুখে বুঝতে পারল বড় আমলকি গাছটা দুটো উঠোনের মাঝখানে সোজা বরাবর ওপরে উঠে গেছে। তার পাতা ঝরে পড়ছিল। অন্ধকারে দাঁড়ালে সে বুঝতে পারল, ছোট দাদু তামাক খাচ্ছে। ছোট দাদু অনলকে এখানে নিয়ে এসেছে। ছোট দাদুর মেয়ে ছিল না। মাকে ছোট দাদু মেয়ের চেয়ে বেশি ভালবাসেন। আর বোধ হয় এই গাছতলায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সে টের পেল বড় দাদু মারা গেলে, ভাইঝিটা অনাথা, মা নেই বাবা নেই মেয়েটাকে সর্বস্ব খরচ করে বিয়ে, ভাল ঘর ভালো বর তবু মানুষের কখন দুঃসময় আসে কেউ টের পায় না। ছোট দাদু বাবার দুঃসময় টের পেয়ে তাকে নিয়ে এলেন।

ছোট দাদু বললেন, অন্ধকারে কে? নীল?

অনল খুব পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল।

—কে নীল?

—আমি দাদু।

—এদিকে আয়। বোস। কেমন লাগছে?

অনল কিছু বলল না। বারান্দায় আলো ছিল না। অন্ধকারে সে দাদুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। দাদু একটা জলচৌকিতে বসে তামাক খাচ্ছে। সামান্য জ্যোৎস্না উঠোনে। অস্পষ্ট আলোতে সে পাশের একটা জলচৌকিতে চুপচাপ বসলে দেখতে পেল, কলকের আগুন দপ করে জ্বলে উঠছে। দাদু চোখ বুজে তামাক টানছে। সে দাদুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল। দাদু তামাক খেতে খেতে ভারি নিবিষ্ট হয়ে গেছেন। তামাকের গন্ধে সারাটা বারান্দা ভুর ভুর করছে।

দাদু তামাক টানছিলেন এবং সহসা জেগে যেন কিছু মনে এলেই বলে ফেলছেন—মাইল তিনেক পথ। হাঁটতে পারবি না?

—পারব।

—অমূল্য কবিরাজকে বলেছি।

কি বলেছেন আর কিছু বললেন না।

—কবিরাজ তোর বিনা বেতনে পড়ার একটা সুযোগ করে দেবে বলেছে।

অনল কিছু আর বলছে না। অমূল্য কবিরাজের নাম মার কাছে অনেকবার শুনেছে। সে এখানে খুব ছোটবেলায় এসেছিল। তখন দেখলে দেখতেও পারে...তার কিছু মনে নেই। স্পষ্ট নয় সব কিছু।

তিনি ফের বললেন, মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। বিনা বেতনে পড়তে হলে পড়ায় ভাল হতে হয়।

বাবার গলা ভেতর বাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে। ফুলুমাসি কি বলেছে, বাবা জবাবে কিছু বলেছেন। পদ্ম ঘরে হ্যারিকেন রেখে গেল। বারান্দায় আলো এসে পড়েছে। দাদু এখনও অন্ধকারে। কি একটা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছিল।

দাদু ভীষণ লম্বা মানুষ, রোগা মতন। চামড়া ঝুলে গেছে। চোখের পাতা সাদা হয়ে গেছে। খড়ম পায়ে দেন বলে আরও লম্বা লাগে দেখতে। অন্ধকারেও দাদু তাকে দেখছেন। সে কিছু বলছে না দেখে আরও কিছু হয়তো বলবেন তিনি। সে বুঝতে পারছিল এ-বাড়িতে তিনিই তার নিজের মানুষ। মাও বলে দিয়েছে কষ্ট হলে ছোট কাকাকে বলবি। তোকে দিয়ে যাবে।

ফুলুমাসি পুবের ঘরে লণ্ঠন নিয়ে যাচ্ছে। হাতে শেতল পাটি। বোধহয় বিছানা করতে যাচ্ছে। তার আর বাবার বিছানা। দিদিমা ঘরে এসেছেন। একবার উঁকি দিলেন, দিদিমার বয়স দাদুর মত নয়, কম। এখনও শক্ত, বেশ নিজের রান্নাবান্না নিজেই করে নিয়েছেন। দাদু বললেন, বৌঠান নবীনকে লিখে দিতে বল, নীল এখন থেকে এখানে থাকবে। লেখাপড়া করবে।

অনল বুঝতে পারল না দাদু এত পরে কেন মেজমামাকে লিখতে বলছেন। হয়তো দাদু বিশ্বাস করতে পারেনি বাবা সত্যি সত্যি তাকে এখানে রেখে যাবে। বাবা খুব সহজে ছোট হতে চায় না। দাদু হয়তো জানতেন, মা যতই বলুক বাবা শেষ পর্যন্ত রাজি হবে না। আর রাজি হয়ে গেলেই বাবার ওপর মার কী অবিশ্বাস! বোধহয় মা আর আগের মত বাবাকে ভালবাসে না। রাতে বাবাকে যেভাবে বকাঝকা করছিল আর বাবা চুপচাপ যেভাবে হজম করে গেছে—ওর বিশ্বাস হচ্ছিল না সবকিছু—সে দাদুকে বলল, মা আপনাকে যেতে বলেছে।

—তোর গ্রীষ্মের ছুটি হোক। একসঙ্গে যাব। তুমি কিন্তু কান্নাকাটি করবে না। বেশিতো দূর না। বর্ষাকালে সুধন্য নিয়ে যাবে তোমাকে। শুকনো দিনে আমি। পদ্ম আছে, কিন্তু দাদু কেন যে মানুদার কথা বললেন না। মানুদাতো বাবাকে কাল থেকে যেতে বলেছে। অথচ মানুদার কথা দাদু যেন ইচ্ছে করেই বলছেন না। দাদু কি সব টের পান—কি হবে না হবে, কে তাকে কতটা ভালবাসবে তিনি আগে থেকেই বুঝতে পারেন।

এ-সময় দাদুর পাশে বাবাও বসে পড়ল। জোতজমির কথা আদায়পত্রের কথা বাবার কাছে জেনে নিতে চাইলেন দাদু। শরিকী মামলায় বাবা শেষ হয়ে গেল কথাবার্তায় সে তা বুঝতে পারছিল। লগ্নীর টাকা সব বাকি পড়ে গেছে। হক সাহেবের ঋণসালিশী বোর্ড খুব একটা সুবিচার করছে না, এমন দুঃসময়ের কথা যেন বাবা স্বপ্নেও ভাবেনি। বাবা খুব বেশি কথা বলে না, মামলায় হেরে গিয়ে আরও চুপচাপ হয়ে গেছে। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে বিলের অতবড় জমিটা

হাতছাড়া হয়ে গেল। আসলে বাবা ঠিক সংসারী মানুষ না। কেমন সামান্য উদাস ভাব। ছোট দাদু সব টের পেয়ে বুঝি শেষপর্যন্ত আর বেশি কিছু বলতে সাহস পেলেন না। বললেন, শুয়ে পড়গে। বাবা উঠে পড়লে বললেন, কদিন থেকে যাও।

বাবা কিছু প্রায় না বলেই উঠোনে নেমে গেলেন। খালি পা, বাবা খড়ম পায়ে চলে যাচ্ছে, অনল পরেছে স্যাণ্ডেল খড়ম। হাঁটতে গেলেই খটখট শব্দ হয়। ওরা দুজনে উঠে যাবার সময় ফুলুমাসি আলো ধরেছে। বাবা আসার সময় যা কিছু নতুন উপহার, এই যেমন একজোড়া স্যাণ্ডেল খড়ম, দুটো নতুন পেনসিল, একটা রাবার আর কিছু জলছবি উপহার দিয়েছে অনলকে—অনল যাবার সময় কেঁদে ফেললে, বাবা হয়তো মনে করিয়ে দেবে, তোমাকে আমি কত কিছু দিয়েছি, তারপরও কাঁদছ নীল।

একপাশে কাঠের পাটাতন, একপাশে তক্তপোশ। ছোট জানালা। বড় বড় গজারি গাছের থাম, আলকাতরায় রাঙানো। অনলদের পাকা বাড়ি, কবে ঠাকুরদা যৌবন বয়সে করে গেছিলেন। তারপর আর ওর কলি ফেরানো হয়নি। কড়িবরগা খসে যাচ্ছে। ওদের শোবার ঘরটা তবু বাবা গতবছর চুনকাম করিয়েছিলেন। বাতাবি লেবুর গাছ আছে একটা। পরে গন্ধপাদালের ঝোপ, কামরাঙ্গার জঙ্গল। এখানে সে জানালার ওপাশে কী আছে বুঝতে পারছে না। নতুন অপরিচিত জায়গায় কেমন একটা ভয় আর আশঙ্কা। সে ডাকল, বাবা।

সাগর বলল, এদিকে শোও। জানালার কাছে আমি যাচ্ছি।

অনল বলল, বাবা আমি একা শোব?

—একা শোবে কেন?

—তুমি কাল থাকবে তো?

—না নীল। কাল যেতে হবে। সাগর তারপর কী বুঝতে পেরে বলল, ছোট দাদুতো আছেন। সুধন্য ওপাশে শোবে। ভয়ের কি!

অনলের কেন জানি মনে হল বাবা তাকে ভালবাসে না। একা এমন একটা জানালার পাশে শুলে সে ভয়ে মরেই যাবে। চারপাশে নিশুতি রাতে সব নানারকম অপদেবতার ভয়। জানালায় হাত বাড়িয়ে যদি ডাকে, অনল আমরা। যাবে আমাদের সঙ্গে! অথবা নিশির ডাক—সে শুনেছে ঘুমের ঘোরে কোথায় নিয়ে চলে যায়, হয়তো কোনো নদীর পাড়ে কোনো কবরখানায়, শ্মশানে হতে পারে এবং ওদের তো মায়াদয়া কম, ঘাড় মটকে গাছের মগডালে ঝুলিয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না। অভিমানে সে বলতে চাইল, তোমরা আমাকে আর খুঁজে পাবে না। ঠিক আমাকে ওরা ডেকে নিয়ে যাবে।

এবং এভাবে অনলের ঘুম আসছিল না। বাবা আর কোনো কথা বলছেন না। সে মাঝে মাঝে পাশ ফিরে শুচ্ছে। এবং কখনও চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ার মত অথবা মরার মত পড়ে থেকেছে। সুধন্য মেঝেতে বিছানা পেতেছে। সেও শুয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়েই সুধন্যর নাক ডাকছিল।

বাবা বললেন, ঘুমোও।

বাবা টের পাচ্ছে সে ঘুমোচ্ছে না।

সে তো এতটুকু আর নড়ছে না। ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে আছে। কেবল থেকে থেকে মার মুখ—এই প্রথম সে মাকে ছাড়া। বাবার ঘরটা আলাদা। সে তার ছোট ভাইবোনেদেরে সঙ্গে বড় খাটে মার পাশে শুয়ে থাকত। ওর জায়গাটা ঠিক নিমু দখল করে নিয়েছে। ওর এভাবে সবার ওপর রাগ বেড়ে যাচ্ছিল। সবাই মিলে যেন তাকে বনবাসে পাঠিয়েছে।

বাবা বলল, যাবার সময় কান্নাকাটি কর না। তুমি বড় হয়েছ।

নিশুতি রাত এভাবে তখন চারপাশে অন্ধকার ক্রমশ বিছিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাচ্ছিল তারা। পুকুরে কোনো বড় মাছের ঘাই এবং দূরবর্তী মাঠে কিছু কুকুরের চিৎকার। গাছপালা সব মন্থর পায়ে যেন রাতের অন্ধকারে ক্রমে হেঁটে বেড়াতে শুরু করেছে। কিছু পাখির শব্দ, ডানা ঝাপটানোর শব্দ, বাদুড় উড়ে যাচ্ছিল গ্রামের মাথায়—পাখায় লটপট আওয়াজ—অনল শুয়ে শুয়ে সব টের পাচ্ছিল।

বাবা বললেন, ভাল মন্দ খেতে পাবে সব সময় ভেব না। যা দেবে তাই খাবে। নালিশ জানাবে না।

তখনই এক ঝাঁক শেয়াল একেবারে ঘরের কাছে ডেকে বেড়াচ্ছে—হুক্কা হুয়া। শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে মাটি। অনল ভয়ে আঁৎকে উঠেছে। ভয়ে সে শরীর শক্ত করে রেখেছে। রাতের এই বিরূপতার ভেতর মার মুখ, ছোট ভাইবোনদের আবদার সব মনে পড়ে যাচ্ছে। তার ভেতর থেকে কান্না উঠে আসছে। যেন সে ওদের আর জীবনেও দেখতে পাবে না। তার আগেই হারিয়ে যাবে। সে কোনরকমে বলল, আমি সত্যি কাঁদব না বাবা।

গভীর রাতে অনলের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কে যেন তার বড় বড় চুলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে আদর করছে। ওর মুখে মাথায় কেউ যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল বাবার হাত। সে এতটুকু নড়তে পারছিল না। বাবা তাকে গোপনে আদর করছে। সে জেগে গেলেই বাবা হাত সরিয়ে নেবে। তারপর মনে হল বাবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বাবাকে জীবনে কাঁদতে দেখে নি। সেও বোধহয় এবার কেঁদে ফেলবে। তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ে বলল, বাবা,

বাইরে যাব। ভীষণ হিসি পেয়েছে।

সকালে বাবা চলে গেল। অনল গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল। একা। বাবা দূরে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। সে বাবার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কাছারিবাড়ি পর্যন্ত চলে এসেছিল। উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে বাবা ধীরে ধীরে মাঠের ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে। সে দাঁড়িয়েছিল। কাছারিবাড়ির মাঠে একজন বুড়ি মত মানুষ গরু দিতে এসেছে। সে ঠাস ঠাস করে খোঁটা পুতছিল। কিছু গ্রামবাসী—তারা চলে যাচ্ছে আস্তানা সাবের দরগা পার হয়ে। সে কাউকে চেনে না। বাবাকে এখনও দেখা যাচ্ছে। যতক্ষণ দেখা যাচ্ছে—পৃথিবীতে সে একা নয়—বাবা দূরের মাঠে এখনও হেঁটে যাচ্ছে—ক্রমে বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছিল, রোদের ভেতর বাবা যেন পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে মিশে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল সত্যি সে এবার একা হয়ে গেল, কান্না আসছে বুক ঠেলে। বাবা বারণ করেছে। এখন কাঁদলে কেউ দেখতে পাবে না। সে একটা গাছের আড়ালে চলে গেল। কেউ দেখতে পাচ্ছে না। চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ছে। তখনই কে যেন ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর থেকে ডেকে উঠল, নীলদা আমি এখানে।

অনল কিছুই দেখতে পেল না। পদ্ম এই গাছপালার ভেতর কোথাও লুকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি চোখ জামার খুঁটে মুছে নিল।

—আমি কোথায় খুঁজে দ্যাখো।

—দেখতে পাচ্ছি না।

আর কোনো জবাব নেই। সামনে অজস্র মটকিলার ঝোপ, বাঁশের ঝাড়, বাতাবি লেবুর বাগান ডানদিকে। দক্ষিণে সেনেদের পুকুর, বড় বড় চন্দনগোটার গাছ। হাওয়ায় ডালপালা দুলছে। পদ্ম কোথায় আছে কিছুতেই টের পেল না। সে ঝোপে জঙ্গলে শুধু তাকে খুঁজে বেড়াতে থাকল।

—এই পদ্ম, তুই কোথায়? আমার ভয় করছে। ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর কোথাও উবু হয়ে পদ্ম তাকে ভয় দেখাচ্ছে।

ঠিক পায়ের কাছে কে যেন তার সুড়সুড়ি দিচ্ছে।—পদ্ম! পদ্ম! উঠে দাঁড়াল। ফ্রক গায়ে পদ্মকে এইসব জঙ্গলে একটা ফুলপরীর মত লাগছে। পদ্মর ফ্রক, বিনুনি এবং আশ্চর্য সরল চোখ অনলকে একটা নতুন জগতে নিয়ে যেতে চাইছে। সে বলল, কি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি!

পদ্ম বলল, তুমি কাঁদছিলে কেন?

—যাঃ কাঁদলাম কোথায়।

—আমি সব দেখেছি।

অনল লজ্জায় গুটিয়ে গেল। কিছু বলল না।

—আমি কাউকে বলব না। এস। হাত ধরে অনলকে নিয়ে মেয়েটা যে তখন কোথায় যেতে চায়! গাছের নীচে, যেখানে সব সরু সরু কাচপোকা অথবা সোনালি রংএর চন্দনবীচি পড়ে আছে—সেই সব মাড়িয়ে, সেনেদের এক লাল রংএর ঘোড়ার কাছে অথবা অর্জুন গাছে যেসব ফুল আসবে তার সংগ্রহে—মেয়েটার ভারি প্রীত হওয়ার স্বভাব। পদ্ম গাছপালা রোদ্দুরের ভেতর অনলের হাত ধরে কেবল একটা ক্রমিক ছবির মত নিরন্তর ছুটতে চায়। ছুটতে ভাল লাগে। নীল আকাশের নীচে কোনো বড় মাঠে সহসা থমকে দাঁড়াতে বুঝি ইচ্ছে হয়। গ্রামের গাছপালা, অথবা ছাড়া-বাড়িতে কত সব খবর রয়েছে নীলদার জন্য, নীলদাকে সে তাই সেনেদের ঘোড়া দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। সেই লাল রংএর ঘোড়া দেখলে নীলদা ঠিক হেসে ফেলবে। তার আর কোনো দুঃখ থাকবে না তখন। সে গোপনে আর কোনো নির্জন গাছপালার নীচে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ভুলে যাবে।

চার

সকালে ছোট দাদু বললেন, চল অমূল্য কবিরাজের কাছে। বেলা বাড়লে ভিড় হবে। রোগী দেখার সময় কথা বলতে পারবে না।

অনল মাত্র বই খাতা নিয়ে বসেছে। পুবের ঘরটা এখন খালি। সুধন্য সকালে উঠে গরু-বাছুর নিয়ে জমিতে গেছে। ঝাঁপ তোলা। আম জাম হিজলের-ছায়া, পুকুর পাড়ে রোদ উঠেছে। একটু বেলা বাড়তে না বাড়তেই রোদ ভারি তেতে যায়। ছোট দাদুর বোধ হয় রোদে হাঁটতে কষ্ট হয়। সকালে কখন ছোট দাদু উঠেছে সে টের পায়নি। দাদুর পাশে একটা ছোট বিছানা, আলাদা মশারি—রাতে যতটা ভয় পাবে ভেবেছিল, সকালে দেখেছে, ভয় তো পায়ই নি, বরং কখন রাত শেষ হয়ে সকাল হয়েছে, সে বুঝতেই পারেনি। দক্ষিণের বারান্দায় পদ্ম পড়ছে। মানুদা বসে বসে মটকিলার ডালে দাঁত ঘসছে। মুখে ভীষণ ফেনা উঠে গেছে তবু দাঁত মাজা শেষ হচ্ছে না। ছোট দাদু তখন ফের বললেন, কিরে চল। এসে পড়বিখন। বেলা বাড়ছে।

ছোট দাদুর কদমছাঁট চুল, লম্বা পৈতা গলায় এবং হাঁটুর ওপর খারে-ধোওয়া কাপড়, কেমন একটা বুড়ো-বুড়ো গন্ধ শরীরে। রাতে শোবার সময় গন্ধটা নাকে এসে লেগেছিল। এবং তিনি দুটো একটা কথা বলেছিলেন, ভূতদের সম্পর্কে। গলায় যজ্ঞোপবীত থাকলে কেউ কাছে আসতে পারে না। তা ছাড়া বাড়িতে ঠাকুর দেবতা আছে—ভূতেরা এদিকে ঘেঁসতে বড় সাহস পায় না। চোর গুণ্ডাদের অনল ভয় পায় না। মানুষকে আর কি ভয়! ওদের ইচ্ছে করলেই ধরা

যায়—কিন্তু ভূতেরা তো তা নয়, ওরা লুকোচুরি খেলতে বেশি ভালবাসে আর যাই করা যাক ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। কিন্তু এই বুড়ো মানুষ কাছে থাকলে সে ওদেরও খুব একটা ভয় পায় না। দাদুর সঙ্গে পুকুর পাড়ে নেমে এ-সব মনে হল তার।

সামনে দত্তদের আমবাগান। এবং মাঝে মাঝে বড় বড় সব রসুন গোটার গাছ। রসুনের মগডালে দত্তদের ছোট বৌ গলায় দড়ি দিয়েছিল। পদ্ম আরও সব খবর দিয়েছে তাকে—বেশি করে আস্তানা সাবের খবর। একমাত্র এই পীর মানুষটি গ্রামের শুভাশুভ দেখছে। এবং কিংবদন্তীর মতো এই মানুষ অন্ধজনের দেহ আলোর মতো। ওলাওঠায় কী মহামারীতে তিনি গ্রামকে রক্ষা করছেন। কত লোক যে গভীর রাতে তাঁকে দেখেছে। লম্বা সাদা দাড়ি, বড় চুল, মাথায় ফেজ টুপি, কালো আলখাল্লা, গলায় সব রং-বেরং এর পাথরের মালা। হাতে মুসকিলাশান। প্রায় সব খবর, যত সব আশ্চর্য জায়গা আছে পদ্মর কাছে, এবং কলকাতা শহরের বাসট্রামের কথা, হাওড়ার পুল, চিড়িয়াখানা, আর কী যে কেবল বলে গেছে—সে এখন সব মনে করতে পারে না। দাদু তাকে কবিরাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। কবিরাজের ঘোড়াটা সে কাল দেখেছে। ঘোড়াটার একটু দূরে ও আর পদ্ম অনেকক্ষণ উবু হয়ে বসেছিল।

অনল ছবিতে ঘোড়া দেখেছে। আর দূরের মেলা দেখতে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখেছে। সব লম্বা লম্বা ঘোড়া, মেজেণ্টা রং-এর। কালো সাদা অথবা লাল রং-এর। একবার একটা মেলার ঘোড়া ওদের মাঠের ওপর দিয়ে গিয়েছিল। গ্রামের সবাই, ছেলেবুড়ো বলতে কেউ বাকি ছিল না, ঘোড়াটা দেখতে মাঠে নেমে গিয়েছিল। এত লম্বা সাদা ঘোড়া দেখে বিস্ময়ে সে ঘোড়াটার পেছনে সব ছেলেদের সঙ্গে কিছুক্ষণ দৌড়েছিল। কদম দিচ্ছিল ঘোড়াটা। গলায় ঘণ্টা বাজছিল। দুজন মানুষ পাশে পাশে দৌড়াচ্ছে একটা লোক বসে আছে পিঠে। প্রায় রাজার মতো লাগছিল লোকটাকে। মোমিনপুরের ঘোড়া বাজি জেতার জন্য যাচ্ছে। কিন্তু সেনেদের ঘোড়াটা তেমন বড় নয়। ছোটও নয় খুব। এত কাছে থেকে সে কখনও ঘোড়া দেখেনি। এবং সে বুঝতে পারছিল এবারে সে একা নয়. সঙ্গে পদ্ম আছে, মন ভাল না থাকলে ঘোড়াটা আছে। ঘোড়া দু-পা লাফিয়ে যখন ঘাস খেয়ে বেড়ায় তখন পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে তার খুব ভাল লাগে।

তখন অমূল্য কবিরাজের ডিসপেনসারিতে রোদ উঠে এসেছে। পাশে ডাকবাকস গ্রামের। নীল রংএর খামের মতো পোস্টাফিসের মাথায় টিনের চাল। দরজা খোলা। বুড়ো উপেন দত্ত ঝুঁকে আছে টেবিলে। পাশে খোলা আকাশের নীচে গাঁয়ের সব মানুষেরা, ফসলের খবর চিঠিপত্র কী এল—ডাকের খবর

এসব নিচ্ছিল। আর লাল রংয়ের ইঁটের বাড়ি অমূল্য কবিরাজের। জানালায় সাদা রং। লম্বা বারান্দা, আর সামনে সবুজ ঘাসের লন। সাদা ফ্রক পরে জানালায় সুন্দর মতো দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে অনলকে উঁকি দিয়ে দেখছে।

অমূল্য কবিরাজ ডিসপেনসারির ঘরে বড় তাকিয়াতে বসে আছে। বেশ সৌম্যকান্তি মানুষ। লম্বা। গায়ে ধবধবে সাদা ফতুয়া। ডিমের মত মসৃণ মুখ। দুজন ছাত্র বড় উদখলে হামানদিস্তায় গাছের শেকড়বাকড় পিষছে। বেশ একটা ছন্দের মত ওরা কাজ করে যাচ্ছে। ঢং ঢং ঢং—ঢন ঢন। চারপাশে কেমন শুধু শেকড়-বাকড়ের গন্ধ। অথবা লতাগুল্মের গন্ধে ঘরটা গমগম করছিল। বড় বড় কাচের আলমারি সাজানো। বাঁদিকে বড় বড় সব বোয়েম। এত বড় যে ইচ্ছে করলে সে কোনো বোয়েমের ভেতর চুপচাপ লুকিয়ে থাকতে পারে। থরে থরে সাজানো সব মাটির জালা। কত সব যে গাছপালা, ফলমূল জড় করে রাখা। আর দক্ষিণের বাগানে সে একটা কী অতিকায় জীব দেখে অবাক হয়ে গেল। ঠিক ছাগল ভেড়া নয়, অন্য কিছু একটা জীব, থুতনিতে দাড়ি আছে।

অনল বলল, দাদু ওটা কি!

দাদু বলল, ওটা রামছাগল।

সে বলল, কি হবে?

—ওটার তেল লাগে কবিরাজী ওষুধে। কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্যা রাতে ওটাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে। তারপর তুলে, ছাল-চামড়া খুলে বড় কড়াইয়ে জ্বাল দেবে। চর্বি বাতে বেদনায় কাজে লাগে।

অনলের খুব দুঃখ হচ্ছিল, কত আয়াসে চোখ বুজে ওটা জাবর কাটছে, পৃথিবীর কোনো খবরই রাখে না। গাছের ছায়ায় বেশ ঠাণ্ডা লাগছে বোধহয়—ঘুম পাচ্ছে মত জাবর কাটছে—ওটা যদি জানত কোনো এক অন্ধকার রাতে মাটি চাপা দিয়ে ওটাকে মেরে ফেলা হবে—এবং সেদিনটা এই গাঁয়ে ঠিক সবাই ঘুমিয়ে থাকবে, রোজ সকালে যাকে দেখা যায় গাছটার নিচে আর দেখা যাবে না—বোকা জীবটা তার কোনো খবরই রাখে না ভেবে কষ্ট হচ্ছিল তার, তখন কবিরাজ ডেকে পাঠাল, বলল, বড়বাবুর ছেলে তুমি?

অনল চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। বড়বাবুর যে ছেলে এটা কী বলার কথা! ছোট দাদু পাশের চেয়ারে বসে আছেন। দু-চারজন রুগী বাইরের বারান্দায় একটা লম্বা টুলে বসে আছে। সে কথা না বলায়, ছোট দাদুকে বলল, কোমরের ব্যথাটা কেমন?

দাদু এখন যেন তাঁকে দেখাতে এসেছেন, সঙ্গে সে রয়েছে। অনেক বেলা হয়ে গেল, পদ্ম ঠিক তার ঘরে দুবার ঘুরে গেছে—পদ্ম তাকে রামছাগলের খবর

দেয়নি। পদ্মও ঠিক জানে না বোধ হয়। এবং কলকাতায় থাকলে গ্রামের আকাশ খুব ভাল লাগার কথা—সে কেন যে পদ্মর জন্য ছটফট করছিল। পদ্ম তাকে ইতিমধ্যেই একবার তিনটে তিলের নাড়ু এবং একবার ক্ষীরের সন্দেশ চুরি করে খাইয়েছে। মামীমার ভাঁড়ারে কোথায় কী অবশিষ্ট আছে পদ্মের চেয়ে কেউ ভাল জানে না। পদ্ম ওর ঘরে এসে ওকে খুঁজে না পেলে খুব অসুবিধায় পড়ে যাবে। আর কখনও চুপিচুপি তাকালেই অনলের মনে হয় পদ্ম ফ্রকের নীচে কিছু চুরি করে গুঁজে রেখেছে। ওকে কোথাও ডেকে নিয়ে গিয়ে এবং দু-বারই সে দেখেছে ঠাকুর ঘরের পেছনটা খুব একটা নিরিবিলি জায়গা, বড় বড় সব তালগাছ দু-তিনটে, তারপর পুকুর পাড়ের ঝোপ জঙ্গল, জঙ্গলের ছায়ায় ঘরের পেছনে দু-জন চুপচাপ সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ টের পাবে না, ওরা দু-জন সকাল থেকে সেখানে লুকিয়ে ছিল। পদ্ম কিছু নিয়ে এলেই সোজা ওকে নিয়ে সেখানে চলে যায়, নীলদা হাঁ করো. করলেই মুখের ভেতর নাড়ু ঢুকিয়ে আবার লাফিয়ে লাফিয়ে কোথায় যে যায় মেয়েটা! ওর হয় বিপদ। তাড়াতাড়ি খেয়ে মুখ মুছে সুবোধ বালকের মত তখন তার না থাকলে চলে না।

অমূল্য কবিরাজ ছোট দাদুকে বলল, লেখাপড়ায় কেমন?

—ভাল। বেশ ভাল। ওখানেতো তোমার মাইনর স্কুল আছে একটা। ওতো মাইনর পাশ করেছে। নিয়ে এলাম আমি। তুমি যদি স্কুলে ওর কিছু একটা করে দিতে পার। বাড়ি বসেই সেভেনের বই সব শেষ করেছে।

কবিরাজ কি ভাবল। তাকাল জানালা দিয়ে মাঠের দিকে। ছাড়াবাড়িতে ওর ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে। সেই অনবরত ঢং ঢং ঢং ঢন ঢন শব্দ উঠছে হামানদিস্তার—কানে তালা লেগে যাবার মত। এবং এই শব্দ, সুদূর মাঠ থেকেও শোনা যায়—কারণ এমন একটা তীক্ষ্ণ শব্দ সারা গ্রামে এখন সবাইকে যেন জানিয়ে দিচ্ছে—মানুষের আরাম ব্যারামের জন্য শেকড়বাকড় পেষাই হচ্ছে। মানুষেরা অনেক দূর থেকেও জানতে পারে—গ্রামে বিখ্যাত কবিরাজ অমূল্য সেন তার নিয়মমাফিক বড় তক্তপোশে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছে, এবং বেলা বাড়লে সব বড় কলাপাতায় সবুজ ঘাসের ওপর শুকোতে দেওয়া হবে সব লাল নীল রঙের বড়ি। মাথায় হ্যাট পরে কবিরাজ ঘোড়ার পিঠে নানারকম সব বড়ি নিয়ে দূর দূর গ্রামে চলে যাবে রুগীদের বাড়ি। ফিরবে সেই বিকেলে। ফেরার সময় ঘোড়াটা কদম দিতে দিতে ধুলো উড়িয়ে যখন আসবে—তখন অনলের ইচ্ছে হয় বড় হলে সেও একটা ঘোড়া কিনবে। কবিরাজী অষুধ নিয়ে সে বাড়ি বাড়ি ফিরি করতে যাবে। রোগ শোকে মানুষের কাছে সে ওষুধ ফিরি করবে।

কবিরাজ বলল, তোমার কি নাম?

অনল দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থেকেই নাম বলল

কবিরাজ, দাদুর দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক বড়বাবুর মুখ পেয়েছে। কবে এসেছিল?

দাদু সব বললেন।

—একবার এল না!

—মনটা বোধহয় ভাল নেই।

—খুব কষ্টের ভেতরে আছে শুনেছি।

—তা আছে।

—খুশী তো আসেই না।

—না। অনেক বলেছি। আসে না। পাগল। সংসারে ভাল মন্দ কথা সব সময়ই হয়। ধরলে চলে!

অনলের আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। সে ওষুধের আলমারিতে নানা রং বেরংয়ের ওষুধ দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট সব শিশিতে কালো খুদে খুদে অক্ষরে সব ওষুধের নাম লেখা। এবং উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ। ওর কেমন বমি বমি পাচ্ছিল। অনল বলল, আমি যাই দাদু।

—যা! আমি আসছি।

অনল এক দৌড়ে বাইরে বের হয়ে এল। হামানদিস্তায় তখনও শব্দ—ঢং ঢং ঢং ঢন ঢন। শব্দটা একনাগাড়ে, এবং কেমন মাতাল করে দেবার মত। সে নেমেই সোজা ঘোড়াটা যেখানে ঘাস খাচ্ছে সেখানে দৌড়ে গেল। ছাড়াবাড়িতে ঘোড়াটা ছাড়া, নানারকম লতাগুল্মের ভেতর ঘোড়াটা একা। সামনে দু-পা বাঁধা। লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। আর ঘসঘস শব্দ হচ্ছে খাওয়ার। মাঝে মাঝে ফোঁত ফোঁত করছে। সে কাছে যেতেই চোখ তুলে তাকাল ঘোড়াটা। সে বলল, আমার নাম অনল। পদ্ম আমাকে নীলদা বলে ডাকে।

তখন সাদা ফ্রকপরা একটা মেয়ে কোথা থেকে ডাকল, অনল তুমি ওখানে কি করছ?

অনল দেখল ঠিক পেছনে একটু তফাতে ওর বয়সী একটা ছোট্ট মেয়ে। সে বুঝতে পারল অমূল্য কবিরাজের মেয়ে। মেয়েটা ওকে দেখেই নেমে এসেছে। কী সুন্দর মুখ চোখ। চুল ঘাড় পর্যন্ত, চুলে যেন প্রায় মুখটা ঢেকে গেছে। রেশমের মত চুল বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছিল। ওদের ঘোড়াটা সে দেখছে বলে মেয়েটা আবার নালিশ দিতে পারে। সে যদি দুষ্টুমি করে ঘোড়াটার সঙ্গে! মেয়েটা না থাকলে সে ছোট্ট একটা ঢিল ছুঁড়তে পারত ঘোড়াটার দিকে। ওর ইচ্ছে ছিল,

ঘোড়াটা ঘাস না খেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকুক। এবং কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ঘোড়াটা কিছুতেই আর একবার তাকায়নি। তাকালেই যেন সে ওর কাছে ছুটে যেতে পারত, পায়ের দড়ি খুলে দিতে পারত, তারপর মাঠে নেমে সারা দিনমান সে আর এই লাল রঙের ঘোড়া—কিন্তু সব টের পেয়ে গেছে ছোট্ট মেয়েটা। মেয়েটা আবার তার নামও জানে।

অনল বলল, কিছু করছি না আমি।

মেয়েটা কাছে এসে বলল, আমার নাম মিলি।

অনল বলল, আমাকে পদ্ম নীলদা বলে ডাকে।

মিলি বলল, আমিও তোমাকে নীলদা ডাকব। তুমি এখানে থাকবে। আমি সব জানি।

—কে বলেছে?

—পদ্ম। পদ্ম আমাকে সব বলেছে।

পদ্ম তবে সবার কাছেই খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল। নীলদা আসছে। নীলদা আমাদের বাড়িতে থাকবে। আর কাকে কাকে বলে রেখেছে পদ্মর কাছে খবরটা নিতে হবে। তখন ফের মিলি বলল, ঘোড়াটা আমার কথা শোনে।

একটা ঘোড়া, তাও লাল রঙের ঘোড়া ছোট্ট মেয়েটার কথা শোনে—ভাবতেই সে বড় বড় চোখে মিলিকে দেখল।

মিলি বলল, বিশ্বাস করছ না বুঝি দেখবে! বলেই সে দু লাফে ঘোড়াটার কাছে চলে গেল। ঘোড়াটা প্রায় ওর ঘাড় সমান উঁচু। সে ঘোড়াটার পিঠে হাত দিলে, কেমন ঠিক মাটির ঘোড়া হয়ে গেল। কান খাড়া করে দিল। সোজা দাঁড়িয়ে গেল। ঘাস খেতে যেন আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। অনল বুঝতে পারল ঘোড়াটা মিলির খুব পোষ মানে। তখন মিলি কেমন বড়দের মত বলল, উঠবে তুমি? কিছু করবে না। ওঠো না। আমি কাছে থাকলে আলো তোমাকে কিছু করবে না।

তবে ঘোড়াটারও একটা নাম আছে। সে বলল, আলোর পিঠে তুমি উঠতে পারবে?

—হ্যাঁ। বলেই ঘোড়াটার পিঠে সামান্য চাপ দিল। একেবারে সোজা হয়ে গেল আলো। তারপর সটান শুয়ে পড়ার মত পা ভাঁজ করে নুয়ে দিল পিঠটা। এক লাফে উঠতে না উঠতেই আবার সোজা হয়ে গেল আলো। সোজা ঠিক মাটির ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে থাকল। লেজ নাড়াচ্ছিল না, কেশর দোলাচ্ছিল না। যেন মুখ দক্ষিণ মুখো করে বাতাসের গন্ধ শুঁকছে।

অনল বলল, আমি যাই।

মিলি বলল, না গেলে পদ্ম বকবে।

—পদ্ম আমাকে বকে না।

—তুমি ক্লাশ এইটে পড়বে?

—হ্যাঁ।

—আমি তো এখানে থাকি না। শহরে থাকি। আমি ক্লাশ সিকসে পড়ি। আমাদের বড়দিমণি আমাকে মারে না।

অনল কি বলবে! সে অবাক হয়ে শুধু দেখছিল। ঘোড়াটা তেমনি মাটির ঘোড়া হয়ে আছে—লেজ নাড়াচ্ছে না কেশর দোলাচ্ছে না। যেন লেজ কেশর নাড়লে মেয়েটা পিঠ থেকে পড়ে যাবে।

এত সুন্দর আর পরীর মত মেয়েটা দেখতে যে সে আর একটা কথা বলতে পারল না।

পাঁচ

ফাল্গুনের শেষাশেষি সময় বলে গাছের পাতা সব ঝরে যাচ্ছে। দমকা হাওয়া আসছে এবং পাতায় পাতায় সারা গ্রাম মাঠ প্রায় কালো হয়ে আসে মাঝে মাঝে। এত গাছপালা বন অনল যেন কোথাও দেখেনি। ওদের গ্রামে মানুষ জন আছে—পাড়া লম্বা একটা বিছে হারের মত। দক্ষিণে বাঁশের একটা বন বাদে তেমন ঘন গভীর ভুতুড়ে জঙ্গল আর কোথাও নেই। কিন্তু এখানে আশ্চর্য সে দেখেছে বাড়ির ঠিক সঙ্গেই রয়েছে একটা করে ছাড়াবাড়ি। বাড়িগুলো সব দূরে দূরে। দক্ষিণের বাড়ি কিংবা পালবাড়ি, দত্তদের বাড়ি—কবিরাজ বাড়ি যেখানে যখন যেতে হয় কোথাও না কোথাও থাকে একটা বড় ছাড়াবাড়ি। ছাড়াবাড়িতে ঢুকে গেলেই তার ভয়, দুপুরে গা ছমছম করে। আর সব ঝরা পাতারা উড়ছে, মাটিতে পড়ছে ঠিক মনে হচ্ছে কখনও হাজার লক্ষ প্রজাপতি উড়ে দমকা হাওয়ায় আকাশে উঠে যাচ্ছে আবার ক্রমে তারা বৃষ্টিপাতের মত নেমে আসছে নীচে। সে দাঁড়িয়ে থাকলে অজস্র সব আম জাম নিমের পাতা তার মাথার ওপর ঝরে পড়ছে। ভাল না লাগলে সে পদ্মকে ডেকে নিত। ভরদুপুরে চুপিচুপি সে আর পদ্ম বনের ভেতর ঢুকে সংগ্রহ করত সব মটকিলার ফল। মিষ্টি এবং সুস্বাদু। ছাড়াবাড়ি। অযত্নে সব গাছপালার ভেতর এমন আছে সব অজস্র ফল—পদ্ম আর নীল কখনও পালিয়ে তার ভেতর চলে যায়। এবং এক সকালে পদ্ম দেখল নীলদা ছুটে যাচ্ছে। দাদা সকাল থেকেই তাড়া লাগিয়েছে, নীল দেরি হলে তোমাকে ফেলে আমরা চলে যাব।

স্কুল এগারোটায়। নটার ভেতর খেয়ে দেয়ে নেবার কথা। এইপ্রথম একটা নতুন বড় স্কুলে সে যাচ্ছে। ওর ঘুম হয়নি রাতে। সেতো ক্লাসের সেরা ছেলে

ছিল এতদিন। এখানে এতবড় স্কুলে তার কী হবে সে সঠিক কিছু জানে না। সকাল থেকেই মনমরা। এবং সে যেহেতু জানে তার দাদু আর পদ্ম বাদে নিজের বলতে আর কেউ নেই—সে একা একা স্নান করে এল পুকুর থেকে। এবং যখন খেতে বসল দুরকমের খাবার দুজনের থালায়। আগে ভীষণ একটা অভিমান বুক বেয়ে উঠত। এখন ওঠে না। সে তাকিয়ে একবার শুধু চোখ তুলে দেখে। বড় কই মাছ একটা আস্ত ভাজা মানুদার পাতে। মুসুরির ডাল। ওর শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ার কথা। সে চুপচাপ খেয়ে উঠে যায়। এবং সে দেখতে পায় পদ্ম লুকিয়ে দেখে গেছে সে কী খেল। পদ্ম আর লজ্জায় তখন কাছে আসে না। অনলেরও কী যে হয়ে যায়! রাগটা সবার ওপর তখন। মা বাবার কথা মনে পড়ে যায়। চোখ চিকচিক করে ওঠে। তখনই হাঁক, কি রে তোর হল!

—এই যে হয়েছে। বই খাতা পেনসিল বুকে করে সে নেমে আসে উঠোনে। মানুদা আর ডাকে না। সব ছাড়াবাড়ি, দত্তদের বাড়ি, কবিরাজ এবং ঘোষপাড়া পার হয়ে মাঠে নামলেই দেখতে পেল আটদশ জন ছেলে, সব দাঁড়িয়ে আছে গাছের নিচে। দল বেঁধে ওরা স্কুলে যায়। সামনে মাঠ খাঁ খাঁ করছে। প্রায় যেন মার্চ করে অনল সবার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। জমিতে লাঙল দেওয়া। সরু আলের ওপর দিয়ে প্রায় ব্যালেন্স রেখে সে হেঁটে যেতে থাকল। সে দেখছে তার নাম প্রায় সবাই জানে। সে হাঁটতে পারছিল না ঠিক মত। খালি পা তার। চষা জমির ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে ভীষণ লাগছে। সবাই কিছু না কিছু কথা বলছিল। সে একটাও কথা বলছে না। কেউ কথা বললে হুঁ হাঁ করছে। যেমন অবনী বলল, পারবি তো রোজ যেতে।

সে বলল, হ্যাঁ।

—প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হবে। রাস্তা শেষই হতে চাইবে না। পা ধরে যাবে। পা ধরলে বলবি, কোথাও একটু বসে নেব।

সে বলল, আচ্ছা।

—তারপর যখন রপ্ত হয়ে যাবি তখন আর একদিনও কামাই করতে ইচ্ছা হবে না।

অবনীকে অভিজ্ঞ মানুষ ভেবে সে বলল, কেন?

—আরে রাস্তার দুধারে দেখ কত ফসলের ক্ষেত। মাসে মাসে জমির রঙ পাল্টে যায়। দেখবি আর অবাক হয়ে যাবি। ঐ তো সামনে গোপের বাগ। আমের গুটি আসছে গাছে, পরে পাবি সনকান্দার মাঠ, মাঠ পার হলে নদী, তার পর আমিনপুরের বিল, বিলে এখন জল ভাঙতে হয় না। সব শুকিয়ে গেছে।

ওরা দক্ষিণমুখো শুধু হাঁটছে। জমি তেতে গেছে। ঘাম হচ্ছিল। মুখে রোদ

কককক

পড়ছে। এবং কালো হয়ে যাচ্ছে সবার মুখ। সনকান্দা পার হতেই অবনী কেন যে আলের সঙ্গে একেবারে মিশে গেল। পাশে ক্ষেতি শশার জমি—অজস্র ফলে আছে। অবনী এত বেশি নুয়ে গেল যে তাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। সে যখন ফিরে এল, ওর কোঁচড়ে [illegible]ট্ দশটা শশা। এবং নিমেষে ভাগ ভাগ হয়ে যার যার পকেটে চলে গেল। অনল [illegible]তে পারছে অবনী দলটার প্রায় সব। অবনীর বাবার অলিপুরার বাজারে ডিসপেনসারি আছে। অবনীদের বাড়িতে বাজারের সব সেরা জিনিস আসে। ওর বাবার খুব নাম। ডাক্তার জীবনপ্রভা ধর ওর বাবা। সে কিছু একটা করে ধরা পড়লে তার আসে যায় না। বাবার নামে তাঁর সব মুকুব হয়ে যায়। এবং অবনীকে অনলের কেন জানি এতবড় রাস্তায় ক্যাপ্টেনের মত সমীহ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওর পকেটে অবনী শশা ঢোকাতে এসে দেখল পকেটই নেই।
—কিরে পকেট নেই কেন? কোথায় রাখবি!

সে বলল, দাও না হাতে রাখি।

—না দেখতে পাবে। দেখলে টের পাবে আনোয়ারের বাবা। বাবাকে নালিশ দেবে। অবনী তারপর কী করবে যেন ভেবে পায় না। অবনী নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। দেখল পকেটটা ভীষণ ফুলে ফেঁপে যাচ্ছে। আনোয়ারদের বাড়ির সামনে অবনী পকেট জামার আড়ালে রাখছে। তারপর কোনরকমে ওদের বাড়ি পার হয়ে আবার মাঠে পড়তেই অবনী বলল, টিফিনে নিবি। এটা আমাদের নিত্যকার ব্যাপার। একটু সমঝে চলবি।

মানুদা তখন হাঁকছে, এই নীল এত পেছনে পড়ে আছিস কেন। দৌড়ে আয়।

তারপর ওরা দুজনে দৌড়ে দলটাকে ধরে ফেললে কেমন সবাই একেবারে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, হুররে! এতক্ষণ ওরা সবাই নিরীহ গোবেচারার মত মুখ করে রেখেছিল। যেন ওদের মত ভাল ছেলে হয় না। আনোয়ারদের বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা। আনোয়ারের বাবা হাঁক পাড়বে—কি কর্তারা পকেট ভারি নেই তো। ওরা মুখ এমন সরল অনাড়ম্বর করে রেখেছিল যে আনোয়ারের বাবা কিছুই বলতে আর সাহস পায়নি। অনলের অভ্যাস নেই বলে ভয় ভয় করছিল তার। যদি তাকে ধরে ফেলে—কি কর্তা পকেটে এটা কি? শশা! শশা চুরি করেছেন ক্ষেত থেকে। নালিশ দেব। আর তখনই বাবার মুখ মনে পড়ে যায়। বাবা বলেছে ভাল হয়ে থাকবে। মামীমাতো একটা ছোটখাটো অজুহাত পেলে আর রক্ষা রাখবে না। এ-ছেলেকে রেখে কে দুর্নামের ভাগি হবে। বংশের মুখে কালি। অনল সেজন্য কিছুতেই মুখ সরল অনাড়ম্বর করে রাখতে পারেনি। সে খুব দুঃখী মুখ করে রেখেছিল—এবং চুরি করে ধরা পড়লে যেমন মুখ হওয়ার কথা হুবহু প্রায় তেমন মুখে বাড়ির রাস্তাটা অতিক্রম করে এসেছিল এবং

আসবার মুখেই একটা মোরগ তেড়ে এসেছিল—যেন সেই মোরগটা তাকে ঠুকরে দেবে। মাঠে নেবে যখন সবাই হুররে দিচ্ছিল তখন সে দেখছিল, দূরের বাড়িটা থেকে কেউ নেমে ওদের ধরতে আসছে কিনা। সে প্রায় ভয়ে লাফিয়ে সবার পেছনে চলে গিয়েছিল। এবং কতক্ষণে সামনের বিলেন জমি, পেঁয়াজ রসুনের ক্ষেত পার হয়ে যাবে বুঝতে পারছিল না। ওর পকেটে শশা নেই, সে এদের থেকে আলাদা কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।

তারপর আমিনপুরার কাছে সেই কাঠের পুলে উঠে গেলে দেখেছিল, গাছে অজস্র সব হনুমান। গাছগুলোতে দলে দলে বসে আছে। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ছে। একটাতো ওর গা ঘেঁষে প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে গেল। অবনী, বলরাম, হৃদয় পকেটে শসা লুকিয়ে রেখেছে। হাতে থাকলেই প্রায় কেড়ে নেবে। এ-জায়গাটায় কেন যে এত হনুমান থাকে। আর আশ্চর্য অন্য কোথাও যায় না। এদের সে অন্য জমিতে এই যে প্রায় দেড় ক্রোশের মত মাঠ ভেঙে এসেছে কোথাও দেখেনি এবং পানাম স্কুলের রাস্তাটা সে দেখল কি বড় আর প্রশস্ত। বড় বড় মাঠ-কোঠা, ইঁটের সান বাঁধানো বাড়ি তারপর এক সু উচ্চ লম্বা পাঁচিল, পাঁচিলের ভেতর প্রায় তিন চার একর জুড়ে সব ভিনদেশী ফুলের বাগান এবং ওপরে তারকাঁটার বেড়া, আশ্চর্য সব ফুলের গন্ধের ভেতর সে দেখতে পেল পোদ্দারদের সদর গেট। সামনে বন্দুকধারী সিপাই—এবং প্রাসাদের মত রাজবাড়ি। রাজবাড়ি পার হলেই গঞ্জের মত হাট, হাটের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সেই শ্যাওলা ধরা ইঁটের স্কুলবাড়ি। ঢং ঢং করে সেই ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে ওর বুকটা কেমন ধড়াস করে উঠল।

ক্রমে এই বিদ্যালয়ের পথ অনলের ভারি প্রিয় হয়ে গেল। এই দীর্ঘ পথ যাতায়াতে মনে থাকল না রোজ দেড় ক্রোশ হেঁটে তাকে স্কুলে যেতে হয়। বরং মনে হয় ঐ তো গোপের বাগ, গ্রীষ্মের দিনে আম, জাম, জামরুল গাছে গাছে ফলে থাকে—তাদের দলটা অনেক দূর থেকে হাতে ঢেলা নিয়ে যখন হেঁটে যায়; বোঝাই যাবে না এই সব নিরীহ বালকেরা কি করতে যাচ্ছে। মানুদা একটু বেশি বয়সে পড়ছে। পড়াশোনা করতে মানুদার একদম ভাল লাগে না। এই যে স্কুলে নিত্যদিন সে যায় সে কেবল যেন এমন একটা পথের আকর্ষণে। সে যেতে যেতে সব কলকাতার গল্প করে। মোটরগাড়ি, ট্রাম, বাস এবং একদিন মানুদা একা ট্রামে চড়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে চলে গিয়েছিল এসব বললে অনলের মনটা কেমন প্রসন্ন হয়ে যায়—মানুদার সব ছোটখাটো ম্যাজিক আছে, কখনও পড়ন্ত বেলায় ফেরার সময় তাদের ম্যাজিক দেখায় মানুদা। কখনও রুমালের ম্যাজিক। মানুদার এ-সবে যত টান তত পড়াশোনায় মন্দ স্বভাব। সে কেমন ক-

দিনেই মানুদার খুব অনুগত হয়ে গেছে এবং সে বুঝতে পারে কী যেন একটা দুঃখ আজকাল মানুদা পোষণ করছে মনে মনে। একটা চিঠি সে দেখেছিল, মানুদা লিখেছে ডলিকে। ডলি মিলির দিদি। ডলি মাঝে মাঝে ঢাকা শহর থেকে চলে এলে মানুদার চোখে কেমন ঘুম থাকে না। সঙ্গোপনে মানুদা তখন কী যে করে বেড়ায়!

এবং এই পথটা সে দেখেছে বছরের শেষদিন পর্যন্ত কোথাও না কোথাও কিছু আকর্ষণ রেখে দিয়েছে। গ্রীষ্মের দিনে ক্ষেতি শশা কখনও টমেটো তুলে নেওয়া অথবা ফুটি তরমুজের সময় চুপচাপ পাতার আড়ালে বসে যখন একটা আস্ত মেজেন্টা রং-এর তরমুজ ওরা গোপনে খেয়ে ফেলে তখন আর পৃথিবীতে কোনো দুঃখ আছে সে বুঝতে পারে না। অথবা বর্ষাকালে সে দেখতে পায় আদিগন্ত মাঠ, ধানক্ষেত, পাটের জলা জমি, এবং পাট কাটা হলে কখনও রুপোলি জলের দীঘি, কত সব অজস্র শ্যাওলা, শাপলা শালুক, শাপলা জলে ভেসে থাকলে গভীর জল থেকে নৌকার ওপর বসে শাপলা তুলে নেওয়া তারপর ভেঙে ভেঙে খাওয়া, এবং সে ছোট বলে সবার মত লগি ধরতে পারে না, তার কাজ শুধু শাপলা তুলে সবাইকে সরবরাহ করা। সে থাকে নৌকার ডগায়, উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। দেখতে পায় ডালিম ফুলের মত পরিচ্ছন্ন বর্ষার জল, গভীরে কত সব ছোট মাছ শ্যাওলার ভেতর খেলে বেড়াচ্ছে। রুপোলি চাঁদা মাছ, এ-ভাবে মাছের ঝাঁকের ভেতর অজস্র শ্যাওলার ভেতর কী এক নিদারুণ ভয় থাকে। যেন কোথাও কোনো বড় ময়াল অথবা তার চেয়ে কঠিন কোনো সরীসৃপ মনে হয় তক্ষুণি ভেসে উঠবে—তখন সে আর জলের গভীরে তাকাতে পারে না। তার ভয় লাগে।

ধানের খেতে বর্ষায় আল পড়ে যায়। নৌকা চলে। ধানের গাছগুলো হেলে দুলে ওদের পথ ফাঁকা করে দিতে চায়। কাঠে ঘসা লেগে শব্দ ওঠে ছড় ছড়। কত রকমের কীট-পতঙ্গ যে উড়ে আসে আর পাটাতনে ওরা বসে থাকে। গোটা পৃথিবীটা জলে ডুবে আছে মনে হয়—এবং গ্রামগুলো থাকে দ্বীপের মত জেগে। পুরো পথটা তখন বর্ষার জলে ভেসে যেতে হয়। কখনও কী রোদ, আবার মেঘেরা আসে ধেয়ে। চারপাশ অন্ধকার করে এলে ওরা ছাতার নিচে কজন প্রাণী চুপচাপ জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। বৃষ্টি ছাড়লে নৌকা ছাড়া হয়, ফিরতে ফিরতে সাঁঝ লেগে যায় কোনো দিন। তখন আস্তানা সাবের দরগার মাথায় কোনো নক্ষত্র দেখতে পেলে মনে হয় আজ আর বৃষ্টি হবে না। সকালে সূর্য উঠবে।

শরতের ছুটিতে অনল বাড়ি চলে যাবে। সুধন্য নৌকা ঘাটে ঠিকঠাক করছে।

পদ্ম কাল ওর জামা প্যান্ট সব ধুয়ে দিয়েছে। পদ্মর এসব করার কথা না। ফুলুমাসি ওর ঘরদোর নোংরা, আর সুধন্য থাকে বলে আসতেই চায় না। ছোট দাদুর বিছানাটা পেতে দেওয়া ছাড়া আর তার এঘরে কাজ নেই। ফুলু মাসি ওকে একদম সহ্য করতে পারে না। এবং পদ্ম ওর ময়লা জামা প্যান্ট লুকিয়ে সব পরিষ্কার করে দিয়েছে। যেন সে নিজের ফ্রক প্যান্ট ধুচ্ছে সাবান ঘসে—এভাবে কাজ কর্ম সারছিল। অনল ডুবে ডুবে মাছ ধরছিল পুকুরে। সুধন্য তাকে জলে ডুবে কী করে মাছ ধরতে হয় শিখিয়েছে। সে মাছ ধরে জলের ওপর ভেসে ডাকছে—পদ্ম ধর। পদ্ম কিছু বলতে পারে না। এই দুপুরে মাছ নিয়ে গেলে পিসি রাগ করবে—মা বকবে, কে কুটবে মাছ—সময় অসময় নেই, সে তবু বলতে পারে না, তারও যে কী হয় মাছ কুড়োতে তার ভীষণ ভাল লাগে। ছুটে ছুটে বেড়ায় মেয়েটা, পাড়ে লাফায় মাছেরা। ট্যাংরা মাছগুলো ভীষণ বজ্জাত, পুট করে কাঁটা দিয়ে কেমন কোঁ কোঁ করতে থাকে আর লেজ নাড়তে থাকে। কাঁটা খেলে চুপচাপ বিষণ্ণ হয়ে যায়। মাকে বলা যাবে না, বললেই পিঠে পড়বে—ধিঙ্গি মেয়ে তোমাকে কে বলেছে ওর সঙ্গে মাছ ধরে বেড়াতে, নৌকা ছাড়ার সময় পদ্ম এসে ঘাটে দাঁড়িয়েছিল। বড় গাব গাছ মাথার ওপরে। অনল বসে আছে পাটাতনে। ছই নেই। কোষা নৌকা। সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। ছোট দাদু সুধন্যকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছে। সুধন্য চিঠিটা ওর জ্যাবে রেখে ঘাট থেকে নৌকা ছেড়ে দিল। পদ্মের চোখ কেমন ছলছল করছে এবং যতদূর দেখা যায় সে দেখেছিল পদ্ম গাছের নিচে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। এবং গাছপালার ভেতরে খালে খালে নৌকা মাঠে পড়লেই, যে আকাশটা নিত্যদিন মাথার ওপর ভেসে থাকে তেমনি ভেসে থাকল।

মাঠে এখন ধান গাছ ঘন, থোড় আসছে ধানের। এবং ঘন সব ধানখেতের ভেতর নৌকা ঢুকছে না। সুধন্য খাটো একটা কাপড় পরেছে। হাঁটুর ওপর মাল কোঁচা মেরে সুধন্য লগি মেরে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে, খালে খালে ঘুরে যাবে বোধহয় সুধন্য। এবং অলিপুরার বাজারে পড়লে নদী, নদীতে পাল তুলে দিলে বেশি সময় লাগবে না। আর এভাবেই সে বিকেলের আলোতে নদীতে নেমে গেল। দু-পাশে সব গ্রাম এবং গঞ্জ। কত সব পাখি, আর কত সব নৌকা, কোনোটা পাটের, কোনোটা খড়ের। গঞ্জের দু-পাশে সব বড় বড় তাল আর আনারসের নৌকা লেগে রয়েছে।

অনল বাড়ি যাচ্ছে। মায়ের মুখ, ছোট ভাইবোনদের কথা ভেবে ভীষণ খুশি। তখন কেন যে সেই সুন্দর মুখ পদ্মের, গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা পদ্মর ছলছল চোখ ওকে কষ্টের ভেতর ফেলে দেয়। সে বলল, সুধন্যদা আমাকে কবে আবার

নিয়ে আসবে?

—পূজা হউক তারপর।

—তুমি সুধন্যদা নদীতে মাছ ধরেছ?

—কত।

—একবার আমাকে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে।

—ভয় পাবেন।

—কেন ভয় পাব। তুমি তো আছ।

—সে এক আজব কাণ্ড কর্তা। দু-দিন জলে ভাসি থাকতে হয়। সহস্র হাতের তল জলের নীচে। সব বড় বড় মাছ সমুদ্দুরে আসে। জলের তলার মাছ, মানুষের তার ভারি ভয়। বড় বড় ঢাইন মাছ তবে লেগে যায় বঁড়শিতে!

এ পাঁচ সাত মাসেই সুধন্য তার কাছে প্রায় রাজার মত হয়ে গেছে। সুধন্য তাকে রাতে পড়া শেষ হলে চুপচাপ লণ্ঠনের আলো কমিয়ে কিসসা শোনায়। অথবা কোন মাঠে কত বড় মাছ পাওয়া যায়, বর্ষার জলে কি মাছ ভেসে আসে, একবার মাছ ধরতে গিয়ে রাতে কী-ভাবে সে ভূতের উপদ্রবে পড়ে গিয়েছিল—কী-ভাবে সব মাছ ভূতেরা খেয়ে গেছে, চুপড়ির ভেতর সব মাছেরা মাথা মুণ্ডহীন, চিবিয়ে খেয়েছে মুণ্ডু সব এবং এসব কাজে বড় ওঝা না হলে চলে না, সে এক দৌড়ে মাঠ ভেঙে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল।

তারপর কালু মিঞার ডাক খোঁজ এবং সেই থেকে সুধন্য আর রাতবিরেতে একা মাছ ধরতে যায় না। কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে এবং এমন সব অজস্র গল্পের ভেতর এক অজগর সাপের গল্প তার ফিরে ফিরে আসে। সুধন্য সব গল্পের শেষে একবার সে কী করে কবিরাজ বাড়ির বন্দুক দিয়ে একটা অতিকায় মেঘ-ডুম্বর অজগর সাপ মেরেছিল তার গল্প বারবার না বলে পারে না।

—অজগরটা খুব বড় না সুধন্যদা?

—সে এলাহি কাণ্ড নিলু কর্তা না দেখলে বিশ্বাস কবতে পারবা না। বললে তুমি ভাববে কিসসা।

—কত বড়?

—সে প্রায়—তুমি কখনও গেছ ঢালিদের পুকুরে?

অনল এ ক'মাসেই গ্রামের সব মুখস্থ করে ফেলেছে। কোথায় কী আছে—যেমন সে জানে সরকারদের সেই লম্বা আমবাগান পার হয়ে গেলেই কাশের জঙ্গল প্রায় যতদূর চোখ যায় সে দেখেছে, কাশের জঙ্গল ঘন সবুজ হয়ে আছে এবং সে একবার পদ্মকে নিয়ে পথটা ধরে গেছিল।

ওরা দুজনে কাশের জঙ্গলে ঢুকে গেলে আর বের হবার পথ পায়নি। কেন

যে গেছিল, এবং মনে পড়ছে, হাঁস দুটো বাড়ি ফিরে না এলে ভয়, কারণ এ ক-মাসেই তার ওপর কিছু কাজের ভার পড়েছে। এসব দেখেশুনে রাখা তার দরকার। হাটবারে ছোটদাদু, হাটে গেলে সন্ধ্যায় গরু বাছুর মাঠ থেকে সে নিয়ে আসে। হাঁস দুটোকে সন্ধ্যায় সে ডেকে ডেকে নিয়ে আসে।

এবং এক সন্ধ্যায় সে এসে দেখেছিল, হাঁস দুটো পুকুরে নেই। সে একটা লণ্ঠন হাতে খুঁজতে বের হয়েছিল—এবং যেতে যেতে সে কেবল ডাকছিল আয় তৈ তৈ।

চারপাশে তখন অন্ধকার—ঝোপে জঙ্গলে জোনাকি জ্বলছে—সে লণ্ঠন হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছে না। অন্ধকার রাতে গাছগুলো কী গভীর কালো কালো দৈত্যের মত একা দাঁড়িয়ে থাকে—আর কোনো গাছের নিচে গেলেই খস্ খস শব্দ। কারা যেন পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়ায় অন্ধকারে—। ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে—গাছের নিচে হেঁটে গেলে মনে হয় টুক করে একটা লম্বা হাত নেমে আসবে মগডাল থেকে, এবং চুল ধরে ওকে ওপরে টেনে তুললে কেউ টের পাবে না, এই গাছের মগডালে অনল নামে ছেলেটাকে কে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে।

আর এ-ভাবে যখন অজস্র ছায়া অন্ধকার নিরিবিলি হাঁটাহাটি করে বেড়ায় তখন সে আর না বলে পারে না, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম এবং এ-সব নামের ভেতর সে যেহেতু জানে ভূতেরা কাছে আসতে ভয় পায়, সে বুকে তার এঁকে দেয় বড় বড় করে হরে কৃষ্ণ হরে রাম। সে কখনও উচ্চস্বরে গান গেয়ে ওঠে—যত অন্ধকার নিবিড় হতে থাকে যত গাছপালা গভীর নিঝুম হয়ে যায় তত সে আস্তে আস্তে ডাকে—আয় তৈ তৈ। হাঁস শেয়ালে নিয়ে গেছে ভাবতেই গলা শুকিয়ে যায়—দুটো হাঁস যখন এ-ভাবে বনবাদাড়ে লুকিয়ে থেকে অনলের সঙ্গে মজা করছিল, যখন অনল ভয়ে আর একদম পা ফেলতে পারছে না, শরীর ফুলে উঠেছে তখনই গাছের অন্ধকারে সুন্দর মত একটি মেয়ে—ঝোপে জঙ্গলে ফুলপরী মেয়ে দেখে সে প্রায় চিৎকার করে দৌড়াবে ভেবেছিল—তখনই সেই ভুতুড়ে অবয়বে ফুলপরী মেয়েটা ডেকেছিল—নীলদা আমি। আমি পদ্ম।

ভূতেরা কত কী যে ছলনা জানে। পদ্মর রূপ ধরে তারা কেউ হয়তো ওকে নিয়ে যেতে এসেছে। ভূতেরা সুন্দর ছেলে মেয়েদের মাথা চিবিয়ে খেতে ভালবাসে—এক লহমায় কেমন শিরশির করে সব ভাবনাগুলো অনলকে গ্রাস করতে থাকলে—সে আর এক পা নড়তে পারেনি। প্রায় বাজপড়া মানুষের মত লণ্ঠন হাতে সে দাঁড়িয়েছিল। পায়ে হাতের সব শক্তি কেমন নিমেষে উবে গেছে। সে বোধ হয় সংজ্ঞা হারাতো।

তখন পদ্ম দৌড়ে এসে বলেছিল, এই দ্যাখো আমি পদ্ম। বিশ্বাস হচ্ছে না। হাঁসদুটো বাড়ি গেছে। তুমি বাড়ি চল। ও সোজাসুজি বাড়ি ফিরবে বলে পদ্মকে নিয়ে কাশ বনে ঢুকে গেছিল, ছোট মত একটা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। অনেকটা হেঁটে মনে হয়েছিল—ওরা পথ হারিয়ে ফেলেছে। পদ্ম বলেছিল, তুমি এস নীলদা। শুনতে পাচ্ছ না—ঠুং ঠাং শব্দ।

নীল বুঝতে পেরেছিল, পদ্ম ঠিকই বলেছে। কবিরাজ বাড়ির হামানদিস্তার শব্দ। শিকড়বাকড় ঠুকে ঠুকে অমূল্য কবিরাজের ছাত্র মানুষের অসুখ নিরাময়ের জন্য ওষুধ বানাচ্ছে! ওর সব ভয় কেমন নিমেষে উবে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল, পদ্ম তোকে আজ মারবে।

—মারবে কেন?

—তুই একা একা অন্ধকারে চলে এলি!

—বারে মা-তো জানে আমি পালেদের বাড়িদের লুটের বাতাসা নিতে এসেছি। এবং অনল শুনতে পেয়েছিল তখন, তুলসী মঞ্চের নিচে পাড়ার ছেলেপেলেরা জড় হয়ে গান গাইছে। ঈশ্বরের গান। সারা আকাশে বাতাসে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ শব্দ সব মালার মত গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। পদ্ম পালিয়ে এসেছে এক ফাঁকে। এবং এ-ভাবেই পদ্মের জন্য কেন জানি অনলের ভারি মায়া বেড়ে যায়। সে আর পদ্মকে একটা কথা বলতে পারেনি। অন্ধকারে ঝোপ-জঙ্গল পার হয়ে সে লণ্ঠন হাতে পদ্মকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

সুধন্য বলল, কর্তা কি ভাবতাছেন।

অনল তাকাল সুধন্যর দিকে। নদীতে নৌকা চলছে, পালে বাতাস লেগেছে। জল কেটে নৌকা আপন মর্জি মত যেন চলছে। সুধন্য বৈঠার হাতল ধরে রেখেছে। এবং চারপাশের এমন জলরাশি তাকে কেমন উন্মনা করে দিচ্ছে। সুধন্যর কথার কোনো জবাব দিল না অনল।

—এত বড় মেঘ-ডুম্বর সাপের খোলসটা দিয়ে কি হল জানেন?

অনল বলল, না।

—চর্বি সব জমা গেল কবিরাজ মশাইর বোয়ামে। ওষুধে লাগবে। ছাল শুকিয়ে বিকিয়ে গেল চোদ্দ টাকায়। কলিকাতার বাবুরা ফটাস ফটাস করে হাঁটবে। চটি জুতোর কাজে লেগে গেল খোলসটা। কি আলিসান অজগর। বলেই সুধন্য আকাশের দিকে তাকাল।

সূর্য নেমে যাচ্ছে মজুমপুরের বিলে। ডাইনে বাঁক, লাধুরচরের খালের ভেতরে নৌকা ঢুকিয়ে দিতে পারলে ঝড় তুফানে নৌকা ডুববে না। সে বলল, কর্তা সাপটার মাথায় আমি, মাঝে পাঁচ ছয় জন, লেজের দিকটায় কবিরাজের

ছাত্র নিবারণ। সাপটা মরেও মরে না। সারা গ্রাম ঘুরে অজগর দেখিয়ে পয়সা পেয়েছি। তারপর ভোজ। আপনের গিয়া অর্জুন গাছটার নিচে পেট কেটে দু-ফাঁক করে রাখা হল অজগরটাকে—আমরা ঢালিদের ছাড়াবাড়িতে খিচুড়ি লাবড়া খেলাম। পেরায় মচ্ছবের সামিল আর কী!

একটা অজগর সাপ, সুধন্য অথবা বর্ষার নদী কেমন অনলকে নানারকমের রহস্যের ভেতর নিয়ে চলে যায়। সাপটার মাথায় মণি ছিল কিনা কে জানে! সেই অজগরের মত, রাজপুত্র আর কোটালপুত্র যায় আর যায়। মাঠ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে নদী সমুদ্দুর পেরিয়ে সেই এক দেশে রাজকন্যে আছে, রাজকন্যে মাথায় সোনার কাঠি রূপার কাঠি নিয়ে ঘুমোয়। এক অজগরের নিঃশ্বাসে রাজ্যের সব শেষ। কেবল বেঁচে আছে রাজকন্যে। দীঘির পাড়ে বড় অশ্বত্থ গাছের নীচে রাজপুত্র কোটালপুত্র ঘোড়া দুটো বেঁধে রেখেছে। রাতের নিশুতি অন্ধকারে আকাশে সব নক্ষত্র জ্বলছিল। দূরে মসজিদের মিনার, পাশে নদীর জল, সামনে দীঘি আর শুধু অন্ধকারে নিরিবিলি হয়ে আছে সমস্ত পৃথিবী তখন আলোতে ঝলমল করছে সারা মাঠ আর অজগর আসছে ধেয়ে। সাত রাজার ধন এক মানিক তখন আকাশের নিচে জ্বলে। অজগরটা এসেই তখন ঘোড়া দুটো আস্ত গিলতে আরম্ভ করেছে। কি করে কি করে—সেই রাজপুত্র চুপিসাড়ে এসে ঘোড়ার মলমূত্রে ঢেকে দিল সাত রাজার ধন এক মানিক! অজগরটা অন্ধকারে আর দেখতে পেল না কিছু। দাপাদাপি করে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মরে পড়ে থাকল।

কে জানে নীল নিজেই ছিল কিনা সেই রাজপুত্র! এমন একটা অজগরের গল্প সে যে কতবার শুনেছে। আর মনে হয়েছে তরবারি হাতে সে তখন দীঘির জলে নেমে যাচ্ছে। মানিকের আলোয় দীঘির ভেতর এক সিঁড়ি তার অন্ধকারে রাস্তা। সে আর কোটালপুত্র। কেবল পাতালে নেমে যাচ্ছে সেই রাজকন্যে উদ্ধার করতে।

সে বলল, সুধন্যদা অজগরের মাথায় মণি থাকে না?

—থাকে, কখনও থাকে। কখনও থাকে না।

ওর বলতে ইচ্ছে হল তুমি খুব বোকা সুধন্যদা, সাপটার মাথা যখন তোমার জিম্মায় ছিল, তখন মুখ টিপে ওর গলা থেকে উগলে আনতে পারতে মানিকটা। অজগর মরে গেলে শরীরের ভেতর তার সাত রাজার ধন এক মানিক গলে যায়, রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। তুমি হাতের কাছে এমন সুযোগ পেয়ে জীবনটা নষ্ট করে দিলে।

তারপরই কেমন সে দেখে ফেলল পদ্মর মুখ। গাছের নিচে পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে। আর অনেক দূরে বাতাসের ভেতর ঝিলমিল করে ভাসছে আর একটা

মুখ। মিলি যেন জানালায় পাতলা সাটিনের ফ্রক গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, সুধন্যদা আকাশে মেঘ। ভারি বৃষ্টি নামবে।

সুধন্য বলল, খালে ঢুকে গেলে কোথাও পাড়ে ঘরটর পেয়ে যাব। শরতের বৃষ্টি আসে যায়। থাকে না। তখন নৌকা ছেড়ে দেব।

ক্রমে আকাশের মেঘ আরো ঘোলা হয়ে উঠছে। অন্ধকার আকাশের নিচে বোঝা যায় না কত বেলা, সূর্য ডুবতে কত দেরি। এতক্ষণ পালে বাতাস ছিল, তাও এখন নেই। চারপাশটা থমথম করছে। গাছের পাতা নড়ছে না। নদীর জল শান্ত। দুটো একটা ডিঙি বাদে চারপাশে আর কিছু চোখে পড়ছে না। ঝড়ের আভাস পেয়ে যে যার ঘরে ফিরে গেছে।

কড়কড় করে বিদ্যুৎ চমকাল। এদিক ওদিক বজ্রপাতের শব্দ। খালের মুখে দনদির হাট। হাটবার হলে চারপাশটা নৌকা গাদাগাদি করে থাকত। সুধন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে নদী থেকে নৌকা খালে ঢুকিয়ে দিতে। জলে ওর জামা কাপড় ভিজে গেছে। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে সুধন্য। ওর হাতের পেশী ফুলে উঠেছে। এবং চারপাশটা দেখে কেমন সামান্য আতঙ্কিত সুধন্য। একটা কথা বলছে না।

অনল বলল, ঝড় এসে গেল সুধন্যদা।

মেঘেরা তখন মাথার ওপর আরও নেমে এসেছে। যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন আকাশ। অনল, কী করবে বুঝতে পারছে না। হাটের চালাঘর, পাটের গুদাম, কিছু তাল আনারসের নৌকা এবার দেখতে পেল অনল। কোনরকমে পাড়ে তখন শুধু ভিড়িয়ে দেওয়া। ছোট নৌকা বলে, প্রায় কোনো জলযানের মত নৌকা চালাচ্ছে সুধন্যদা। আবার বজ্রপাতের শব্দ। যেন মাথার ওপর এসে আকাশটা ভেঙে পড়ল। সুধন্য লগি মাথায় বসে পড়েছিল। অনল একেবারে নুয়ে গেছিল মাচানে। বিদ্যুতের মালা গাছের শিকড়-বাকড়ের মত ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে।

আর আশ্চর্য ঝড়ো হাওয়া সহসা কোত্থেকে নেমে এল এবং কোনো রকমে সেই ঝড়ে ফের পাল তুলে সুধন্যদা কেমন মারমুখো হয়ে গেল, অতিকায় এক দানবের মত সে দাঁড়িয়ে আছে পালের দড়ি বেঁধে। যে কোনো সময় ওকে অথবা অনলকে উড়িয়ে নিতে পারে। কিন্তু অনল বুঝতে পারে, ঝড়ো হাওয়াটা ভারি অনুকূলে তাদের। প্রায় একটা সামান্য খড়কুটোর মত নৌকাটাকে নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিল বাঁশের সাঁকোটার পাশে। কাঠের পাটাতন এদিক ওদিক ভেসে গেল। ভারি ঠাণ্ডা বাতাস, আর শিলাবৃষ্টি। বড় বড় পাথরের মত সব বরফের টুকরো অবিরাম একটা দুটো করে পড়ছে। ওরা দৌড়াচ্ছে। নৌকা টেনে পাড়ে তুলে ওরা দৌড়াচ্ছে, সুধন্য অনলের পুঁটুলি হাতে নিয়ে প্রায় রক্ষাকারী মানুষের মত অনলকে বলছে—কর্তা ছোটেন। খালি মাঠে পড়ে থাকলে আমরা মরে যাব। আকাশ থেকে ভগমান সব পাথর ছুঁড়ছে।

ছয়

মিলি দেখল তখন ঘোড়াটা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ির দিকে আসছে। জানালা দরজা সব বন্ধ। সে দক্ষিণের জানালা খোলা রেখেছে। বাবা রুগী বাড়ি বের হয়েছে সকালে। দু-চারদিন কী মাস বাবা বাইরে বাইরে ঘুরবে। নৌকায় আছে রহমান মিঞা, ছোট পানসি নৌকা। পাটাতন লম্বা। বর্ষার আগে রং করা হয়েছে। ছইয়ে কারুকাজ করা বাঘ হাতির ছবি। সঙ্গে রান্নাবান্না করবে বলে হরদয়াল গেছে। বাবার ফিরতে দু-চারদিন কী মাস হয়ে যাবে। নৌকায় নানারকমের বোয়েম, কাচের জার এবং সব লাল নীল রংয়ের বড়ি—বাবা ঘাটে ঘাটে গাঁয়ে গাঁয়ে ওষুধ ফিরি করতে বের হয়ে গেল। আর বাড়িতে এখন আছে শুধু নিবারণ, সেই তখন সব বাবার হয়ে ওষুধপত্র দেবে।

ঘোড়াটা দেখাশোনার জন্য আছে করিম চকিদার। রাতে সে গাঁ-গঞ্জও পাহারা দেয়। দিনমানে ঘোড়া দেখা, ঘাস কাটা ঘোড়ার জন্য, আর মার আজ্ঞাবহ দাস করিম চকিদার। নীল রংয়ের ডাকবাকসে বাবার চিঠি আসবে কাল পরশু। চিঠিতে ঝড়বৃষ্টির কথা থাকবে।

এবং আকাশ থেকে তখন সাদা ফুলের মত সব বরফের ছোট বড় টুকরো নেমে আসছে। ফুলের পাপড়ির মত উড়ে এসে পড়ছে। আকাশ কী অন্ধকার আর কালো। গাছের ডালপালা সব প্রায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে যেন। সোঁ সোঁ বাতাসের গর্জন, কখনও ঝাপটা মেরে দরজা জানালা ভেঙে দিতে চাইছে। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে চিঁহি চিঁহি করে ডাকছিল। ঘোড়াটার পা বাঁধা বলে ছুটতে পারছে না। ঠিক অর্জুন গাছের নিচে এসে কী করবে ঘোড়াটা ভেবে পাচ্ছে না। শিলা-বৃষ্টির জন্য হতে পারে। সে ডাকল, আলো। এদিকে।

ঝড়ের দাপটে কিছু শোনা যাচ্ছে না, সে ছুটে বের হয়ে গেল। দুটো একটা শিল এসে পড়ছে। সে যেতে যেতে দুটো একটা শিল ঠিক যেন খৈ ফুটে ছড়িয়ে পড়ছে, ঘাসে, সবুজ ঘাসে, মনোরম লাগছিল—তবু মিলি এক দণ্ড দাঁড়াতে পারল না। মা ভেতরে, নিবারণদা তার শেকড়-বাকড় হামানদিস্তা, এবং সব গাছ-গাছালি যা রোদে শুকোচ্ছিল, সব তুলে নেবার জন্য ছোটাছুটি করছে। আর মিলি তখন দৌড়ে ঘোড়াটার পা থেকে দড়ি খুলে একেবারে সোজা বারান্দায় উঠে দেখল, শিলগুলো আরও সব অতিকায় হয়ে যাচ্ছে। ঘাসের ভেতর তারা সব জমা হয়ে কেমন ক্রমে বরফের বল হয়ে যাচ্ছে।

ক্রমে ঘন অন্ধকারের ভেতর গাছপালা, মাঠ অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকল। ডিসপেনসারি ঘরে লণ্ঠনের আলো জ্বেলে বসে আছে নিবারণদা। মুষলধারে বৃষ্টিপাত আর ঝড়, লণ্ঠনের আলোতে কেমন মায়াবী এক জগত—মিলি চুপচাপ

টেবিলে বসে আছে—বই-এর পাতা ওল্টাচ্ছে। ওর পড়তে ভাল লাগছিল না। নীলদা নৌকায়, পদ্মকে সে দেখেছে বিকেলে কেমন মনমরা। নীলদা না ফিরলে পদ্ম আর হাসবে না। আর এ ভাবে তারও কেন জানি মনে হয় নীলদা কেন যে বাড়ি গেল! পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরে নীলদাকে নিয়ে যে কত কিছু করবে ভেবেছিল! এখনতো বর্ষাকাল, ঘোড়াটা ছাড়া বাড়িতে থাকে, বাবা বাড়ি নেই, বিকেল হলে সে নীলদাকে ঘোড়ায় চড়া শেখাতে পারত।

এই সব গ্রাম-মাঠের ওপর দিয়ে তখন শরতের মেঘেরা ভেসে যাচ্ছিল। ক্রমে শিলাবৃষ্টি কমে আসছে। সবুজ সব গাছপালা আর মাঠের ওপরে আশ্চর্য নিভৃত আকাশ। আর বৃষ্টিপাতের শব্দ। সুধন্য বলল, বাঁচা গেল।

চুপচাপ মুখ গুঁজে অনল বসে রয়েছে। ওর জামা প্যান্ট শুকাচ্ছে দড়িতে। সে একটা কাপড় পরেছে। চাদর গায়ে দিয়েছে। চালের গুদাম। ফুরফুর করে গন্ধ বের হচ্ছে সেদ্ধ ভাতের। গলায় কণ্ঠি পরে আছে শিরিস মাঝি। ঝড়ে পড়ে আশ্রয় নিয়েছে।

নদীতে থাকলে নৌকা ডুবি হত—এবং ঠাণ্ডা আর শিলাবৃষ্টিতে ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। টিনের চাল, শিলাবৃষ্টিতে ঝম ঝম শব্দ, বাইরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেও সুধন্য সাড়া পাচ্ছিল না। বড় বড় সেই পাথরের মত আকাশ থেকে সাদা বরফের বল উড়ে এসে পড়ছে। মাথায় একটা পড়লেই সংজ্ঞা হারাবে তারা। এবং শেষে সুধন্য জোরে প্রায় যত জোরে সম্ভব দরজা ভেঙে দেবার মত হামলে পড়েছিল।

শিরিস মাঝি দরজা খুলে হাঁ। ঝড়ে পড়ে কারা আশ্রয় চাইছে। শীতে চোখ-মুখ সাদা, অপরিচিত দুজন মানুষ। এবং সব খবর পেয়ে বলল, রাতে আর যেয়ে দরকার নেই। দুটো ডাল ভাত সেদ্ধ, কর্তা সব করে দিচ্ছি, আপনি নেড়ে নামাবেন শুধু। বামুনের ছেলে, কিসে কী দোষ ঘটে যায় প্রায় পরম গুরুদেবের মত নীলুর জন্য রান্না। বেশ রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছিল নীলুর। আলু সেদ্ধ, ডিম সেদ্ধ আর ঘি। কাঁচা লঙ্কা গাছ থেকে তুলে এনেছিল শিরিস মাঝি। ঝমঝম বৃষ্টিপাতের শব্দের ভেতর নীল আসনপিঁড়ি করে খেতে বসেছিল। ওর গলায় সাদা পৈতে। যজ্ঞোপবীতের মত পবিত্রতা ওর মুখে। শিরিস মাঝি বুড়ো মানুষ, ধার্মিক, করজোড়ে বসেছিল হাত পেতে। একটু পেসাদ রাখবেন কর্তা। পাতে বসে খাব।

নীল ফিক করে হেসে দিয়েছিল।

শিরিস মাঝি বলল, কর্তা ছোট সাপও সাপ বড় সাপও সাপ।

সুধন্য দূরে বসেছিল। ঝিমঝিম কখনো রিনরিন শব্দে বৃষ্টিপাতের ধারা নেমে

আসছে। দরজা বন্ধ। একবার সুধন্য দরজা খুলে আকাশের অবস্থা কেমন, ঝড় বাদলে ক্ষয়-ক্ষতি কিছু যদি হয়ে থাকে, অথবা সাঁকোর নিচে নৌকার হাল তবিয়ত কেমন দেখার বাসনা হলে, তার মনে হল, ঝড়ের দাপট কমেছে। লণ্ঠন হাতে তবু যাওয়া যাবে না। বাতাসে নিভে যাবে। প্যাচপ্যাচে কাদা ভেঙে ওর আর বের হতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে দরজা বন্ধ করে ফের নীলু কর্তার খাওয়া দেখতে থাকল। নীলু কর্তা কেমন লজ্জা করে খাচ্ছে। লণ্ঠনের আলোতে নীলুকর্তার মুখ ভারি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

তখন পদ্মর ঘুম আসছিল না। ঝড় বাদলে নৌকাডুবির ভয়। মা পাশে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ঠাণ্ডায় সব নিঝুম। পদ্মর শীত শীত করছিল। সে পায়ের কাছ থেকে চাদর টেনে নিল। তারপর জানালা সামান্য খুলে আকাশ দেখতে থাকল। কোথায় কি ভাবে নীলদা আছে, এমন একটা ঝড়-তুফান এসময়ে হবে সে ভাবতেই পারে না। ভেতরে কেমন বুক ঠেলে কান্না আসছিল। সে বসে থাকল জানালার পাশে। একটা দুটো নক্ষত্র যদি কোথাও দেখা যায়। গাছের ডালপাতা ছায়ার মত দুলছে। সে ঈশ্বরের কাছে নীলদার জন্য প্রার্থনা করছিল। কখনও সে মিথ্যে কথা বলবে না, সে রোজ সকালে উঠে ঠাকুর প্রণাম করবে—ফুল তুলে রাখবে এবং ভীষণ ভক্তিমতী হয়ে যাবে—এ সব বলছিল।

সকালে ছোট দাদু দেখলেন, পদ্ম শেফালি গাছের নীচে বসে ফুলের মালা গাঁথছে। মেয়েটার ভীষণ দেবদ্বিজে ভক্তি। কেউ ওঠেনি, বৃষ্টিতে উঠোন ভেজা, ফুলগুলি কাদা মাখা, পদ্ম একটা একটা, ফুল আল্গা করে তুলে তুলে নিচ্ছে আর চুপচাপ কোনোদিকে তার দৃকপাত নেই—মালা গেঁথে যাচ্ছে।

ছোট দাদু গোয়ালের দিকে যাচ্ছিলেন।

এদিক ওদিক ভাঙা ডাল, পাতা, উঠোনময়। কুয়োতলাতে বড় একটা কদমের ডাল ভেঙে পড়েছে। ঘাঠের কাছে একটা পিটকিলা গাছ শেকড়সুদ্ধ উল্টে পড়েছে। চারপাশে ঝড়ের দাপটের চিহ্ন। আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নেই। পদ্ম মালা গেঁথে কুয়োর জলে ধুয়ে রাখল তখন সাজিতে। আর যা ফুল আছে, গাছে গাছে সে অন্বেষণ করে বেড়াল। একটা ফুলও আর গাছে রাখল না। সে সব ফুল নীলদার নামে ঈশ্বরের পায়ের দেবার জন্য ঠাকুর ঘরে বড় সাজিতে তুলে রাখল। তাকে ভারি বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। সকাল থেকেই সে কেমন অন্যমনস্ক। একটা কথা বলছে না। সে কথা বলতে গেলেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলবে বুঝি।

সারাটা দিন পদ্ম বারবার ঘাটে দৌড়ে গেছে। সামনে মাঠ, দক্ষিণের বাড়ির খাল ধরে সুধন্যদা ফিরবে। নৌকার কাঠে লগির শব্দ হয়। কোনো নৌকা দূরে

দেখতে পেলেই সে দাঁড়িয়ে থাকে। নৌকা চলে যায়। ঘাটে ভিড়ে না। সুধন্যদা দুপুরে এল না। বিকেলে মিলি এসেছিল, সে অনেকক্ষণ মিলির সঙ্গে বসেছিল ছাড়াবাড়িতে। ঘোড়াটার ঘাস খাওয়া দেখছিল। তার কিছু ভাল লাগছিল না। নীলদার চোখ, সহজ সরল স্বভাব পদ্মকে কেমন আশ্চর্য এক মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে। কেউ ওর কষ্টটা বুঝতে পারে না।

মিলি বলল, পদ্ম তোর নীলদা খুব বোকা।

পদ্ম বলল, সুধন্যদা এখনও এল না। কি যে হবে না!

—কেন কি হয়েছে?

—কি ঝড় গেল!

—সুধন্যদা আছে ভয় কি!

—নদীতে থাকলে।

—ও ঠিক এসে যাবে।

মিলি বলল, নীলদা এলে একদিন আমরা ঘোড়াটা নিয়ে আস্তানা সাবের দরগায় যাব।

—আমাকে নিবি না। পদ্ম কেমন মিনতি জানাল।

—নেব। নীলদাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে যাব।

—কোথায় যাবি।

—যেদিকে চোখ যায়।

পদ্ম বলল, নীলদা যাবে না।

—কেন?

—না যাবে না। নীলদাকে এলে বলব তুমি যাবে না। এবং এ ভাবে কেন যে মিলি তার প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। মিলির বাবা ওষুধ ফিরি করতে গেছে। না হলে যেন সে গিয়ে বলত, কবিরাজ কাকা মিলি বলেছে দাদাকে নিয়ে কোথায় চলে যাবে!

মিলি বলল, তোর নীলদা ভাল না। আমাকে কী সব বলে।

—নীলদা কি বলে তোকে!

—তোকে বলা যাবে না। খারাপ কথা। কত সহজে মিলি কথাটা বলে ফেলল। পদ্মের ভেতরটা কেমন হাহাকার করছে। খারাপ কথা কী হতে পারে পদ্মর বুঝতে কষ্ট হয় না। পদ্ম আর এক দণ্ড বসেনি। সে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল। নীলদা এমন একটা খারাপ কাজ করতে পারে ভেবে সে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে আর ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল না। সে ঘরে ঢুকে চুপচাপ শুয়ে থাকল।

ফুলু পিসি অবেলায় শুয়ে থাকতে দেখে বলল, কিরে তোর শরীর খারাপ?

পদ্ম বলল, না।

—তবে শুয়ে আছিস কেন?

পদ্ম জবাব দিল না।

মা এসে বলল, কিরে পদ্ম, বলে কপালে হাত রাখল।

পদ্ম একটা কথা বলছে না। অপলক তাকিয়ে আছে জানালায়।

—তোর কি হয়েছে?

সে কিছু বলছে না।

—অবেলায় শুয়ে থাকতে নেই। ওঠ।

সে কোনো সাড়া দিল না। বালিশে মুখ গুঁজে দিল।

মা কেমন ক্ষেপে গেল তার। —কি হয়েছে তোর? সে জানে মেয়েটার ভারি নিজের দুঃখ লুকিয়ে রাখার স্বভাব। হাত পা বাড়ন্ত। চুল এখন বিনুনি করে বাঁধলে বেশ বড় দেখায়। এ বয়সেতো মা মাসীদের তখনকার দিনে বিয়ে হয়ে যেত। মেয়েটার স্বভাব মিষ্টি বলে সে ক্ষেপে গিয়েও কিছু করতে পারে না। পাশে বসে বলল, কোথাও ব্যথাটেথা হচ্ছে। মেয়েরা এ-সময়ে ব্যথা-টেথা হলে লুকিয়ে যায়।

পদ্ম বালিশে তেমনি মুখ লুকিয়ে রেখেছে। ওর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছিল।

—বলবি তো কি হয়েছে?

—কিছু হয়নি।

—কেউ মেরেছে?

—না।

—ঝগড়া করেছিস কারো সঙ্গে?

—না।

—মানু মেরেছে।

—না না।

—নীল তোর কিছু নিয়ে গেছে।

—না না না! বলে সে উঠে বসল। বলল, নীলদা মা আমার কি নিয়ে যাবে! তুমি কেবল কেন মা নীলদাকে এমন ভাবো। নীলদার তো কিছু চুরি করে নেবার স্বভাব না। বলে সে তার উদগত অশ্রু আর সামলাতে পারল না। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। আর তখনই মনে হল সুধন্য হাঁক পাড়ছে—সুধন্যদা এসে গেছে। পদ্ম প্রায় পাগলের মত ছুটে ঘাটে চলে গেল। বলল, তোমাদের কিছু হয়নি তো সুধন্যদা।

—কি হবে! ঝড়ের সময় শিরিস মাঝির চালের গুদামে ছিলাম! কি মজা!

পদ্ম দেখল ঠাকুমা আসছে। ছোট-দাদু গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। পদ্ম মনে মনে বলল, নীলদা তুমি ভাল না। ফিরে এলে কথা বলব না। তারপর পদ্ম কেমন গাছপালার নিবিড় সুষমার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। আর দেখা গেল না। নীলদা তার মত পৃথিবীর সব কিছু রহস্য তবে ক্রমে জেনে ফেলছে।

সাত

হেমন্তকাল এসে গেল। অনল হেমন্তকালের মাঝামাঝি সময় ফিরে এল। বর্ষার জল আর মাঠে নেই। তবু বিলেন জমিতে কাদা জল, কাদা জল ভেঙে ধানের মাঠ পার হয়ে অনল হেমন্তের মাঝামাঝি সময়ে একাই চলে এল। লাধুরচর পর্যন্ত সে এসেছিল সেকেন্দারের সঙ্গে। বাবা সেকেন্দারকে বলে দিয়েছে, গরিপরদির পুল পর্যন্ত এগিয়ে দিবি। তারপর নীল তুমি আশা করি একাই যেতে পারবে। তুমি তো বড় হয়ে গেলে।

অনল ঠিক বুঝতে পারে না সে কতটা বড় হয়েছে। তবু মা যখন সাত-আট মাস পরে দেখলেন—একেবারে হাঁ। এবং ছেলের দিকে এভাবে তাকাতে তার বুঝি ভয় ছিল। চোখ লেগে যেতে পারে—কীসে কী হয় কে জানে। পাড়ার যমুনা পিসি বলেছিল—অমা, নীলতো তোমার বউ বড় হয়ে গেছে। নীল আয়নায় মুখ দেখেছিল। যেখানে যখন প্রথম দেখা হয়েছে গাঁয়ের কারো সঙ্গে, তুই নীল না। চিনতে পারা যায় না। নীল বুঝতে পেরেছিল, ওর প্যান্ট খাটো মাপের হয়ে যাচ্ছে। ছোট দাদু দুটো প্যান্ট দুটো জামা ফের বানিয়ে দিয়েছেন।

আর শরীরের ভেতর সেই সব দৃশ্যাবলী, সে অবাক হয়নি, তার তো ক্রমে জানা হয়ে গেছে কী সব নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তাকে হতে হবে। অবনী তাকে মাঝে মাঝে তালিম দিত। সে ভয় পেয়ে গেলেই বলত, অবনী আমার কী সব হয়।

এবং মাঝে মাঝে মনে হতে থাকে তার, আসলে পদ্ম পাশাপাশি আছে বলে সে সহজে বড় হয়ে যেতে পারছে। পদ্ম কাছে না থাকলে সে আরও কিছুদিন ছোট থেকে যেতে পারত। এবং মা অথবা পাড়াপড়শিরা দেখে অবাক হত না, নীল না? চেনা যায় না। বাবা তাকে দিতে এবারও তবে সঙ্গে আসতেন।

পরীক্ষার সময় বলে সে আর বেশি ভাবতে পারে না। সে ফিরে এসে লক্ষ্যই করেনি পদ্ম আর তার সঙ্গে তেমনভাবে কথা বলছে না। কেমন তাকে এড়িয়ে চলছে।

মানুদা তার ঘরে পড়ে। পদ্ম পড়ে বারান্দায় তক্তপোশে। পদ্মর জন্য আসে

গগন পণ্ডিত। পদ্মকে অঙ্ক ভূগোল শেখায়। মানুদা খুব গলা ছেড়ে পড়ে। ঠিক নিবারণদার হামানদিস্তার মত তার গলার আওয়াজ অনেক দূর থেকে শোনা যায়। ছোট দাদু রোজ আর বাজারে যেতে পারেন না। অসুখ-বিসুখ হলে নীল ঠাকুর ঘরের ভার পায়। ছোট দাদু দরজায় বসে থাকেন। সে সেদিন আর প্রায় পড়তেই পায় না। মানুদা মাছ না হলে খেতে পারে না।

হেমন্তের সময়ে তাকে পুবপাড়ার বাজারে বেশ ছুটে যেতে হয়। বাজার আর ঠাকুর পুজো দুটো যেদিন থাকে সে আর একদণ্ড পড়তে পায় না।

যেন ধীরে ধীরে সংসারের যাবতীয় কাজ তাকে দিয়ে করানো হচ্ছে। এবং সে পুজোর ঘরে বসে থাকলে বুঝতে পারে ছোট দাদুর চোখ ঘোলা ঘোলা, তিনি একে একে যেমন পঞ্চদেবতার পুজোর কথা বলেন, তেমনি গণেশের পুজোর সময় বলেন, ধ্যান করলে না—এবং মাঝে মাঝে সব কেমন ভুলে যান, অনল তখন নিজেই উচ্চারণ করে ধীরে ধীরে বলে যায়—ওম পাশাক্ষমালিকাম্ভুজ... এসব মন্ত্র সে ক্রমে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। ছোট দাদু কেমন তখন কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

এভাবে একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখল, পদ্ম ছাড়াবাড়িতে একটা বড় টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্ম পরেছে ছিটের ফ্রক। পদ্ম হাতের ইশারায় তাকে ডাকছে। ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর পদ্মর কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। পদ্ম ওখানে কী করছে সে বুঝতে পারছে না।

সে একা। শীতের সময়। স্কুলের ছুটি কিছু আগে হয়েছে। শীতের দিনে স্কুল থেকে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। সে বলল, যাই।

চারপাশে এখন যব গমের ক্ষেত। সে যব গমের ক্ষেতে নেমে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাবার মত খালপাড়ে উঠে ডাকল, পদ্ম।

পদ্ম বলল, এখানে।

অনল ঝোপ-জঙ্গল অতিক্রম করে ঢুকে গেলে দেখল, পদ্ম ফ্রকের নিচ থেকে কী সব বের করছে। পদ্ম বলল, খাও।

পদ্ম নীলদাকে কতদিন কিছু খেতে দেয়নি। বাড়ির সব ভাল খাবার সবাই পায়। কেবল নীলদার জন্য অন্য নিয়ম সংসারে। পদ্মর রাগটা পড়েনি। এই শীতকাল পর্যন্ত সে রাগটা পুষে রেখেছিল।

বাড়িতে পিঠে হতেই সে আর ঠিক থাকতে পারছে না। সে বলতেও পারছে না তুমি মিলিকে কি বলেছ নীলদা, যতবার ভেবেছে বলবে ততবার সে কেমন গুটিয়ে গেছে। এবং নীলদা ক্রমে কেমন আরও দূরে সরে যাচ্ছিল। সন্ধ্যায় লণ্ঠন জ্বেলে নীলদার ঘরে রেখে এলে একটা কথাও প্রায় হত না। নীলদা এমনিতেই

মুখচোরা স্বভাবের মানুষ।

সংসারে নীলদার ওপর ক্রমে যত অত্যাচার বেড়ে যেতে থাকল—পদ্ম কেবল বুঝতে পারে তত নীলদার হাত থেকে তার পড়ার সময় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ছোটদাদু কেমন সব জোর হারিয়ে ফেলছেন—তিনি আর আগের মত মাকে কিছু বলতে সাহস পান না।

এতদূর যাওয়া আসার একটা ধকল থাকে। তবু নীলদাকে দেখলে বোঝাই যায় না ভেতরে খুব কষ্ট তার। সে অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। খিদেয় চোখ-মুখ কাতর। তুব কেমন পদ্মর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। আর নীল দেখল চার-পাঁচটা পাটি- সাপটা কলাপাতায় জড়ানো। বাড়িতে তবে আজ পিঠে পায়েস হচ্ছে। ক্ষিরের পুলি ভেতরে। সে তাড়াতাড়ি খেতে খেতে বলল, কেউ দেখে ফেললে পদ্ম!

—কেউ দেখবে না। তুমি খাও তো।

প্রায় গব গব করে খেয়ে ফেলল নীল। ক্ষিদে কী পরিমাণ ওর খাওয়া না দেখলে বোঝা যাবে না। তবু পদ্ম ভেবেছিল, নীলদা সবটা খাবে না। কিছু রেখে অন্তত বলবে, তুই খা পদ্ম। ওকে কিছুটা দেবে।

নীল বলল, যা সবটাই খেয়ে ফেললাম।

পদ্ম বলল, নীলদা মিলি তোমাকে বলেছে ঘোড়ায় চড়া শেখাবে।

—মিলি এসেছে?

—পুজোয় এসেছিল।

—মিলি আবার কবে আসবে?

—জানি না। একটু থেমে পদ্ম কী ভাবল। তারপর সহসা মুখ ভার করে বড়দের মত বলল—তুমি কিন্তু নীলদা যাবে না।

—কোথায়?

—মিলির কাছে।

নীল বুঝতে পারছে পদ্মও তার মত বড় হয়ে যাচ্ছে। ওরা তখন ঝোপ জঙ্গলের ভেতর একটা ফাঁকা জায়গায় বসে রয়েছে। চারপাশে এখন শীতের সূর্য, তার নরম আলো এবং কেমন এক-সময় নীল বলল শীত করছে রে পদ্ম। চল উঠি।

পদ্ম বলল, আর একটু বোস না।

—তোকে কেউ খুঁজে বেড়ালে কি হবে?

—কেউ খুঁজবে না। তুমি বোস।

শীতকালের আকাশ ভারি হাল্কা। কবুতরের পাখার মত নরম শীত নেমে

আসছে পৃথিবীতে। মাথার ওপরে কত সব গাছপালা। দূরের মাঠ আকাশ সব দেখা যাচ্ছে। শেষ বেলার রোদ গাছের ডালে পাতায়। নীল উবু হয়ে বসে আছে। পদ্ম বলল, ভাল করে বোস না। কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।

পদ্ম কী চায় সে বুঝতে পারে না। ভেতরে একটা দুঃখ উঁকি মারে। লজ্জায় কেমন রাঙা হয়ে ওঠে ওর মুখ। পদ্ম ফ্রক টেনে বসেছে। তুব পা এবং উরুর অনেকটা দেখা যাচ্ছে। সাদা মোমের মত পবিত্রতা ওর সারা শরীরে।

পদ্মর চুলে ভারি মনোরম গন্ধ। চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। কপালে কিছুটা চুল উড়ে এসে পড়েছে। ফ্রকে নানারকম ফুল ফল আঁকা। এবং পদ্মর সারা শরীরে এক অদ্ভুত রহস্য। সে সেটা টের পেলেই কেমন ভয়ে আঁৎকে ওঠে—এই পদ্ম, আর কতক্ষণ বসে থাকব?

—তুমি বসো নীলদা। তোমার ভাল লাগছে না!

—ভয় করছে যে।

—তুমি খুব ভীতু।

পদ্ম আর কথা বলে না। দু হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসে থাকে। পদ্ম বোধহয় তাকে কিছু বলতে চায়। এমন সুন্দর একটা আকাশ আর গাছপালার নিচে পদ্ম তাকে কি বলবে—এবং পদ্ম কিছু না বললেও সেও কিছু করতে পারে না। ওর বুকের ভেতর কেমন করছে। শরীরে জ্বর জ্বর ভাব। কান গরম হয়ে যাচ্ছে। সে পা ছড়িয়ে বসতে পারছে না। তবু এই নিরিবিল ঝোপ জঙ্গলের ভেতর সে টের পায় পদ্মর ভেতর একটা গোপন দুঃখ আছে। তার গোপন দুঃখের সঙ্গে ওর দুঃখটার বোধ হয় ভারি একটা মিল। সে ডাকল, পদ্ম।

পদ্ম মাথা তুলল না। শুধু বলল, হুঁ।

—তোর কোনো কষ্ট হচ্ছে?

পদ্ম কিছু বলল না।

পদ্মের সারা শরীর কাঁপছে।

—এই পদ্ম কিছু বলবি তো।

পদ্ম বলল, নীলদা তুমি ভাল না।

নীল বলল, আমিতো কিছু করিনি পদ্ম।

—মিলিকে তুমি কি বলেছ?

—মিলিকে কিছু তো বলিনি।

—কিছু বলনি?

—না।

—এই কিছু খারাপ কথা।

নীল মনে করার চেষ্টা করল। ওকে আমি খারাপ কথা বলব কেন?

—মিলি যে বলল।

—কি বলেছে?

—বলেছে, তুমি ওকে কি খারাপ কথা বলেছ!

—পদ্ম তোকে ছুঁয়ে বলছি, ওকে কোনো খারাপ কথা বলিনি।

—তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে না।

নীল বলল, পদ্ম কথা বললে কি হবে?

—ও ভাল মেয়ে না। ও অনেক কিছু জানে।

—ও কি জানে?

—ও যা জানে, তুমি এখনও তা জান না।

নীল দেখল দূরে তখন নীল আকাশ আর নীল থাকছে না। আকাশ লাল হয়ে উঠছে। গাছ পাতার ফাঁকে পৃথিবীর এই সময়টুকু দুজনকে কেমন রঙীন ছবির মত করে রেখেছে। পদ্ম কিছুতেই নীলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

সে ডাকল, এই পদ্ম চল এবারে উঠি।

—আমাকে তোমার ভাল লাগে না, না নীলদা?

—আমি তা বলেছি!

—তবে উঠি উঠি করছ কেন?

—কতক্ষণ বসে থাকব!

—ঠিক জানি না নীলদা, তুমি পাশে বসে থাকলে আমার খুব ভাল লাগে।

—আমারও।

—সত্যি বলছ!

নীল বলল, সত্যি। সত্যি ভাল লাগে পদ্ম। একটুকু বানিয়ে বলছি না। সে তার বই খাতা আবার হাতে তুলে নিল। আর বসে থাকা ঠিক না। পদ্মর ভারি সাহস। সে প্রায় এ-শীতেও ভয়ে কেমন ঘেমে উঠছে।

পদ্ম বলল, যাবে?

—কোথায়?

—এই কোথাও।

নীল সহসা কী ভেবে বলে ফেলল, যাব।

এবং এভাবে নীলকে এই কোথাও কেউ এখন নিয়ে যেতে চায়। সেও যেতে চায় কোথাও—সেটা কতদূরে, সেটা কী ভাবে, কোন এক রহস্যময় পৃথিবীতে সে সঠিক কিছু জানে না। যখন পদ্ম অথবা মিলি থাকে পাশে, এক অপার আনন্দ এই সব ঘাসে ফুলে অথবা সবুজ বনভূমিতে খেলা করে বেড়াতে থাকে। কেবলই

মনে হয় কেউ হাত ধরে নিয়ে যাবে সেখানে, বলবে নীল, তুমি স্বপ্ন দ্যাখো না?

হ্যাঁ দেখি।

আমাকে দ্যাখো না।

দেখি।

আর কী দ্যাখো!

আরো কী সব যে দেখে ফেলি পদ্ম।

বলনা কী দ্যাখো?

যা! বলা যায় বুঝি!

বলনা, কাউকে বলব না।

আমি যে কী সব দেখি পদ্ম!

সবাই দেখে।

তুইও দেখিস পদ্ম?

না দেখলে বড় হব কি করে?

দেখলে বুঝি বড় হওয়া যায়!

দেখলে সুন্দর হওয়া যায়। নিজেকে ভারি ভালবাসতে ইচ্ছে করে নীলদা। সুন্দর ভাবে ফুটে উঠতে ইচ্ছে করে। আমার যা কিছু আছে সব পুষ্ট হয়ে যায়। ফুটে উঠতে চায়। স্বপ্নে আমার কেবল ফুটে উঠতে ইচ্ছে করে।

কে জানে পৃথিবীতে এরই নাম বড় হওয়া কিনা। সে কখনও একা একা থাকলে পড়তে পড়তে কোথায় যে কখন ভেসে যায়, সে দেখতে পায় কেউ ফুটে উঠছে, সে দেখতে পায় ধরণী শান্ত, আকাশ নীল, জলপ্রপাতের শব্দ অবিরাম, তার সব কিছু সেই বড় হওয়ার জন্যে। সে যে কী পড়ছে মনে করতে পারে না তখন। দেখতে পায় বিনুনি বেঁধে একটা মেয়ে ফ্রক গায়ে দিয়ে কেবল মাঠের ওপর দৌড়াচ্ছে। সে ছুটছে তার পিছু পিছু। কিছুতেই নাগাল পাচ্ছে না। কেবল কোথায় যে সে নিয়ে যেতে চায় তাকে।

এবারে পদ্ম বলল, নীলদা চল উঠি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

নীল বলল, তুই যা।

—আমার সঙ্গে এস। আর বসে থাকতে হবে না।

—তুই যা না।

নীল আসলে এই ভর সন্ধ্যায় পদ্মর সঙ্গে ঝোপ জঙ্গল থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছে না। কোথায় যে একটা ভারি অপরাধ বোধ, কেউ যদি দেখে ফেলে, এবং কেন যে ভেতরে এমন একটা সংশয়—সে বুঝতে পারে না, কেবল মনে হয় ফুলু মাসি কোনো ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছে, একদিন ফুলুমাসি বলেছিল, তুমি খুব

পাজি হয়ে যাচ্ছ। নচ্ছার ছেলে। বড়বাবু এলে সব বলে দেব।

এবং সেদিনই সে ফিরলে দেখেছিল ফুলুমাসি বাড়ি মাথায় করে চেঁচাচ্ছে।

পদ্ম চুপিচুপি ঘরে ঢুকতেই কে পেছন থেকে চুল টেনে ধরল। আবছা অন্ধকারে সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। ঠিক দাদা। সে বলল, দাদা ছাড় বলছি।

মানু বলল, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—কেন মিলিদের বাড়ি।

—ছিলে না।

—সত্যি ছিলাম।

—আবার মিথ্যে কথা।

—ছিলামই তো।

—দেব ঠাস করে চড় বসিয়ে। বলেই চুল ধরে ঝাঁকাতে লাগলে আজ এই প্রথম পদ্ম কাঁদতে পারল না। সে অন্য সময় হলে পাড়া মাথায় করে চেঁচাত। কিন্তু ভারি আশ্চর্য এতটুকু তার কান্না আসছে না। সে ইচ্ছে করলে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে। দাদাকে জব্দ করার এর চেয়ে বড় ওষুধ আর জানা নেই। কাঁদলেই মা তেড়ে আসবে কোথাও থেকে। আর দাদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যত রাগ দুঃখ অথবা অভিমান সংসারে, দাদাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে না পারলে মার আক্রোশ কমে না। কোনো একটা ছল ছুতো চাই।

পদ্ম বলল, দাদা চুল ছাড়।

—না ছাড়ব না।

—তোর রাবণ রাজার অবস্থা হবে।

—কি বললি!

—তুই রাবণ রাজার মত ধ্বংস হবি।

মানু চুল ছেড়ে বলল, পাকা পাকা কথা!

—জানিস মেয়েদের চুল ধরে টানতে নেই।

—একেবারে পাকা বুড়ি।

ফুলুপিসির দুপুর থেকেই মাথা বিগড়ে আছে। বিয়ে না হলে এমন হয়। পদ্ম দাদার সঙ্গে কথা বলার সময় পিসির গালমন্দ শুনতে শুনতে ফিক করে হেসে দিয়েছিল। পিসির কাছে সংসারে সবাই মন্দ মানুষ। বাবা, দাদু, ঠাকুমা এবং মা। আর নীলদা বুঝি এক নম্বরের শত্রু। বিয়েতে দুটো পয়সা খরচ করলেই বর পাওয়া যায়। নীলদা এসে দাদুর কিছু পয়সা নষ্ট করছে। নীলদার জন্য পিসির বিয়েটা বুঝি আরও দেরি হয়ে গেল। একটা বাড়তি বোঝা সংসারে।

মানু তখন বলল, এতক্ষণ কোথায় তবে ছিলে?

—বললাম তো মিলিদের বাড়ি।

—মিলিকে ডেকে আনব?

—আনো না।

পদ্ম খুব সাহস দেখাচ্ছে। পদ্ম বলল, চুল ছেড়ে দে না দাদা। লাগছে।

তখনই মা হ্যারিকন হাতে ঘরে ঢুকে বলল, এই যে সুবচনী, সারা বিকেল টো টো করে বেড়িয়েছ। এবারে মা একটু পড়তে বোস।

মার কথাবার্তায় আদরের টান থাকলে, পদ্ম খুব ভালমানুষ হয়ে যায়।—মা ঠাকুর ঘরে ধূপধুনো দিয়ে আসব।

—যাও, কাপড় ছেড়ে যাবে।

মানু বলল, এক্ষুণি এল মা পদ্ম।

পদ্ম বলল, না মা, কখন এসেছি!

—কি মিথ্যে বলছে!

মা কাছে থাকায় পদ্ম কেমন সাহস পেয়ে গেল। বলল, মিথ্যে বলছিতো বেশ করেছি। এখন পদ্ম ঠিক আগের পদ্ম। মার কাছে তার ছাড়পত্র মিলে গেলে, পৃথিবীতে পদ্ম আর কাউকে ভয় করে না। সে বলল, দাদা পড়তে বোস। পিসি কিন্তু খুব বিগড়ে গেছে।

মানু বলল, নীলের কপালে আছে!

পদ্মর মুখটা সহসা ভারি ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, কি আছে দাদা?

—পিসির শাড়িটা ছিঁড়েছে। বিশে গরুটা পিসিকে ফেলে দিয়েছিল।

—নীলদার কি দোষ।

মানু বলল, জানি না। বিকেল থেকে শাসাচ্ছে। আসুক, আসুক আজকে। ঘাটে বড় জামবাটি পড়ে গেছে। পাওয়া যাচ্ছে না।

পদ্ম বলল, নীলদা কি করবে?

পিসি চিৎকার করছিল, আর কেউ স্কুল করে না। একেবারে নবাব বাদশার স্কুল। আমরা পড়িনি!

পদ্ম ধূপধুনো দিতে যাচ্ছিল। পিসির কথা শুনে আবার হেসে ফেলল। পিসির ক্লাস টু বিদ্যে। অনেক ক-বছরে পিসি ক্লাস টু বিদ্যে শেষ করেছিল—সেই পিসি পড়ার নামে পাড়া মাথায় করছে।

দাদু বাড়ি নেই। পেরি ঘোষের বাড়িতে পাশা খেলতে গেছে। পেরি ঘোষের চাকর একটু রাত হলে লণ্ঠন হাতে দাদুর সঙ্গে আসবে। দাদু বাড়ি না থাকলে পিসির সাহস বেজায় বেড়ে যায়। এবং এ-সময় নীলদা যে কোথায়! এখনও আসছে না কেন। সুধন্যাদা বাড়ি থাকলেও এত বাড় বাড়তে পারত না পিসি।

ধূপধুনো দিতে গিয়ে মনে হল পদ্মর, পাতাবাহার গাছটার আড়ালে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে এ-ভাবে কেউ আর বাড়ির কাছাকাছি এসে

দাঁড়িয়ে থাকে না। কী ভয় তার জন্য অপেক্ষা করছে—এবং কে কী-ভাবে তাকে নেবে—নীলদা ছাড়া পৃথিবীতে এ-দুঃখটা কেউ টের পায় না। সে কাছে গিয়ে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে কেন! যাও ভিতরে যাও!

—মাসি চিৎকার করছে কেনরে পদ্ম!

—বিশে গুতো মেরেছে। শাড়ি ছিঁড়েছে। ঘাটে বাসন ধুতে গিয়ে বড় জাম-বাটি জলে পড়ে গেছে।

সব ভয় টয় মুহূর্তে কেটে গেলে নীল বলল, তোকে কিছু বলেছে!

—কি বলবে!

—কেউ কিছু!

—না তো! তারপর সহসা কী মনে পড়ার মত বলল, অ দাদা বলেছে। দাদা যাই বলুক, কেউ কোনো গুরুত্ব দেয় না। দাদার নিজের হাজাররকমের ফুটো। সে কিছু বললে, সহজেই ফুটিয়ে দেওয়া যায়।

—কি বলেছে?

—বলেছে কোথায় ছিলি? বললাম, কোথায় আবার, মিলিদের বাড়িতে। তারপর পদ্ম কেমন ফিস ফিস গলায় বলল, যাও। আর দেরি করো না।

নীল কেমন এবার ব্যাজার মুখে বলল, পদ্ম তুই আমাকে আর এ-ভাবে কোথাও ডেকে নিয়ে যাস না। সত্যি খুব ভয় করে আমার।

আট

বড়দিনের ছুটিতে মিলি এল। ডলি ক-মাস হল এখানেই আছে। মানুদা বিকেল হলেই পাটকরা ধুতি পাঞ্জাবি পরে বের হয়। কাছারিবাড়িতে ফুটবল নেমেছে। বল নিয়ে যখন অবনী কানু কান্তি দৌড়ে বেড়ায়, নীলু যখন ব্যাকে দাঁড়িয়ে থাকে তখন মানুদা নিমের ডালে দাঁত ঘসে। দাঁতগুলো মানুদার এমনিতেই সুন্দর। ঝকঝকে। সারাক্ষণ এভাবে মানুদার অভ্যাস ফাঁক পেলেই দাঁত মাজা। কখনও সে মানুদাকে খেলার মাঠে দেখতে পায় না। একটা বই হাতে থাকে। ঘোড়াটা যেখানে ঘাস খায় তার থেকে একটু দূরে আলাদা গাছের ছায়ায় বসে থাকে। শীতকাল বলে গরম চাদর গায়। এবং সব সময় কেমন মানুদার চোখ নীল রঙের ডাকবাকস পার হয়ে আরও দূরে—করবী গাছটার নিচে। সেখানে মাঝে মাঝে সে দেখতে পায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে মানুদার সঙ্গে কী কথাবার্তা হয় তখন। মানুদাকে ভারি দুঃখী মানুষ মনে হয় তার।

কবিরাজ বাড়ির পাশ দিয়ে কতবার যে মানুদা হাঁটতে হাঁটতে আস্তানা সাবের দরগার দিকে চলে যায়। বিকেল হলেই এমনটা হয়। মানুদা আর ঘরে

বসে থাকতে পারে না। মনে মনে ডলির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। ডলির সুন্দর ছাপা শ্যাড়ি সে দেখতে পায় কখনও গাছের ফাঁকে। অথবা চন্দন গোটা তোলার সময় ডলি পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে বুঝি ভালবাসে। সংগোপনে কিছু একটা মানুদা আর ডলির মধ্যে হচ্ছে সে টের পেলে বলে, দাও চিঠিটা। আমি দিয়ে আসব।

—কে রে?

—আমি নীল মামীমা।

—কি খবর। পড়াশোনা করছিস তো ঠিক মত।

বাড়িটা ইঁটের। মেজেন্টা রঙের ছোপানো। নীল রঙের জানালা দরজা। ভেতরে সাদা রং ধবধবে—পালিশ করা খাট চেয়ার। সামনে খোলা শানবাঁধানো বারান্দা। বেতের চেয়ার। ফুল ফল আঁকা টেবিলের ঢাকনা। একেবারে ছিমছাম—ঘরের ভেতরে হরিণের শিং মোষের মাথা ঝোলানো। সামনে ঘাসের লন। উত্তুরে হাওয়া পড়ে গেলেই ডলি মিলি নেট ঝুলিয়ে দেবে। ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে ওরা ঘাসের ওপর ছুটবে। ডলির ফাঁপানো চুল তখন মুখে এসে পড়লে মনে হয় মেয়েটা ভীষণ ছুটতে ভালবাসে। ওদের পায়ে সাদা মোজা, সাদা কেডস। হলুদ রঙের কাচের চুড়ি ঝমঝম করে বাজে। আর হাল্কা কর্কটা বাতাসে ভেসে থাকলে দু বোনকেই মনে হয় ভিন্ন গ্রহের মানুষ তারা।

সে বলল, ডলিদি কোথায়?

—ডলি ডলি। ঘরের ভেতর থেকেই হাঁক আসে। কবিরাজদার দুটো একটা কাশির শব্দ, তিনি বোধ হয় ডিসপেনসারিতে যাচ্ছেন। তার বুক কাঁপে তখন।

ডলি তখন পেছনে এসে দাঁড়ায়। চারপাশে সন্তর্পণে, তাকিয়ে চুপি চুপি বলে দে। তারপর কেমন সেই সুন্দর মেয়েটা নিমেষে হারিয়ে যাবার আগে একটা চিঠি ওর হাতে গুঁজে বলে, সাবধান দেখিস যেন কেউ না দেখে।

এত বিশ্বাসী সে যে ওরা কেউ এ নিয়ে ভাবে না। ওরা জানে বোধহয় নীল পৃথিবীর খবর তখনও ঠিক ঠিক পায়নি। নীলের লম্বা শরীর। এবং পবিত্রতা শরীরে এখনও লেগে আছে। নীল দৌড়ে চলে গেলেই মিলি ডাকে—এই নীলদা কোথায় যাচ্ছ, আমি জানি তোমার হাতে কী ওটা।

নীল একদণ্ড আর দাঁড়ায় না। হাঁপাতে হাঁপাতে আঁটা খাম মানুদার হাতে দিয়ে বলে, নাও। মিলি টের পেয়ে গেছে।

—কি টের পেয়েছে!

—ডলিদি তোমাকে চিঠি দেয়।

—ও জানবে কি করে।

—আমাকে যে বলল হাতে কী আছে জানি।

—ধুস। এমনিতেই বলেছে। মেয়েটা বড্ড পাকা। গেছো মেয়ে।

তখন মিলি দূর থেকে ডাকে। —নীলদা যাবে?

—কোথায়।

—এই কোথাও।

ওরা যে তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়—এবং সব সময়েই যেন পদ্ম অথবা মিলি তাকে ডাকে—এই নীলদা যাবে?

—কোথায়?

এই কোথাও।

পদ্মও ডাকে—নীলদা যাবে?

—কোথায়?

—এই কোথাও।

কখনও সে পদ্মকে বলত, পদ্ম আমার ভয় করে।

কখনও সে মিলিকে বলত, মিলি আমার ভয় করে।

পদ্ম বলত, ভয়ের কি আমি তো তোমার পাশে থাকব।

মিলি বলত, ভয়ের কি আমি তো আছি।

আর মিলি এমনিভাবে একদিন ঠিক ওকে ধরে নিয়ে গেল আস্তানা সাবের দরগায়। ঘোড়াটার দড়ি খুলে দিল। সে নীলকে নিয়ে পালিয়ে আস্তানা সাবের দরগায় চলে যাচ্ছে। না গেলে যদি মিলি বলে দেয়—নীলদা ডাক হরকরার কাজ নিয়েছে। দিদির চিঠি পৌঁছে দেয়। সবাই জেনে ফেললে মানুদা ঠিক লজ্জায় আত্মহত্যা করবে। সে কিছুতেই বলতে পারল না, না মিলি আমি যাব না। পদ্ম রাগ করবে।

বসন্তকাল বলেই চারপাশে আবার পাতা সব ঝরছে। আগে মিলি, মাঝে ঘোড়া, আর বেশ পেছনে নীল। বিকেলের দিকে ঘোড়াটা এমনিতেই মিলির কথা বেশি শোনে। বিকেল হলেই মিলির স্বভাব ওর সামনের দু পা থেকে দড়ি খুলে দেবার। ওর বাবা এজন্য ওকে আগে বকাঝকা করতেন। এখন করেন না। বাবা নিজেই অবাক হয়ে দেখেন, আলো—মিলির ভারি আজ্ঞাবহ দাস। কবে যে মেয়েটা কিভাবে আলোকে নিজের করে ফেলেছে কেউ জানে না। যেমন করিম চকিদার ওর মার, তেমনি সে আলোর। আলো বিকেল হলেই আর ঘাস খায় না। লাল ইঁটের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মিলি এসে তার পা থেকে দড়ি খুলে দেবে। এবং দিলেই লেজ নেড়ে কদম দেবে, দৌড়ে যাবে কিছুটা, গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াবে। আর যখন ডাকে মিলি, চল ঘাস খাবি, ভারি বিনীত স্বভাব হয়ে যায় ঘোড়াটার। কদম দিতে দিতে চলে আসে। সামনে সটান দাঁড়িয়ে একেবারে মাটির ঘোড়া হয়ে যায়। আর মিলি হাঁটতে থাকলে পিছু পিছু হেঁটে যাবে। মিলি

দাঁড়ালে নুয়ে ঘাস খাবে। মিলি বসলে, চারপাশে কখনও দুলকি চালে নাচবে, যেন ঘোড়াটার যাবতীয় খেলা, এই যেমন দু পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা, অথবা, পা নাচিয়ে শিকারি বেড়ালের মত ঘাসে মুখ ডুবিয়ে দেওয়া এবং কখনও দেখা যায় ঘোড়ার পিঠে মিলি, সাদা সাটিনের ফ্রক, চুল উড়ছে, কেশর চেপে মেয়েটা মাঠের শূন্যতায় ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

যেন বিকেলে ঘাস খাওয়াতে যায় মিলি, ঘোড়া নিয়ে সে একা যায়, কখনও করিম মিঞা থাকে, কখনও থাকে না। গ্রামের শেষে সেই বড় ফকিরের দরগা, প্রায় যেন ক্রোশ খানেক তার বিস্তার—এবং কত যে গাছপালা তার ভেতরে। কেউ একা কখনও ঢোকে না। দূর থেকে আসে সব মানুষেরা। মেলার দিনে, দরগায় জিলিপি ভাজা হয়। এবং বাকি সময়টা দরগা থাকে তার দুই সানবাঁধানো বেদী নিয়ে। ওপরে সব বড় বড় রসুন গোটার গাছ আর নিচে সব পাতার জঞ্জাল। তার চারপাশে থাকে ছোট ছোট নরম ঘাস। ঘোড়াটা সেই সব ঘাস খেতে ভারি ভালবাসে।

কিছু ডোবা খানাখন্দ পার হয়ে গেল মিলি। ঘোড়াটা লাফিয়ে পার হয়ে গেল। কেউ দেখল সেই কবিরাজ বাড়ির মেয়ে মিলি, চুলে লাল রিবন বাঁধা, পায়ে সাদা কেডস্ জুতো, সাদা মোজা, হলুদ ফ্রক গায়ে, এবং লম্বা মত মেয়ে প্রায় দু-হাত মেলে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। আসলে ঘোড়ার পিঠে মেয়েটা চলে যাচ্ছে। আগে হৃদয়, বলরাম, রসো, মিলিকে দেখলেই ঘোড়াটার পিছু পিছু ছুটত। এখন মিলি বড় হয়ে যাচ্ছে বলে তারা আর সাহস পায় না। শুধু নীল জানে মিলি ঘোড়াটাকে নিয়ে কোথায় যাবে। কোথায় গিয়ে মিলি আর আলো ওর জন্য অপেক্ষা করবে।

সেও যাচ্ছে পালিয়ে। সেতো জানে না, পদ্ম দেখছে, ওদের ঠাকুর ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছে পদ্ম—দত্তদের আমবাগান পার হয়ে নীলদা বিকেলে কোথায় যাচ্ছে! নীলদা হাঁটতে হাঁটতে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। পদ্ম এবার সোজা দৌড়ে অর্জুন গাছটার নিচে চলে এল। দেখল, মিলি আর ঘোড়াটা চোখের ওপর থেকে অদৃশ্য। নীলদাকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় নিমেষে ওরা উবে গেল। পদ্মর অভিমানে চোখ ফেটে জল আসছে। নীলদাকে নিয়ে মিলি কোথায় পালিয়ে গেল!

—এই মিলি। তখন নীল মিলিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—এখানে।

—দেখতে পাচ্ছি না।

—উঠে এস না।

নীল দ্রুতবেগে উঠে গেল। সব গাছপালা উঁচু টিলার ওপর। টিলার ওপাশে নেমে গেছে আরও সব গাছপালা। হিজল, পিটকিলা, বড় বড় সব অর্জুন গাছ এবং রসুন গোটার গাছ। এ-সব পার হয়ে গেলে, নিচে ছোট জলাভূমি। দূরে চাষ

আবাদের সব জমি। গ্রীষ্মের উত্তাপে সব খাঁ খাঁ করছে।

নীল টিলার ওপরে উঠে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এমন লতাগুল্মে ঢাকা যে মনেই হয় না, কোথায় কেউ এই অসময়ে থাকতে পারে। সে ডাকল, মিলি!

হঠাৎ মিলি চেঁচিয়ে উঠল, তুমি এদিকে এস না নীল দা।

—কেন!

—আমি জলে নেমেছি।

পাশেই সেই সুন্দর জলাভূমি। চারপাশে সব হিজলের গাছ। চৈত্র বৈশাখের খর রোদে এমন ঠাণ্ডা জল দেখলে মাথা ঠিক রাখা যায় না। বেশ বড় দীঘির মত। আস্তানা সাবের দীঘিতে কিছু লাল শাপলা। তার পাতা পদ্ম পাতার মত বড় বড়। সবুজ সবুজ জলজ ঘাস, এবং জল নেমে গেছে নিচে, সেই জলে গলা উঁচিয়ে রেখেছে মিলি। আর ঘোড়াটা পাড়ে দাঁড়িয়ে। অবেলায় ফ্রক প্যাণ্ট ভেজালে মিলির মা বকবে—মিলির এমন সাহসে সে ঘাবড়ে গেল। আর তখনই সে বুঝতে পারল, আসলে মিলি একেবারে উলঙ্গ। মিলি ফ্রক প্যাণ্ট ছেড়ে রেখেছে। ঘোড়াটা পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই কাঠের ঘোড়ার মত। ঘোড়ার পিঠে মিলির ফ্রক প্যাণ্ট। এমন একটা ঘোড়া আছে বলেই যেন মিলি সহজেই জলে নেমে যেতে পারে।

নীল বলল, চলে যাচ্ছিরে।

—ঘোড়ায় চড়বে যে বললে।

—তুইতো বললি, তুইতো আমাকে ডেকে নিয়ে এলি।

—ডলিদির চিঠিতে কি লেখা থাকে!

সে ভেবেছিল চলে যাবে। মিলিকে পাত্তা দেবে না। মিলির এমন একা একা জলে নেমে যাওয়া সে পছন্দ করছে না। আর এটা ঠিক না। যদি কোথাও কেউ দেখে ফেলে, মিলির কিছু হবে না, ওর অনেক কিছু হবে। ফুলু মাসি চিৎকার চেঁচামেচি করবে—বিয়ে হচ্ছে না বলে ফুলুমাসি তাকে যা খুশি তাই বলবে—পদ্মও তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আর যদি পদ্ম দেখে ফেলে! পদ্মতো ছুটির দিনে, সারা বিকেল কেবল নীলদা নীলদা করবে। পদ্ম ঘুমিয়েছিল, এমন গরমের দুপুরে সে ভেবেছিল সবাই ঘুমিয়েছে। কি জানি পদ্মতো জেগেও থাকতে পারে! যতই সন্তর্পণে সে আসুক না, পদ্ম টের পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু মিলি ভারি ধূর্ত। ভয় দেখাচ্ছে, চিঠিতে কি লেখা থাকে! নীল কিছু বলতে পারছে না। বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। গাছপাতার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বলে মিলি তাকে দেখতে পাচ্ছে না। সে সব দেখতে পাচ্ছে। মিলি যেন এখন কোনো অদৃশ্য মানুষের কাছে নালিশ জানাচ্ছে। নীলদা তোমার চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না?

—কাকে?

—আমাকে।

—তোকে চিঠি লিখব কেন?

—ডলিদি চিঠি লেখে কেন?

—কবে লিখেছে?

—তুমি বুঝি জান না। বলেই মিলি জল কুলকুচা করছে। ওর বব করা চুল। এবং জনহীন এই প্রান্তরে খাঁ খাঁ রৌদ্দুরের ভেতর ঠাণ্ডা জলে তখন সাঁতার কাটছে। কোনো কিছুতে যেন মিলির আসে যায় না। এমন সুন্দর সরোবর দেখলে মানুষ সাঁতার না কেটে থাকে কি করে! মিলিকে এখন সোনালী মাছের মত দেখতে লাগছে।

নীল জলের ভেতর মিলির সব দেখতে পাচ্ছে। ওর আর এখন যেতে ইচ্ছে করছে না। ভাল লাগছে। আর ভয় ভেতরে তার, তবু সে নড়তে পারে না। এমনভাবে মিলি তাকে কেন যে আটকে রেখেছে। ভয় দেখাচ্ছে, চলে গেলে বলে দেব। মানুদাকে ডলিদি চিঠি দেয়। ডাকহরকরার কাজটা সে যেহেতু করে থাকে এবং ফুলু মাসির মুখ মনে হলেই সে ঘাবড়ে যায়—বড়বাবু আপনার শ্রীমান এখানে পড়াশোনা করতে এসেছে না ডাকপিওনের কাজ করতে এসেছে। যেন ডলিদি কিংবা মানুদা তার মত একটা বিশ্বস্ত ডাকপিওন না পেলে এমন একটা ভয়াবহ দুঃসাহসে মেতে উঠত না। সব দোষ যেহেতু সে বুঝতে পারছে তার—তখন মিলির সামান্য করুণা ছাড়া তার রক্ষে নেই। সে বলল, মিলি তুই আমাকে দেখতে পাচ্ছিস?

মিলি সাঁতার কাটছিল। সাঁতার কাটলে জলে শব্দ হয়। মিলি বোধ হয় ওর কথা শুনতে পায়নি। সোনালী সাপের মত তেমনি একেবেঁকে জল কেটে মিলি যাচ্ছে, সরোবরের ঠিক মাঝখানে আবার ডুব দিয়ে জলে অন্তর্হিত হচ্ছে। কখনও চিৎসাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে। নীল আরও জোরে ডাকল, মিলি! চিৎ সাঁতার কাটলে মিলির সবই ভেসে উঠছে। ভয়ে কেমন পালাবে ভাবছিল, তখনও মিলি ডাকল, নীলদা, তুমি আমাকে সত্যি চিঠি লিখবে না? নীল রাগে দুঃখে বলল, না। না। না।

মিলি এবার পাড়ের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, জলে নামতে ইচ্ছে করে না!

—আমার ভয় করছে। কেউ আসতে পারে। মিলি তুই কাউকে বলবিনাতো!

—কাউকে বলব না।

—মিলি!

—কিচ্ছু হবে না।

মিলির এত সাহস ভাল না। মিলি কি টের পেয়েছে, পদ্ম তাকে বলেছে, নীলদা মিলি ভাল না। সে অনেক কিছু জানে। ওর সঙ্গে তুমি মিশবে না। মিলি

কি দেখাতে চায়, দ্যাখ পদ্ম, তোর নীলদা আমার কথা শোনে। আমি যা বলব তাই করবে। দেখবি! মনে হতেই নীল দেখতে পেল মিলি সোজা উঠে এসেছে। সে লজ্জায় চোখ বুজে ফেলল। তারপর যখন চোখ মেলে তাকাল, দেখতে পেল, মিলি ঘোড়ার ওপাশে দাঁড়িয়ে চুল মুছছে। ডাকছে, ও নীলদা এস। কোথায় তুমি।

নীল বলল, আসব?

—এস।

নীল নেমে যেতে যেতে দেখল, মিলি ঘোড়াটার ওপাশে। ওর খালি পা দেখা যাচ্ছে। মিলির বুকে সামান্য বাদামী আভা, এবং মিলি ফ্রক দিয়ে বুক ঢেকে রেখেছে। নুয়ে খালি পায়ে, যেন কত উদাসীন সে এইসব পোশাক সম্পর্কে, চারপাশে সন্তর্পণে নজর রেখে বেশ সেয়ানা মেয়ে যখন বলছে, ওঠো, চেপে বসো। তখন নীল বোকার মত বলল, পড়ে যাব মিলি।

—পড়বে না বলছি। বলে সে ফ্রকটা এবার শরীরে গলিয়ে দিল। তারপর ঘোড়ার পিঠে হাত রাখতে কেমন সেই যে কাঠের ঘোড়া অথবা মনে হচ্ছিল নীলের ট্রয় নগরীর ঘোড়া এবং মিলিকে কেন জানি প্রায় হেলেনের মত মনে হচ্ছিল। মিলির সাটিনের ফ্রক, বাদামী চুল গায়ের সোনালী রঙ, আর মিলির সুন্দর উরুর ভাঁজে সব কিছু এমন মনোরম যে নীল আর একটা কথা বলতে পারল না। ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলে মিলি এবার লাগামে হাত রাখল। মিলি আগে। সে পেছনে। মিলি খর রোদ্দুরে নীলকে পিঠে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম আল্গা করে দিতেই সেই যে মানুষের থাকে এক স্বপ্নের রাজপুত্র অথবা স্বপ্নের রাজকন্যা, ওরা দিগন্তে সেই স্বপ্নের রাজপুত্র, রাজকন্যা হয়ে উড়ে যেতে থাকল।

নয়

সারা দুপুর কাটফাটা রোদ্দুর। কী তাপ রোদের। গাঁয়ে তখন একটা মানুষ দেখা যায় না। দরজা জানালা বন্ধ করে সবাই ঘরে শুয়ে আছে। মাঠে ঘাস পাতা কিছু নেই। কেবল সারাটা দুপুর খাঁ খাঁ রোদ্দুরে গাছপাতা পাখপাখালি পুড়ছে। একটু বেলা পড়তেই বিলের জল থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছিল। মানুষ জন আড়মোড়া ভেঙেছে। দরজা জানালা খুলে দেখছে, বাইরে বের হওয়া যাবে কিনা ঠিক সেই সময়ে নিরিবিলি গোপনে মিলি নীলদাকে নিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল!

পদ্ম হেঁটে গেল কিছুটা। কেউ জানে না, সেও সময় বুঝে এই সব গাছপালা ছায়ার ভেতর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মা ফুলু পিসি ঠাকুমা দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। সে বড়ঘরে তক্তপোশে শুয়ে ছবি আঁকছিল। দুপুরে অলস গরমে ওর কেন জানি ঘুম আসে না। ছোটদাদু তার ঘরে, সুধন্য বাড়ি নেই। দেশে গেছে।

দাদা দুপুরে খেয়েই ঘরে থাকে না। মার কথা একেবারেই শোনে না। মাও আজকাল দাদাকে কেমন আগের মত ছোট দেখে না। গলার আওয়াজ দাদার একেবারে বদলে গেছে। ঠিক বাবার মত অথবা পুরুষ মানুষের মত হেঁড়ে গলা—এবং আজকাল পদ্ম দেখেছে বরং দাদাকেই একমাত্র মা ভয় পেতে শুরু করেছে। সে কী করছে না করছে এ-বয়সে আর তার কেউ দেখার নেই। দাদা বিকেলে আসবে না। কখনও বেশ রাত করে ফেরে দাদা! মা তখন কেমন খুব ভাল মানুষ হয়ে যায়। হ্যাঁরে মানু সন্ধ্যা হয় না। পড়াশোনা তা হলে আর করবি না। তারপর মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে—কি যে পোড়াকপাল তার বাবাকে নানারকম দোষারোপ। তারপর মার হাতে এখন একমাত্র অস্ত্র, তোর বাবাকে চিঠি লিখছি, এখানে থেকে মানুটা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। এবারে তুমি আমাদের নিয়ে যাও। পদ্মর বুকটা তখনও কেমন ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। যদি সত্যি বাবা আবার তাদের কলকাতায় নিয়ে যায়, তবে নীলদাকে সে জন্মের মত হারিয়ে ফেলবে। মিলি নীলদাকে নিয়ে তখন সব মজা লুটবে।

পদ্ম হেঁটে, কখনও দৌড়ে ঝোপজঙ্গল, মাঠ এবং গাছপালা পার হয়ে যাচ্ছে। জোরে ডাকতে পারছে না, তবে সব গাঁয়ের মানুষেরা জেগে যাবে। অবেলায় ফ্রক পরা সোমত্ত মেয়েটা যে কোথায় যাচ্ছে! সে চুপি চুপি প্রায় কখনও হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। লোকজন পথে দেখা হলেই বলবে, অমা পদ্ম দিদি যে! কোথায় যাচ্ছেন! আর এখন শাকপাতা তোলারও সময় নয়। খুব সকালে সে যে একা এদিকটায় কখনও না এসেছে তা নয়, ঠাকুমার জন্য সে একা গিমা শাক তুলতে এসেছে কখনও। এই সব ছোট বড় জলাশয়ের পাশে সবুজ সব আভা ঘাসের ভেতর, এক একটা গিমা শেকড়-বাকড়সুদ্ধ উপড়ে তুলে ফেলতে পারলে— তার নামে কেউ দোষারোপ করতে সাহস পাবে না। মা ঠাকুমা গালমন্দ করার আগেই দেখবে, মেয়েটা বনজঙ্গল থেকে সব সবুজ গিমাশাক তুলে এনেছে কোঁচড়ে।

এবং এভাবে পদ্ম মাঝে মাঝেই কোথায় কোনো বড় টিলা পেয়ে গেলে উঠে যাচ্ছে। ডালপালা ফাঁক করে দূরের মাঠ অথবা কাছাকাছি সব জায়গায় খুঁজে দেখছে, ঘোড়াটা আছে কিনা। ঘোড়াটা থাকলেই সে ঠিক নীলদা আর মিলিকে আবিষ্কার করে ফেলবে। নীলদা কি দাদার মত পাজি নচ্ছার হয়ে যাবে—সে যদি দেখে ফেলে মিলি গাছের ছায়ায় মাথায় হাত রেখে শুয়ে আছে—তারপর আরও সব বিশ্রী দৃশ্য, মিলি নীলদাকে অ আ শেখাচ্ছে, আর তখনই তার বুকটা ভীষণ কাঁপে। আর কেমন মনে হয় কাছে পেলে নীলদাকে কামড়ে আঁচড়ে শেষ করে দিত এখন।

আর ঘোড়াটা কোথাও তখন ডেকে উঠল। কান খাড়া করে রেখেছে পদ্ম। ঘোড়াটা ঠিক একা পড়ে গেছে। কাছে কোথাও মিলি নেই। নীলদা মিলি

ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে, জলে ঠিক পা ডুবিয়ে বসে আছে। সে আর একদণ্ড দাঁড়াল না। ঘোড়াটার চিৎকার অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং ঘোড়া না ডাকলে, বাতাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে চলে যাচ্ছে সামনের দিকে। যত দূরেই যাক নীলদা, গায়ে তার আশ্চর্য সৌরভ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সে এটা টের পাচ্ছে। নীলদার শরীরের ঘ্রাণ পাল্টে যাচ্ছে। চোখ বুজে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে নীলদা আসছে সে টের পায়। আর এখন তো তার ভারি সুসময়। শরীরের সব শিরা উপশিরা জেগে উঠছে। দপদপ করে শরীরের ভেতরে জ্বলছে তারা। সে সহজেই টের পেয়ে গেল, ফকির সাবের দরগার কাছাকাছি কোথাও নীলদা আছে। ঘোড়াটা আর না ডাকলেও সে ঠিক পৌঁছে যেতে পারবে নীলদার কাছে।

চারপাশে সব শিমুলের ফুল, লাল। আর মাঠের গনগনে আঁচ মরে আসছিল। পদ্ম ফ্রক তুলে কপালের ঘাম মুছলে। নীলদাকে কাছে পেলে পালিয়ে বের হয়ে আসা তার বের করে দেবে। যদি মাকে সব না বলেছে তো তার নাম পদ্ম নয়। মা, নীলদা মিলির সঙ্গে কী সব করছিল।

কী সব ভাবছিল এভাবে পদ্ম। তার ফ্রক উড়ছে চুল উড়ছে বাতাসে। শিমুলের লাল ফুল অজস্র, মাথার ওপরে সব লাল ফুল, নিচে পদ্ম, মুখ তার রাঙা হয়ে উঠছে। আর তখনই দূরে দেখতে পেল মিলি মাঠে। ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। কাছে পিঠে নীলদা নেই। সে বুঝতে পারছে নীলদা সেই ফকির সাবের দরগার ভেতরে লুকিয়ে আছে। সে উঠে গিয়ে ডাকল নীলদা। কোনো সাড়া পেল না। দূরে চষা মাঠের ওপর বিকেলের রোদে ঘোড়াটাকে নিয়ে মিলি, না আরও সঙ্গে কেউ যেন, একসঙ্গে মিশে আছে। নীলদা তুমি! মিলিকে আপ্রাণ জড়িয়ে আছে নীলদা, যেন গোটা একটা মানুষ হয়ে গেছে তারা। চষা মাঠের জন্য আর রোদের ঝিল্লিতে স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। পদ্ম আর স্থির থাকতে পারছে না। সেই গেছোমেয়েটা তার সব হরণ করে নিচ্ছে। যতদূরে যায় ঘোড়াও যায় দূরে, সে আর ছুটেও তাদের নাগাল পাবে না। ঘোড়ার কেশর মিলি চেপে ধরেছে, নীলদা পেছনে কোমর ধরেছে। দুজন মানুষকে নিয়ে ঘোড়াটা তেমন জোরে ছুটতে পারছে না, না ইচ্ছে করেই সামনে এত বড় মাঠ পেয়ে, খেলা করছে তারা, পদ্ম ঠিক জানে না। সে ফিরে যাচ্ছিল। সে হেরে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

ছায়া ছায়া অন্ধকারে আরও কেউ নেমে আসে মাঝে মাঝে। যখন এই গ্রাম মাঠ, দূরের সব গাছপালা অথবা প্রজাপতিরা গ্রীষ্মের বাতাসে ডালপালা পাখা মেলে দেয় তখন অগণিত এই জীবনধারার ভেতর ওরা দুজন, দুপাশে অন্ধকার, শুধু কেউ কোনো কথা বলে না।

—এই ডলি কি হয়েছে!

—কিছু না।

—কথা বলছ না কেন?

—বাবা ঢাকা গেছে।

—কেন?

—আমার বর খুঁজতে।

—যা!

—হ্যাঁ সত্যি বলছি।

মানু কী বলবে আর ভেবে পেল না। —তুমি আমাকে চিঠি দাও কবিরাজ কাকা জানে?

—কি করে জানবে?

মানু পরেছে কোঁচানো ধুতি। গায়ে হাফসার্ট চেককাটা। ডলি পরেছে সাদা সিল্কের শাড়ি। ছাপা। মিনার মন্দির অথবা তরুলতার সোনালি সব ছবি শাড়িতে। চুলে গন্ধ তেলের সুবাস। চন্দন গোটার গাছের ভেতর ছায়া ছায়া হয়ে আছে তারা। লুকিয়ে খবরটা দিতে এসেছে ডলি।

মানু বলল, মিলি জানে তুমি আমাকে চিঠি দাও!

—কে বলেছে!

—নীল বলল।

ডলি আর কিছু বলতে পারল না। নখে মাটি খুঁড়ছিল। কেমন ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। বাগানের ভেতর দিয়ে সরু আলোর সব জাফরি কাটা ছবি ভেসে আসছে। তারপর কী ভেবে বলল তা হলে আমাদের কি হবে?

মানু জবাব দিতে পারছে না। ইচ্ছে হচ্ছে ডলিকে নিয়ে এক্ষুণি পালিয়ে যেতে। কলকাতা বড় শহর—বাবাকে তার ভীষণ ভয়—এবং সে ভেতরে ভেতরে হাহাকারে ভুগছিল।

ডলি বলল, আমি যাই।

মানু পাগলের মত ডলিকে জড়িয়ে ধরল। এবং চুমো খেল। তার যেন আর কিছু করার কথা মনে আসছে না। কী সুন্দর হয়ে যাচ্ছে ডলি। তার নরম শরীর আকণ্ঠ মিশে আছে তার শরীরে। ডলি দু-হাতে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে তাকে।

মানুর কিছুতেই ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না! এবং সে ধীরে ধীরে কেমন মাতালের মত হয়ে উঠছে। চারপাশে অন্ধকার, বড় বড় সব চন্দন গোটার গাছে নির্জনতা। মাথার ওপরে গাছের ফাঁকে কিছু নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব। সে প্রায় পাগলের মত ডলিকে দু-হাতে তুলে নিল। নিচে নরম ঘাস প্রায় যেন কোনো

সংজ্ঞাহীনা রমণীর মত তাকে ঘাসে শুইয়ে দিল। ডলির শরীরে কি যে সব প্রবহমান হচ্ছে। সে কিছুতেই বাধা দিতে পারছে না। জীবনের কাছে এমন মহিমময় কিছু পাওনা থাকে মানুষের ডলি আগে যেন জানত না। তার চোখ বুজে আসছিল। সে কিছুতেই মানুকে বাধা দিতে পারছিল না। সজীব ফুলের মত সে তখন ঘাসের ভেতর ফুটে আছে।

গাছপালার ভেতর তারপর দু-জনই চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল। কেউ কোনো কথা বলতে পারল না।

ডলি একসময় বলল, মানু এটা কি করলে!

মানু ডলির দিকে তাকিয়ে থাকল।

ডলি বলল, আমার বিয়ে হলে তোমাকে কিছুতেই আর ভুলতে পারব না।

মানুর মাথায় যে কি হয়! সে কেমন ফের ওকে বুকে টেনে বলল, চল আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—কোথাও আমরা চলে যাব।

—তুমি কি!

—কেন আমি কি!

—হুট করে যাব বললে যাওয়া হয় না।

মানু বলল, তুমি আমাকে ভালবাস না।

ডলি বলল, তাইতো বলবে।

—তবে যাবে না কেন?

—লোকে কি ভাববে!

—লোকের ভাবাভাবিটা বেশি হল!

ডলি বলল, ছেলেমানুষী কর না মানু। তুমিতো সবই দেখলে। আমার বিয়ে হলে তুমি কিন্তু আর চিঠি দেবে না!

—বিয়ে হতেই দেব না।

—খুব সাহসী।

—দ্যাখো।

—কি দেখব!

—ঠিক একটা কিছু করে ফেলব।

সামান্য জ্যোৎস্না চারপাশে সাদা কবুতরের মত বসে আছে। মাথার ওপর সেই সব চন্দন গোটার গাছ। গাছের ডাল পাতা চুঁইয়ে জ্যোৎস্না নেমেছে। ভারি অলৌকিক মনে হচ্ছিল সময়টা। দূরে কোথাও কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। ডলির ভাল লাগছিল না। মানু যা একজন মানুষ, যা খুশি করে ফেলতে পারে। সে কি করবে,

কেন যে সে মানুকে চিঠি লিখতে গেল। বাবা ফিরে এলে তার সাহসই হবে না, সে বলতে পারবে না, বাবা মানু কিছু একটা করে বসতে পারে—এখন আমার বিয়ের জন্য ভাবতে হবে না। যতই সাদা কেডস্ পরে সবুজ লনে কর্কটাকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখুক, যতই সে সব দিক না কেন, বাবার সামনে দাঁড়াবার সাহস তার নেই। সে বলল, মানু কাল এস। আবার আমরা এখানে বসব।

মানু বলল, আমি কোথাও এখন যাব না।

—যাও। লক্ষ্মী ছেলেতো।

—না যাব না।

—আর কি করবে!

—সারারাত আমরা এখানে থাকব।

—মা জেগে গেলে।

—জেগে গেলে তোমাকে খুঁজবে।

—ধরা পড়ে যাব মানু। আমি যাই।

—না। বলে সে আবার ঘাসের ওপর ডলিকে শুইয়ে দিল। গ্রীষ্মের সময়। হাওয়া দিচ্ছে। সে পাশে শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। ডলি শুয়ে আছে। এবং তেমনি আকাশ আর নিরিবিলি গাছপালা। দুটো একটা জোনাকি পোকা উড়ে গেল। ভারি ফ্যাকাশে লাগছিল। ঝিঁঝি পোকার ডাক, আর কোনো সরিসৃপ হেঁটে বেড়াচ্ছিল কোথাও। খস খস শব্দ উঠছে। সে ধীরে ধীরে, ডলির সুন্দর নরম স্তনে হাত রাখল। এবং খোলামেলা, অথবা ধীরে ধীরে, তেমন অধির আগ্রহে নয়, বরং কিছুটা ডলিকে নিজের মত করে রয়ে সয়ে শরীরের সর্বত্র সুন্দর সুষমায় ভরে দিতে থাকল।

ডলি বলল, আমি মরে যাব মানু।

—আমিও মরে যাব।

—সেই ভাল। ডলি কেমন সহসা একটা সহজ পথ পেয়ে গেছে। সে উঠে বসতে চাইলে মানু ফের তাকে শুইয়ে দিল। এবং মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, মানুষ এ-ভাবে বুঝি মরে যায় ডলি?

—মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কী একটা স্বপ্নের মত সময় ডলিকে আপ্লুত করে রাখছে।

সে বলল, জানো আমার একটা ছবি ছেলের বাড়িতে বাবা পাঠিয়েছে?

মানু বলল, ঠিকানাটা দেবে?

—কার ঠিকানা!

—যেখানে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে।

—কি হবে ঠিকানা দিয়ে?

—ওদের লিখে জানাব।

—কি লিখবে?

—লিখব ডলি একজনকে ভালবাসে। তাকে না পেলে ডলি মরে যাবে।

—না না ওসব লিখতে যেও না।

—তবে আমি কি করব ডলি!

ডলি পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। সত্যি সে কিছু বলতে পারল না। বরং মনে হল, এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় পুকুরের জলে ডুবে গেলে কেমন হয়। ডলি বলল, মানু এস আমরা দুজনে মরে যাই।

মানু পাশে কেমন অবোধ বালকের মত কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, ডলি সেই ভাল।

ডলি উঠে দাঁড়াল। কেমন এক বাহ্যজ্ঞানশূন্য রমণীর মত হেঁটে গেল কিছু দূর। তারপর সহসা মনে হল, সে ভাল সাঁতার জানে। মানু জানে না। জলে নেমে গেলে মানু সত্যি ডুবে যাবে। কিন্তু সে ড়বে যেতে পারবে না। তার বার বার ওপরে ভেসে উঠতে ইচ্ছে হবে। সে বলল, মানু আজ যাও। কাল আবার আমরা এ-নিয়ে ভাবব।

দশ

তখন ফুলু মাসি চিৎকার করছিল। তোমাকে হতভাগা দূর করে দেব। পাজি নচ্ছার কোথাকার! গরুগুলো মাঠ থেকে কে আনবে। এক খোঁটায় ওদের পেট ভরবে কেন। যা সময়, ঘাস পাতা কিছু নেই আর তোমার পাড়া বেড়ানো। আসুক বড়বাবু, এবার বিদায় করে দেব।

নীল একটা কথা বলছিল না। সে তার ঘরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। ছোট দাদু বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন। তাঁর গুড়ুক গুড়ুক শব্দ। পদ্ম তক্তপোশে বই নিয়ে বসে আছে। আর ভেতর বাড়িতে মেজ মামী গজ গজ করছেন—যদিও নীল সব বুঝতে পারছে না—তার মনে হচ্ছিল, সত্যি সে ভীষণ একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছে! গরুগুলো মাঠে দিয়ে আসে সে। তার মনেই ছিল না, সংসারে যাবতীয় কাজ তার ক্রমে ভারি হয়ে উঠছে। অন্ধকারে নেমে গেলে দাদু বললেন, দেখ বিশাটা কোথায় গেছে? দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে। খুঁজে পেলাম না।

সে বুঝতে পারছে ছোট দাদু মাঠ থেকে গরু বাছুর নিয়ে এসেছে। কেবল দুধালো গরু বিশাকে আনতে পারেনি। এখন অন্ধকারে সারা গ্রাম মাঠে খুঁজে বেড়াতে হবে। কারো কোনো বাগান অথবা সবজি খেতে মুখ বাড়ালে বেঁধে রাখতে পারে। খোঁয়াড়ে দিতে পারে। এত অনিষ্ট করার স্বভাব বিশার যে নীল রাগে দুঃখে লণ্ঠন হাতে বের হয়ে গেল। পদ্ম সব দেখছে—নীলদা ভীতু স্বভাবের

মানুষ। সে একা খুঁজে বেড়ালে ঠিক কোথাও ভয় পেয়ে পড়ে থাকবে। সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। বিকেলের সব রাগ দুঃখ নিমেষে তার কেমন জল হয়ে গেল। সে বলল, দাদু আমি যাই নীলদার সঙ্গে।

—যা।

ফুলুমাসি সহসা বাড়ি মাথায় করে ফেলল, কোথায় যাবে! ধিঙ্গি মেয়ে। তুমিও কম যাও না। আসুক মেজদা বাড়িতে, দেখাচ্ছি তোমাদের মজা! পদ্ম কেমন গুটিয়ে গেল ভয়ে। ফুলুপিসি কি তার ভেতরের ইচ্ছে সব টের পায়। সে কি জেনে ফেলেছে সব। তার মনের ভেতরে আশ্চর্য সব ইচ্ছেরা যে খেলে বেড়ায়, পিসি বুঝি সব টের পেয়ে গেছে। সে যে নীলদাকে না দেখতে পেলে হাহাকারে ভোগে! নীলদার জন্য এত কেন কষ্ট তার! ফুলু পিসি বজ্জাত, ভীষণ বজ্জাত—নীলদাকে মার মত কষ্ট দেওয়ার স্বভাব। সে কেমন এবার জেদী হয়ে গেল। আবার বলল, দাদু আমি যাই?

—যা।

সে আর এক দণ্ড দাঁড়াল না। দৌড়ে নেমে গেল উঠোনে। বলল, নীলদা দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি।

সহসা মা কোত্থেকে ছুটে এসে প্রায় ঝড়ের মত পদ্মের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চুল ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকল—কোথায় যাবে! পড়াশোনা পাটে তুলেছ তোমরা সবাই। বড়টা অমানুষ হচ্ছে তুমিও কম বজ্জাত না। যাও পড়তে বসো। আমার হাড়মাস তোমরা সবাই মিলে কত আর খাবে?

তারপর সহসা বাড়িটা কেমন নিঝুম। ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। গ্রীষ্মের দিনে নিষ্ঠুর গরমের ভেতর ঝিঁঝি পোকারা কী যে দ্রুত ডেকে বেড়ায়। পদ্ম উপুড় হয়ে কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদছিল। ছোট দাদু তেমনি তামাক খাচ্ছেন। বিরাম-বিহীন অন্তহীন সেই গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানার শব্দ। ফুলু মাসি আয়নায় মুখ দেখছিল। বিয়ে হচ্ছে না, বর খুঁজে হয়রান, খরচপত্র আছে কত—নলিনীর দিনকে দিন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে চিন্তায়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বাঁচা যায়, এমন অজপাড়াগাঁয়ে সে আর কিছুতেই পড়ে থাকবে না। চিঠিতে নলিনী, মানু কীভাবে দিনকে দিন বেয়াড়া হয়ে উঠছে তার মোটামুটি সব খবর আজকাল পাঠাচ্ছে। সুধন্য দেশে গেছে, সে আর ফিরে না এলেই ভাল। কে যোগাবে হাতির খোরাক। ছোটদাদুর নামে যে টাকা আসে নলিনী সবই প্রায় এখন নিয়ে নিচ্ছে। নীলের অনেক খাওয়ার খরচ আর নীল বড় বেশি আহার করে থাকে। ভাত দিলে সে কখনও না করে না। খেতে খেতে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় তবু খায়। খেয়ে উঠে দম ফেলতে পারে না মত নীল হেঁটে যায়। কোনো কোনো দিন বিদ্বেষে নীলের ভাত লাগবে কিনা পর্যন্ত বলতে ঘৃণা করে

তার। নীলের স্বভাব নয় চেয়ে খাবার। না দিলে চুপচাপ আধপেটা খেয়ে উঠে যাবে। কখনও বলবে না আমার পেট ভরেনি মামীমা। আর দুটো ভাত দিন।

পদ্ম বোঝে সব। দুবেলা দুটো ভাত আর কিছু না। নীলদার বড় ভয়। ভাত যা পাবে সবটাই খেয়ে নেয়া দরকার। যেন পাকস্থলীর ভেতর তার সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি। অসময়ে কাজে লাগবে। সেই নীলদা এখন লণ্ঠন হাতে মাঠে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশা তুই কোথা? ও বিশা। তোকে নিয়ে যেতে না পারলে মামীমা আমাকে খেতে দেবে না। বিশা, লক্ষ্মী তুই একবার সাড়া দে।

—কে যায়? দত্তদের বুড়ো দত্ত হাঁকে।

—আমি নীল। আমাদের বিশাকে দেখেছেন?

বুড়ো দত্তের হাঁপির টান গলায়, শীত গ্রীষ্মে কমফরটার জড়ানো থাকে। বলল, না। শ্বাস কষ্টের ভেতর লোকটা তবু আবার বলে, দ্যাখ ঢালিদের বাড়িতে আছে কিনা? ঝোপ জঙ্গলে ঘাস পাতা খেয়ে বেড়াতে পারে।

নীল ডেকে চলেছে—বিশা। বিশা। কবিরাজ বাড়ির পাশ দিয়ে নেমে গেলে জানালায় মুখ বাড়িয়ে কে বলল, নীলদা কেথায় যাচ্ছ? নীল লণ্ঠন তুলে বলল, বিশা দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছে মিলি। কোথায় যে গেল!

মিলি বারান্দায় বের হয়ে বলল, এই নীলদা।

—কি?

—আলোকে নেবে। বাবা বাড়ি নেই। আমি যাব?

—ঘোড়া নিয়ে কোথায় যাব। তুই কেন যাবি।

—তা হলে ভয় করবে না তোমার।

নীল বুঝতে পারল, মিলি তার ভয়ের কথা ভাবছে। সে খুব ভীতু কিছুতেই মিলিকে বুঝতে দিল না। বলল, না। ওটা আবার কোনদিকে ছুটবে! সে লণ্ঠন নিয়ে নেমে যেতে থাকল। আকাশ কালো এবং অন্ধকার। গ্রীষ্মের দিনে যে কোন সময় ঝড় বৃষ্টি আসতে পারে। সে এবার আরও নিচে সব জলাশয় পার হয়ে ডাকল, বিশা তুই কোথায়। ঘোষপাড়ায় সে গেল, বাড়ি বাড়ি সব চাকর মুনিষদের অথবা অবনীকে বলল, আমাদের বিশাটা যে কোথায় দড়ি ছিঁড়ে পালালো।

অবনী বলল, সিঙ্গিদের বাড়িতে কার গরু বেঁধে রেখেছে। দেখগে তোদের বিশা হয়তো।

সে সিঙ্গিদের বাড়িতে গেলে দেখল হারান সিঙ্গির বউ উদোম গায়ে বারান্দায় শুয়ে একা। নীল ভয়ে ভয়ে বলল, আমাদের বিশা এদিকে এসেছে?

উদোম গায়ে হারান সিঙ্গির বৌ উঠে বলল, কে নীল কর্তা! না তো। আপনাদের কোনো গরু এদিকে আসেনি।

কোথায় যে গেল! সে লণ্ঠন দুলিয়ে নেমে গেল মাঠে। কী গভীর অন্ধকার।

মাঠের আলে আলে সে হেঁটে যাচ্ছে। লণ্ঠনের আলো দুলছিল—প্রায় বাতাসে কাঁপছিল। মাথার ওপরে অবিরাম আকাশের নক্ষত্রমালা সরে সরে যাচ্ছে। তার ভীষণ ভয় করছিল। পরীক্ষার পড়া সে বিন্দুমাত্র করতে পারেনি। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হলেই পরীক্ষা। সে এবারে কেমন মনমরা হয়ে বলল, আস্তানা সাব আমার ভয় করছে। বিশাকে তুমি পাইয়ে দাও। তোমার দরগায় মোমবাতি জ্বালব।

এবং তখনই সে দেখতে পাচ্ছে কেউ আবার নেমে আসছে মাঠে। হাতে লণ্ঠন। কেউ হবে, ওকে ডাকছিল, নীলদা বাড়ি এস। বিশা নিজেই চলে এসেছে। বুঝতে পারল সেই পদ্ম। যতবার যা কিছু হারায় আস্তানা সাবের নামে মানত করলে সে তা পেয়ে যায়। পদ্ম কাছে এলে দেখল, সঙ্গে ছোট দাদু। ছোট দাদু আর পদ্ম ওকে খুঁজতে এসেছে।

নীল যেতে যেতে একা পদ্মকে কাছে ডেকে বলল, পদ্ম যাবি?

—কোথায়?

—মোমবাতি জ্বেলে দেব দরগায়। তুই সঙ্গে থাকবি। একা আমার ভয় করছে। মানত করলে দিতে হয়। না দিলে ফকিরসাব রেগে যাবে।

এভাবে নীল আর পদ্ম কাছাকাছি পাশাপাশি বড় হয়ে উঠছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে ডলির বিয়ে হয়ে গেল। মানুদা ডলির বিয়ের ক-দিন আগে কেমন ধার্মিক মানুষ হয়ে গেল। সে দু-বেলা ঠাকুর ঘরে বসে কী জপতপ করত। ছোট দাদুর নামাবলি গায়ে বসে থাকত। একদিন সকালে সে নামাবলি গায়ে চলে গেল, দূরের চিনিশপুরের কালীবাড়ি। সেখানে দুদিন কাটিয়ে যখন ফিরে এল, উসকো খুসকো চুল, চোখ জবা ফুলের মত লাল। চেনা যায় না মত। খাওয়া-দাওয়ার পাট একদম তুলে দিয়েছে। এবং এক রোববারে বাড়িতে সবাই দেখল, সে কেমন মৃগী রোগীর মত ভিরমি খেয়ে পড়ে গেছে।

ডলি তখন পাল্কি করে চলে যাচ্ছে। দূরের মাঠে বাদ্য বাজছিল। মিলির বাবা খবর পেয়ে ছুটে এল। নাড়ি দেখে বলল, খুব দুর্বল। এবং এ-ভাবে খবর রটে যায়, ভূঁইঞা বাড়ির মেজকর্তার বড় ছেলের অসুখ। কি অসুখ কেউ ধরতে পারে না। সময় অসময় নেই ফিট হয়ে যায়। গরমের সময়, ঠাণ্ডা যা কিছু, এই তরমুজের রস, কাঁচা আমের সরবত, এবং যা কিছু ওষুধপথ্য সব দরকার, যোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে গেল সবাই। কাজেই নীলের যা কাজ ছিল, তার চেয়ে এখন এ-সংসারে বেশি কাজ। সুধন্য দেশ থেকে আর ফিরে এল না। মেজমামী চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে, সুধন্য তোমার এসে আর কাজ নেই। নীলতো আছে, সে যখন সব চালিয়ে নিতে পারছে আর কি দরকার তোমার। দিন দিন সংসারে অশান্তি বাড়ে। মেজমামা এলেন, আষাঢ়ের এক বর্ষায়। খবর পেয়ে আসতে পারেননি। ছুটি-ছাটার ব্যাপার আছে—বললেই হুট করে আসা যায় না।

বেশ ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। মাঠ-ঘাট জলে ভেসে গেছে। ঘোড়াটা আবার বন্দী হয়ে গেছে ছাড়াবাড়িতে। বিকেল হলে মিলি বসে থাকে, নীল আসবে। ডলিদি আবার এসেছে, কেমন লাল চেলি, মাথায় টায়রা, মুখে সব সময় আশ্চর্য সুন্দর সব চন্দনের মত স্নিগ্ধতা। নীলকে মাঠে দেখলেই ইশারায় ডেকে জিগ্যেস করে—এই নীল, মানুদা এখন কেমন আছেরে!

—মানুদার শরীর ভাল যাচ্ছে না। কি যে একটা অসুখ!

—আজ তোদের বাড়ি যাব। মানুদাকে বলবি।

—বলব।

নীল তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বলল, মানুদা ডলিদি আজ আসবে।

মানুদার যেন কোনো উৎসাহ নেই—সে ডলিদিকে চেনে না মত।

বিকেলে এল ডলিদি আর তার বর। ডলিদি এ ক-দিনে আরও সুন্দর হয়েছে। বর ভারি রূপবান। সওদাগরের মত চেহারা। একটু যেন বেশি বয়সের মানুষ। নতুন পাম্পসু জুতো, গায়ে পাতলা সিল্কের চাদর, চোখ ছোট, ঘাড় পর্যন্ত চুল ছাঁটা, এই লোকটাই ডলিদিকে জোর করে নিয়ে গেল মানুদার কাছ থেকে—কতদিন ভেবেছে বলবে, জানিস পদ্ম মানুদা ডলিদিকে ভীষণ ভালবাসত। সব অসুখ আমি জানি ডলিদির জন্য। কিন্তু সেতো কিছু বলতে পারে না। খবর জানাজানি হয়ে গেলে মানুদা লজ্জায় মরে যেতে পারে। ভারি কলঙ্ক এসবে। সে সব নিজের ভেতর রেখে দেয়। পৃথিবীর কাউকে জানতে দেয় না। ডলিদি মানুদাকে সুন্দর সুন্দর চিঠি দিত। চিঠিগুলো মানুদা ভয়ে একটাও কাছে রাখেনি, সেই চিঠি পড়ে কেউ দেখে ফেলবে ভয়ে, কত দূরে যে চলে যেত মানুদা! সে বুঝতে পারত, এই যে মানুদা ভালমানুষের মত মিলিদের ছাড়াবাড়ি পার হয়ে নির্জন একটা মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে, সে শুধু ডলিদির চিঠিটা ভাল করে পড়বে বলে, পড়ে পড়ে বিকেলের মরা আলোতে একসময় চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলবে, চিঠিটা কুটি কুটি করে, যেন একটা অক্ষরও কেউ উদ্ধার করতে না পারে, যেন কেউ টের না পায় জোড়া লাগিয়ে, কারণ মানুষের শত্রুতারতো শেষ নেই, কে কি ভাবে টের পেয়ে যাবে! চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে [illegible] সে উড়িয়ে দিত না, সেই সব ছিন্নভিন্ন চিঠির অন্তহীন রহস্য এখনও সে জানে— মানুদা খুব যত্নের সঙ্গে সবুজ পাতার ভেতরে গাছে গাছে লুকিয়ে রেখেছে। যেন এ গাঁয়ের কোনো না কোনো গাছে তার সাক্ষ্য এখনও পাওয়া যাবে। ঝড়ে [illegible] ভিজেছে, এক পবিত্র ইচ্ছের কথা। রাতদিন রোদে পুড়েছে, বৃষ্টিতে ভিজেছে— আর তখনই পদ্মকে দেখার জন্য সে কেমন আকুল হয়ে যায়। মিলির জন্য প্রাণের ভেতর কি যে বাজে। মিলি বাড়ি না থাকলে, কবিরাজ [illegible] খাঁ করে। কবিরাজ মামা, তাকে রাংতায় মোড়া হলুদ কাগজে [illegible] আনতে

দেন। স্কুলের পাশে অনিল সাহার চায়ের দোকান, এত বড় বিশ্বাসী কাজ কবিরাজ মামা একমাত্র তাকেই দিতে পারেন। সে খুব যত্নের সঙ্গে নিয়ে আসে। সন্ধ্যায় ম্লান আলোতে সে চায়ের প্যাকেট হাতে করে যখন উঠে আসে, তখন কবিরাজ মামার গলা, কিরে নীল, এনেছিস। এক পাউণ্ডের এক প্যাকেট চা। কী সুন্দর! একদিন মিলি ওকে বলেছিল, এই নীল-দা চা খাবে। নীল ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল। সে এ-বয়সে চা খেয়েছে শুনলে দাদু ভারি রাগ করবে। তাকে ফুলুমাসি তবে কালই দেশে পাঠিয়ে দেবে। সে বলেছিল, যা। চা খাব কিরে!

মিলি বলেছিল, আমি খাই।

নীল বলেছিল, শহরে থাকলে আমিও খেতাম। শহরে থাকলে অনেক কিছু তাড়াতাড়ি শেখা যায়। গাঁয়ে থাকলে হয় না। কিন্তু ওদের বাড়িটা যে কি! পদ্ম তো শহরের মেয়ে, শহরে বড় হয়েছে, পদ্মর অবশ্য তখন খুব ছোট বয়েস ছিল, এখনকার মত বয়সে পদ্ম শহরে থাকলে ঠিক চা খেত। এবং যখন মিলি বলেছিল সে চা খায়, নীলের চোখ কেমন বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেছিল। ভেতরে ভেতরে এই মিলি তার চেয়ে সব দিকেই বড়, এবং তাজা। মিলির সঙ্গে সে কিছুতেই পেরে উঠবে না। ওর লাফ দিয়ে ঘোড়ার উঠে বসা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না, কত দ্রুত সব কিছু-সে করে ফেলতে পারে। পদ্ম ঠিক যেন মিলির মত সব পারে না।

তবু একদিন কী যে হয়ে গেছিল তার। কবিরাজ মামা ডিসপেনসারিতে। হামানদিস্তায় কোনো শব্দ উঠছে না। ডিসপেনসারির বারান্দায় লাইন দিয়ে রুগী বসে আছে। পোস্টাপিসে তালা বন্ধ। পাশের মাঠ পেরিয়ে লম্বা সান-বাঁধানো লাল বারান্দা, জানালায় মিলি। সে স্কুল থেকে ফেরার পথে সেই সোনালি প্যাকেট মিলিকে দিলে বলেছিল, এই নীল-দা।

—কি!

—মা বাড়ি নেই।

নীল বুঝতে পারছিল না, কেন এ-সব বলছে। —তুমি ভেতরে এসো না নীলদা।

সে বলল, কবিরাজ মামা...

—বাবা এখন আসবে না। আমাদের চা হয়েছে। আমি করেছি। তুমি খাবে।

নীল ভীষণ একটা অপরাধী মুখ করে রেখেছিল। যেন পৃথিবীতে সে এর চেয়ে বড় পাপ জীবনে করেনি। কী লোভ তার—যখন সোনালী কাপে চা এল, সে পা ঝুলিয়ে লুকিয়ে খেতে গিয়ে ভীষণ কেলেঙ্কারী, জিভ প্রায় সবটাই পুড়ে যেতে সে বলল, মিলি, ইস কী গরম রে। জিভ পুড়ে গেল। মিলি হাসছিল। —এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন? বাবা দেখলে কিছু বলবে না।

নীল তবু বলেছিল, কাউকে বলিস না।

মিলি বুঝতে পেরেছিল, পদ্মকে না বললেই নীলদা খুশি। সে বলল, না, পদ্মকে বলব না।

—বললে কিন্তু আমার ভীষণ খারাপ হবে। দেখবি ঠিক আমি মানুদার মতো অসুখে পড়ে যাবে তবে।

মিলি ভীষণ হেসেছিল। বলেছিল, তুমি খুব ছেলেমানুষ নীলদা।

ভীষণ একটা গোপন পাপ কাজের মত মনে হয়েছিল নীলের। বর্ষাকাল বলে সে নৌকায় স্কুল থেকে ফিরছে। প্রায় সন্ধে হয়ে গেছে ফিরতে তার। নৌকায় ফিরতে ভীষণ সময় লেগে যায়। সারাটা পথ ওরা সবাই পালা করে লগি মেরেছে। কখন খেয়ে গেছে, এখন গিয়েও সে কিছু খেতে পাবে না। রাতে সে খাবে। অন্যদিন সে ফিরে গরুবাছুর নিয়ে যাবার সময় গাছে গাছে ফলপাকুড় সংগ্রহ করে বেড়ায়। কখনও সে দেখতে পায়, কোনো পাকা আম গাছতলায়, জাম জামরুল, বাতাবি লেবু, আখের দিনে আখ।

সে এমনিতেই সন্ধ্যা করে ফিরেছে, তারপর সেই গোপন পাপের জন্য—মনটাও খুব প্রসন্ন না। মেজমামা খুব একটা খারাপ মানুষ না। বরং মেজমামা ওর জন্য দুটো উড-পেনসিল নিয়ে এসেছে। দুটো উডপেন্সিল পেয়ে মেজমামাকে তার মনে হয়েছে তিনি খুব উদার মানুষ। পদ্মের জন্য দুটো উড-পেনসিল মানুদার জন্য দুটো। তাকে দু দিস্তে সাদা হাতিমার্কা কাগজ দিয়েছে। অফিসে মেজমামা এগুলো বিনে পয়সায় পান। আপন পর নেই—মেজমামা সবাইকে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন।

এবং মেজমামা এসেছেন বলেই খাওয়া-দাওয়া ক-দিন খুব ভাল হচ্ছে। ভাল মাছ যা বাজারে, দিয়ে যাচ্ছে জেলেরা। পদ্মর জন্য নতুন ফ্রক এনেছেন। সুন্দর মখমলের মত নরম। মানুদার জন্য ফুলপ্যাণ্ট।

সে দেখেছে, পদ্ম ফ্রক পরে যখন ঘুরে বেড়িয়েছে তখন সে তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে। মানুদার যেন কোনো শখ নেই। সে ওটা ছুঁয়েও দেখেনি। মেজমামার সঙ্গে একটা কথা বলেনি। মেজমামা দুদিন মুখোমুখি হতে চেয়েছেন, কেমন এক ঘোলা-ঘোলা চোখ, এবং এক সকালে আবার মানুদা বাড়ি থেকে কোথায় চলে গেল। এল অনেক রাত করে। কপালে চন্দনের ফোঁটা। মেজমামা আর রাগ সামলাতে পারলেন না। আগাপাশতলা পেটালেন গরু বাঁধার খোঁটা দিয়ে। কেউ মেজমামাকে রুখে দাঁড়াতে পারল না।

মানুদা একটা গাছের মত দাঁড়িয়েছিল। একটুও নড়ছিল না। সবার চিৎকার চেঁচামেচি—মেরে ফেলছিস নবীন, কি করছিস তুই। বলে ছোট দাদু ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মেজমামার ওপর। রাতের অন্ধকারে, সবাই লণ্ঠন হাতে ছুটে

এসেছিল। পদ্ম হাউ হাউ করে বারান্দার পাল্লা ধরে কাঁদছে। পদ্মকে কাঁদতে দেখে সেও ভঁ্যাক করে কেঁদে দিয়েছিল। মানুদাকে সে খুব ভালবাসে, পদ্মকে যেন আরও বেশি। ফুলু মাসি বলছিল, বেশ করেছে. জ্বালা কত সহ্য হয়!

নীলের মনে হয়েছিল, ঠাস করে ফুলু মাসির গালে একটা চড় বসিয়ে দিলে ঠিক হয়। কে দেবে!

রাতে আর নীলের পড়া হল না। কেমন শংকা ভেতরে। মানুদা কিছু একটা ঠিক করে বসবে। দিন দিন চাপা স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে। রাতে ওর কাছে পদ্ম কেঁদেছে। বলেছে, নীলদা, দাদা এমন কেন হয়ে যাচ্ছে! নীল সকালে বলল,—মানুদা স্কুলে চল। ওর মনে হয়েছিল কোনোরকমে স্কুলে নিয়ে যেতে পারলে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডলিদি ওর স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে এসে ঠিক করেনি। কেমন বেহায়া মনে হয়েছে। কত সহজে ডলিদি সব ভুলে গেল। মানুদা ওদের সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলেছে। বোঝাই যায়নি কোনো দুঃখ আছে তার। এবং এভাবে কী হয়ে যায়। সে বারবার বলেও রাজি করাতে পারেনি—আর তখনই দরগার সেই ফকিরসাবের কথা মনে পড়ে যায়। ফকিরসাব তুমি মানুদাকে ভাল করে দাও। সে একদিন বলল—পদ্ম যাবি?

—কোথায়?

—দরগায়।

—কি করে যে যাই!

নীল বলল—তুই আমি মিলি। তিনজনে গেলে ভয় করবে না।

পদ্ম বলল—পালিয়ে ঠিক চলে যাব।

নীল বলল—মানত করে না দিলে ভাল হয় না। দিতে পারলে মানুদা ঠিক ভাল হয়ে যেত।

মেজমামা ফের কলকাতায় চলে গেছে, কথা আছে মেজমামা বাসা পেলেই ওদের সবাইকে ফের নিয়ে যাবে। সব তার নষ্ট হয়ে গেল, যুদ্ধ কতভাবে যে মানুষের অপকার করে থাকে—কোথাও যুদ্ধ না হলে মেজমামা ওদের এভাবে এমন অজপাড়াগাঁয়ে ফেলে রাখতেন না বছরের পর বছর। নীল বলেছিল তখন, পদ্ম, তোরা সত্যি চলে যাবি?

পদ্ম বলেছিল—আমি কোথাও যাব না নীলদা। এখানেই থাকব। ছোট দাদু ঠাকুমা আছে। তুমি আছ।

নীল বুঝতে পেরেছিল ভারি সরল বিশ্বাসে কথা বলে মেয়েটা। সে বলেছিল, মেজমামা তোকে এখানে রাখবে না।

তখন আকাশে ভারি মেঘ। ক-দিন থেকে অবিরাম বৃষ্টি, শরৎকাল চলে

যাচ্ছিল। দুর্গোপুজোর বাজনা আর বাজছে না। হেমন্তে ধানের শিষ আসছে। বৃষ্টি আর ভেজা বাতাসের গন্ধের সঙ্গে উঠে আসছিল ধনে-ফুলের গন্ধ। তখন পদ্ম বলেছিল—নীলদা আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

এই একটা বয়সে তার, যখন সহজেই সব বলা যায়। কোথাও পদ্ম যেতে চায় না। পদ্ম নীলকে ফেলে কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে না। সে বলেছিল, পদ্ম তোরা চলে গেলে আমিও আর এখানে থাকব না।

—কোথায় যাবে নীলদা? তুমি পড়াশোনা করে বড় হবে না! পিসেমশাই কত আশা করে আছে।

—কি যে করি!

তখন দক্ষিণের বাতাস আর বইছে না। শীতের হাওয়া বইছে। হেমন্তকালের মাঠ। চারপাশে সোনালী ধানের ছবি। এবং ফসল তোলার সময়। মেজমামী ফুলুমাসী অষ্টমী স্নানের মেলায় গেল। ছোট দাদু আর নীল মানুদা এবং পদ্ম বাড়িতে। দিদিমার মেলার কাছে বাপের বাড়ি, আগেই চলে গেছে। পদ্ম থাকল বাড়িতে। ললিত সাধুর আশ্রমে মানুদার নামে মানত আছে। মেজমামী মানত দিতে গেছে। ফেরার সময় নদীতে ডুব দেবে। অষ্টমী স্নানে পাপ ধুয়ে পুণ্য সঞ্চয় করতে গেছে ওরা। পদ্ম নীল রান্নাঘরে—রান্না হয়েছে মাছের ঝোল ভাত। পদ্ম ডাকল, দাদা খেতে আয়। নীল স্নান করে এসেছে। গরুর দুধ আছে। মাছের ঝোল ভাত, দুধ। পদ্ম পরিবেশন করছে। ফ্রক গায়ে মেয়ে বসে থাকলে কেমন রুপোলি নদীর কথা মনে হয় নীলের। সে বিকেলে চুপি চুপি বলেছিল—এই পদ্ম তুই শাড়ি পর না দেখি।

পদ্মর মুখ রাঙা হয়ে গেছিল। বলেছিল—পরব।

মানুদা যেমন বের হয়ে যায় গেছে এবং কোনো গাছের নিচে বসে থাকে চুপচাপ, কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না, কিছু বললে জবাব দেয় শুধু, তখন পদ্ম ঘরে শাড়ি পরে ডাকল, নীলদা আমাকে দেখবে বলেছিলে।

নীল পুবের ঘরে অংক করছিল। পদ্ম তাকে ডাকছে। পদ্ম দক্ষিণের ঘরে থাকে। পদ্ম সেখানে কি দেখাতে চাইছে। সে কখন ওকে শাড়ি পরতে বলেছিল মনে নেই। সে তার বই খাতাপত্র ভাঁজ করে যাবে। দেরি হচ্ছিল তার। পদ্মর সবুর সইছে না। আবার ডাকছে।—কি নীলদা আসছ না কেন?

সে বলল—যাই রে। তারপর লাফিয়ে বের হয়ে এল ঘর থেকে। বিকেলের মরা আলো সারা বাড়িটাতে। গাছপালায় ঢাকা বলে, মনে হচ্ছিল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সে উঠোন পেরিয়ে দু-লাফে ঘরে ঢুকে অবাক। পদ্মকে সে দেখতে পাচ্ছে না। সে চারপাশে খুঁজতে থাকলে বলল,—এই যে এখানে। পদ্ম ওপাশে আলমারির পাশে গোপনে লুকিয়ে আছে। শাড়ি পরায় একেবারে চিনতে পারছে

না। কত লম্বা, কত বড় দেখাচ্ছে পদ্মকে।

পদ্ম বলল—কাছে এস না।

পদ্ম মামীমার একটা দামী সিল্কের শাড়ি পরেছে। মামীমার ব্লাউজ গায়ে দিয়েছে। ঢোলা ব্লাউজের ভেতর ওর শরীর শীর্ণ দেখাচ্ছিল। আর কেমন চোখ তুলে তাকাতে পারছে না পদ্ম। তার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল।

নীল বলল—কেউ দেখে ফেললে পদ্ম!

—তুমি এস নীলদা, তুমি আমার চেয়ে কত লম্বা দেখি।

নীল কাছে গেলে পদ্ম ওর আরও কাছে চলে এসে দু-হাতে জড়িয়ে হাত তুলে মাপল, মাত্র চার আঙুল, দ্যাখো তুমি আমার চেয়ে খুব বড় না। বলে সে কেমন আরও জড়িয়ে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাপছে। নীল একটা গাছের মত দাঁড়িয়ে আছে। লতাপাতার মত ওর শরীর জড়িয়ে থাকতে চাইছে পদ্ম, বড় নীচু গলায়, যেন স্বর বের হচ্ছে না—পদ্ম বলল—যাবে নীলদা?

—কোথায়।

—এই কোথাও। তারপর ধীরে ধীরে বলল—আস্তানা সাবের দরগায়। আমরা দুজনে মোমবাতি জ্বালাব। কেউ বাড়ি নেই। দৌড়ে চলে যাব দৌড়ে ফিরে আসব।

এই সব কথার ভেতর পদ্মের যে কি হচ্ছে! পদ্ম বুঝি পৃথিবীর যাবতীয় অমঙ্গল থেকে ধরণীকে পবিত্র রাখতে চায়। সে বলল—যাব পদ্ম। মোমবাতি জ্বেলে দিতে না পারলে মানুদা সত্যি আর ভাল হয়ে উঠবে না।

ছোট দাদু সারা বিকেল ধরে একটা গাছ লাগাবার জায়গা করছিলেন। বাড়ির চারপাশে যত গাছপালা, এই যেমন লম্বা তালগাছটা দাদু এনেছিলেন মুড়াপাড়া থেকে। তিনি দু-জন মুনিষের সঙ্গে গাছটার সঙ্গেই পায়ে হেঁটে দশ ক্রোশের মত পথ হেঁটে এসেছিলেন। বাড়িতে যতবার তালের আঁটি পুতে গাছ লাগাতে গেছেন মরে গেছে, ঠিক জল হাওয়া না হলে যা হয়, এবং কি করে তিনি জেনেছিলেন চরের কাছে যে মাটি আছে তাতে আঁটি পুতে দেওয়া হলে গাছ বাঁচতে পারে। তারপর সে আঁটির অঙ্কুরোদগমের অপেক্ষা, তারপর সে গাছে পচা সার দিলে, এমন জলজ জায়গায় গাছ বাঁচানো যেতে পারে।

সেই সব পচা সার সংগ্রহের জন্য দাদু বছরের পর বছর সব পাতা ডাল কেটে দিনের পর দিন সঞ্চয় করেছেন—এবং প্রায় গল্প গাথার মত হয়ে আছে এই তালগাছের জীবন ধারণ। একজন মানুষ আর প্রকৃতির যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রথমে গাঁয়ের মানুষেরা টের পেয়েছিল। তালগাছ বাঁচবে না, জল হাওয়া অনুরূপ নয়, তিনি বাঁচাবেনই। এভাবে এই বাড়িতে আছে সফেদা ফলের গাছ, লিচু গাছ এবং একটি অতীব মহার্ঘ ফলের গাছ, যা তিনি বড় করে তুলেছিলেন আপ্রাণ

চেষ্টায়—কমলালেবুর গাছ। গাছটি বেঁচেছে, ফলদান করে থাকে অজস্র, কিন্তু এত টক যে কেউ গাছের তলায় যেতে চায় না। ছোটদাদু প্রকৃতির কাছে এভাবে বারবার হেরেও আবার নতুন একটি আঙুর লতার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সারা শীতকালটা এ গাছটাই তাঁকে ঠিক একজন যুবকের মত বাঁচিয়ে রাখবে। তিনি মাচান করে দিচ্ছিলেন, এবং খুব নিবিষ্ট, গাছের লতা তিনি বেশ জড়িয়ে দিচ্ছিলেন, এবং বিকেল মরে আসছে। পদ্ম দরজায় দরজায় জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বেলে দেবে—নীল মাঠ থেকে গরু বাছুর নিয়ে আসছে। শীতের ঠাণ্ডা ক্রমে নিবিড় হচ্ছে আকাশে বাতাসে। তখন তিনি সহসা শুনতে পেলেন, পদ্ম তাঁকে ফিস ফিস করে কি বলছে!

দাদু বললেন, যা। চোখ তুলে মেয়েটাকে একবারও দেখলেন না! পদ্ম শাড়ি পরেছে দেখতে পেলে বুড়োর চোখেও তাক লেগে যেত। তিনি শুধু বললেন, সকাল সকাল চলে আসবি। নীলকে সঙ্গে নিয়ে যা।

পদ্ম বেশ ম্যানেজ করেছে তবে। পদ্ম বলেছিল, মিলির সঙ্গে যাচ্ছি। করিম চকিদার সঙ্গে থাকবে। দরগায় মোমবাতি জ্বালাব। দরগার নামে বুড়ো মানুষ না করতে পারেন না। ধর্মটর্ম আছে, আস্তানা সাব ছিলেন বড় পীর। নানা রকম কিংবদন্তী আশেপাশে সব ছড়িয়ে আছে। না বলে তিনি আর একটা বিপদ ডেকে আনতে কিছুতেই সাহস পান না।

পদ্ম বাড়ি থেকে নেমেই ডাকল, নীলদা।

নীল যতদূরেই যাক বাতাসে শুনতে পায় পদ্ম ডাকছে। যেন এক আশ্চর্য স্বর বাতাসে ভেসে আসছে। নীলদা ডাকলেই সে ভেতরে কেমন মুহ্যমান হয়ে যায়। তার কোনো দুঃখ থাকে না। সে বেঁচে আছে বড় সুখে বেঁচে আছে। স্বপ্নময় মনে হয় সব কিছু। আকাশে শীতের জ্যোৎস্না। গাছপাতার ফাঁকে বৃষ্টিপাতের মত মনে হয় জ্যোৎস্না আকাশ থেকে চুঁইয়ে পড়ছে। তার ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পদ্ম সাদা গরদ পরেছে। শাড়ি পরে পদ্ম ভালভাবে হাঁটতে পারছে না। একটা পেতলের থালাতে দুটো মোমবাতি। প্রায় আলগোছে সে থালা হাতে কিছুটা দূরে পূজারিণীর মত যাচ্ছে। চোখে-মুখে গাছপাতার মত সজীব পবিত্রতা। গাঁয়ের কেউ দেখলে বলেছে—দরগায় যাচ্ছি। দরগায় মানুষ কেন যায়, সবাই জানে। রোগে, শোকে জরায় মানুষের কোনো অবলম্বন না থাকলে দরগার মাজারে যায়। বড় বিশ্বাস এই লৌকিক দেবতাকে। তারা হাত তুলে তখন দরগার পীরকে নিজের দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তুমি আছ ফকিরসাব আমাদের আর ভয় কি।

পদ্ম বলল, দাদুকে বলেছি করিম যাচ্ছে। ঘোড়াটা থাকছে সঙ্গে।

নীলের মনে হল, মিলিকে সঙ্গে নিতে পারলে ভাল হত। গ্রামের শেষে, খানাখন্দ পার হয়ে তেঁতুলের বাগান পার হয়ে ছোট মত একটা টিলা পার হয়ে

যেতে হয়। তারপর সেই রাস্তা। অন্তহীন রাস্তার মত সেটা পীরের দরগায় ঢুকে গেছে। দরগা শেষ হলে কবরখানা। মৃত সব মানুষেরা শুয়ে থাকে। তাদের হাড় কঙ্কাল কখন-সখনও মাটির ওপরে ভেসে উঠলে ভয়। ভয়ের কথা মনে হলেই পদ্ম ফকিরসাবের কাছে স্মরণ নিতে চায়। তিনি যখন আছেন তখন সে আর তেমন ভয় পায় না।

কেমন একটা নির্ভরতা এই ফকিরসাবের ওপর তার ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। নীলদাকে নিয়েই যত ঝামেলা।

ওরা নিরিবিলি যখন গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, লণ্ঠনের আলো আর চোখে পড়ছে না, নিশুতি রাতের মত নিঝুম গাছপালা, সব মাথার ওপর শীতে শক্ত হয়ে আছে তখন পদ্ম বলল, নীলদা, এসো মোমবাতি জ্বেলে নি। এ-ভাবে ওরা দুজন দুটো মোমবাতি জ্বেলে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে।

ক্রমে গাছপালা ঘন গভীর হয়ে উঠছে দুপাশে। মালা-তাবিজ পরে যদি সেই বুড়ো মানুষটি যে মাঝে মাঝে মুসকিলাশানের লম্ফ নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে বের হয়ে যায়, যে একা মানুষ; দরগার পাশে মাচানের মত করে থাকে, কালো আলখাল্লা গায়, লম্বা সাদা দাড়ি, চুল সাদা, এবং এক নিবাস গড়ে তুলেছে এই বন-জঙ্গলের ভেতর—সে থাকলে অকপটে হাঁটুমুড়ে মাজারে ওরা চুপচাপ বসে থাকতে পারবে।

তারপর প্রায় দুই তরুণ-তরুণী দেখবে ক্রমশ মোমবাতি পুড়ছে, ওদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে, পুড়তে পুড়তে একেবারে যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন উঠে পড়ার নিয়ম। মোমবাতি যতক্ষণ জ্বলবে—এক এক করে তখন সব প্রার্থনা জানাতে হবে, তোমার কি আকাঙ্ক্ষা, তোমার কি দুঃখ, তোমার সুখের জন্য পৃথিবীতে আর কি কি চাই সব এক এক করে বলে যেতে হবে আস্তানা সাবের মাজারে।

দু হাঁটু মুড়ে এই যে বসে থাকা, যেন নিরবধিকাল এভাবে বসে থাকা। মানুষের কিছু চাই। আস্তানা সাব তখন অন্তরীক্ষে—সব দেখতে পান তিনি এমন দুজন বালক-বালিকা নির্ভয়ে তাঁর মাজারে বসে প্রার্থনা করার জন্য আসছে—তিনি তাদের জন্য ভাল কিছু না করে থাকতে পারবেন না।

ওরা দুজন বেশ ধীরে ধীরে, পদ্মর দু হাতে মোমবাতি ধরা, নীলের দু হাতে মোমবাতি, ওরা পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে—কোথাও পৃথিবীর তখন যুদ্ধ হচ্ছিল, কোথাও তখন মহামারীর মত দুর্ভিক্ষ, আর মানুষের অন্তহীন যাত্রা, মানুষ এভাবে ক্রমে এগিয়ে যায়—পদ্ম শুনতে পেল তখন গাছের নিচে অন্ধকারে কেউ ডাকছে তাদের—এই যে, নীল-পদ্ম। যেন ফকিরসাব বলছেন, জলাশয়ে নীলপদ্ম ফুটছে।

পদ্ম বলল, আমি পদ্ম ফকিরসাব।

নীল বলল, আমি নীল ফকিরসাব।

মালা-তাবিজ-পরা রক্ষণাবেক্ষণকারী ফকিরসাব তাদের দেখে এগিয়ে এলেন— বললেন মোমবাতি জ্বলছে।

পদ্ম বলল, জ্বলছে।

ফকিরসাব হেসে বললেন, আসলে নীলপদ্ম ফুটছে।

নীল বলল, আমরা আস্তানা সাবের মাজারে যাচ্ছি ফকিরসাব।

তিনি বললেন, যাও কোনো ভয় নেই। মাচানে আমি আছি।

ওরা দুজন এভাবে নির্ভয়ে এবার এগিয়ে যেতে থাকল। নীল পরেছে লম্বা সোয়েটার, পাজামা। পা খালি। পদ্মরও পা খালি। ঘাস-পাতার ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছে তারা। ওরা মাজারে দেখতে পেল, সুন্দর প্রাচীন উর্দু হরফে কী সব সোনালী জলে লেখা। কত সব রকমারী পাথর লাল নীল সবুজ কাচে মোড়া। মোমের আলোতে সারাটা মাজার, পাশের গাছপালা আর এই দুই বালক-বালিকা—ঠিক বালক-বালিকা বলা চলে না, যেন ওরা পৃথিবীর সব গোপনতম রহস্য জানতে আস্তানাসাবের দরগায় চলে আসছে। আসলে এই মানুষের দুই অপোগণ্ড ভেতরে ভেতরে বড় হয়ে যাচ্ছে, এবং শরীরের এ-সব ইচ্ছেরা যখন বড় হয়ে যায়, তখন যাবতীয় সুষমা শরীরে দিয়ে দেন ঈশ্বর। ওদের এখন বড় হবার বয়স। মাচানে ফকিরসাব চোখ বুজে মুসকিলাশানের আলোর সামনে বসে আছেন। দূর থেকে তার গলার আওয়াজ ভেসে আসছে।—যাবার সময় ফোঁটা নিয়ে যাস নীলপদ্ম।

পদ্ম বলল, আস্তানাসাবের কাছে কি চাইবে নীলদা?

—কি চাইব। মানুদা ভাল হয়ে উঠুক চাইব। তুই?

—আমি যে কি চাই?

—কেন কিছু চাইবি না? তবে এলি কেন?

—কেন যে এলাম জানি না।

—তোর কিছু চাইবার নেই পদ্ম! যেন পদ্ম তখন বলতে পারত—আমি যে একটা নীলপদ্ম চাই। কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। সে তখন এক সরোবর দেখতে পায়। ফকিরসাবের কথা শুনে তার মনে হয় সত্যি তবে সরোবরে নীলপদ্ম ফুটেছে। সে কেমন সহসা বলে ফেলল—তুমি বড় হয়ে আমাকে একটা নীলপদ্ম এনে দেবে?

কি যে সব বলছে পদ্ম সে বুঝতে পারছে না। পদ্ম হাঁটু গেড়ে বসেছে। মাজারে মোমবাতি বসিয়ে দিচ্ছে। সেও মাজারে মোমবাতি বসিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। পদ্মকে এখন চেনা যায় না। সে যেন এক দূরের দেশে চলে গেছে।

অনেক দূর দেশ থেকে তার কথাবার্তা সে যেন শুনতে পাচ্ছে। আসলে পদ্ম কিছু বলছে না, কেউ তার ভেতরে ভর করে সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছে। পদ্মর নির্লিপ্ত মুখ দেখে ওর ভয় ধরে গেল। সে বলল, এই পদ্ম তুই কি আজে-বাজে বকছিস! আমার কিন্তু ভয় করছে।

পদ্মর তাতে কিছু এল গেল না। সে তেমনি মাজারে মাথা নুইয়ে রেখেছে। ওর দু-বেণী দু-পাশে। দুহাত ছড়ানো মাজারে। পদ্ম না তাকিয়েই বলল, নীলদা তোমার কষ্ট আমার সহ্য হয় না। তুমি বাড়ি চলে যাও।

নীল বলল, আর তো একটা বছর, তারপর পরীক্ষা। দেখবি আমি খুব ভালভাবে পাশ করব। আমার তখন আর কোনো কষ্ট থাকবে না।

কেমন শোকার্ত রমণীর মত পদ্ম মাথা রেখেছে মাজারে! মোমবাতি তেমনি জ্বলছে। গাছের পাতা পড়ছে দুটো-একটা। বনের ভেতর সব নানারকম কীট-পতঙ্গের আওয়াজ। শেয়ালেরা হাঁকছে দূরে। মাচানে বনের গভীরে বসে আছেন সেই রক্ষণাবেক্ষণকারী মুসকিলাশানের মানুষটা। ওখানে মাঝে মাঝে দপদপ করে আগুন জ্বলছে। পদ্ম কেবল তাকিয়ে আছে নীলের দিকে। পদ্ম কেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

তখন সেই ফকিরসাব হাঁক দিলেন, আশ্চর্য সেই হাঁক। নীলপদ্ম ফুটছে।

নীল ডাকল, এই পদ্ম।

পদ্ম বলল, হুঁ।

—তুই এ-ভাবে তাকিয়ে আছিস কেন?

—তোমাকে দেখছি নীলদা।

—আমার কি দেখছিস?

—ঠিক জানি না।

আবার হাঁক, ফকিরসাব ডাকলেন, নীল ফোঁটা নিয়ে যাস। একটা পয়সা দিবি। নীলপদ্ম ফুটছে।

ক্রমে মোমবাতি শেষ হয়ে আসে। আবার গাছের মাথায় সেই জ্যোৎস্না বৃষ্টিপাতের মত নেমে আসে নিচে। আলো নিভে গেলে ওরা মাজার থেকে উঠে এল! কিন্তু কেমন রহস্যময় পথ, জ্যোৎস্না, পাখিদের কলরব কোথাও এবং অস্পষ্ট কুয়াশার মত সাদা জ্যোৎস্নায় ওরা বনের গভীরে ঠিক পথ চিনে এগুতে পারছিল না। নীলের হাত ধরে গা ঘেঁষে কেমন এই সব অপরূপ বনভূমির ভেতর পদ্মর হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। নীল পদ্মের শরীরে তখন ফুল ফোটার গন্ধ পাচ্ছিল।

তখনই আবার ফকিরসাব হাঁকলেন, নীলপদ্ম ফুটছে।

ওরা এবার মাচানের আলো দেখে বের হবার পথ খুঁজে পেল। এবং

ফকিরসাব যেন একটা নতুন শব্দ, যেমন ওরা জানত না, পদ্ম এবং নীল মিলে গেলে নীলপদ্ম হয়ে যায়। ফকিরসাব কত সহজে বলে ফেললেন, নীলপদ্ম ফুটছে। পদ্ম নীলকে ধাক্কা দিয়ে বলল, ফকিরসাব কি বলছে! পদ্ম তারপর বনভূমির ভেতর কথাটার গোপন অর্থ বুঝতে পেরে নীলের হাত ধরে ছুটতে থাকল।—নীলদা ফোঁটা নেবে না! ফকিরসাবের মাচানের নিচে হাঁটু গেড়ে বসল। ফোঁটা নিল মুসকিলাশানের। তারপর দৌড়ে মাঠে নেমে গেল। সাদা জ্যোৎস্নায় ক্রমে হারিয়ে যেতে থাকল নীলপদ্ম।

এগার

দেখতে দেখতে আবার নীলের পৃথিবীতে বর্ষাকাল চলে এল। চৈত্রের খাঁ খাঁ রোদ্দুর, বৈশাখের ঝড় বাতাস কাটিয়ে সব মেঘেরা এল ধেয়ে। জৈষ্ঠ্যের প্রথম ঘন বর্ষণ আরম্ভ হয়ে গেল। সব ভিজে উঠেছে। গাছপালা মাটি। সবুজ হয়ে গেছে দিক চক্রবাল। যেদিকে তাকানো যায় শুধু সবুজের সমারোহ। দাদুর জ্বর হয়েছে। শুয়ে আছেন তিনি। পায়ের কাছে বসে নীল দুলে দুলে বিদ্যাভ্যাস করছে। ঘন বৃষ্টি মাথায় সে গিয়েছিল সকালে মিলির বাবার কাছে। দাদুর জ্বর। কাসি। উঠতে পারছে না। কবিরাজ ছাতা মাথায় দেখে গেছে। ওষুধ দিয়েছে। তিন গণ্ডা বড়ি। স্বর্ণ সিন্দুর চার পুরিয়া। বাসক পাতা, শেফালী পাতা, আনারসের কচি ডিগ তুলে রেখেছে নীল। দাদু এ বাড়ির প্রাচীন বৃক্ষের মত। সে একটা নবীন বৃক্ষ বুঝতে পারে। সব কিছুর দায় এসে পড়ছে অযাচিত ভাবে তার ওপর। পদ্ম রস ছেঁচে দিয়েছে। দিদিমা বড়ি মেড়ে দিয়েছে। নীল জল কাদায় ঘরে ঢুকে বলেছে, ছোটদাদু, ওষুধ। ফুলু মাসির কফ্ কাশিতে খুব ঘেন্না। এ-ঘরে আসতেই চায় না। সে বলল, দাদু আপনার ওষুধ। উঠুন। ধরব?

—তুই কেন আবার এ-সব করতে যাস। পড়াশোনা করছিস না। বড় হবি কি করে, খাবি কি করে!

নীল কিছু বলল না। পায়ের নিচে ওর খাতা বই। দাদুর ওষুধ খাওয়া হয়ে গেলেই সে আবার পড়তে বসবে।

—ধরব? বলে নীল ওষুধ জল মেঝেতে রেখে দু-হাতে দাদুকে তুলে ধরল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সে মহাভারতের সেই ভীষ্ম চরিত্রটির মত কেন জানি দাদুকে ভেবে ফেলে। লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। এক মাথা ঘন সাদা চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শীর্ণ হাত পা। এবং বুকে ঘড় ঘড় শব্দ। আর বাইরে বৃষ্টি, ঠাণ্ডা হাওয়া। এবং সব গাছগুলো মিলে যেমন, সেই তাল গাছ, বাতাবি লেবু, আম জাম, সফেদা ফলের গাছ আঙুর লতার ভেতর একজন মহিমময় মানুষকেই

সে অনুভব করতে পারে।

তারপর ওষুধ খেলে ফের শুইয়ে দিল নীল।

দাদু বললেন, নীল তোর স্কুল কবে খুলবে?

নীল বলল, বিশে জৈষ্ঠ।

—আজ কত তারিখ রে!

—দু তারিখ।

—তা হলে দেখছি তোর স্কুল খোলার আগেই আমি চলে যাব!

নীল বলল, হ্যাঁ চলে গেলেই হল।

—তোর রাঙামামাকে ন'মামাকে চিঠি লিখে দে।

—কি লিখব।

—আসতে লিখে দিবি।

আসলে নীল বুঝতে পারে এ-বাড়িতে কী করে এই বুড়ো মানুষটার সে একমাত্র অবলম্বন হয়ে গেছে। মার জন্য বুড়ো মানুষটার খুব ভাবনা।

—বড় হয়ে কিন্তু মাকে সুখে রাখবি।

নীল এ-সব কথার অর্থ ঠিক ঠিক ধরতে পারে না। সে বলল, তুমি কাল থেকেই দাদু ভীষণ প্যাচাল পাড়ছ। চুপ করো না!

—ও আচ্ছা। তোর পড়ার ক্ষতি হচ্ছে!

নীল বলল, স্কুল খুললেই তো পরীক্ষা!

—তা হলে আর সময় নষ্ট করিস না। কটা দিন খুব পড়ে নে।

তারপর বুড়ো মানুষটা বলল, এ-সময় না মরলেই চলত। কিন্তু কি করে বুঝব বল, বর্ষা ভাল করে আসতে না আসতেই চলে যেতে হবে আমাকে।

নীল বলল, আচ্ছা আপনি কি আবল তাবল বকছেন বলুনতো!

বুড়ো মানুষটা তখন কেমন ক্ষীণ গলায় বলল, মন খারাপ হচ্ছে খুব। বুঝতে পারি।

নীল বলল, চুপচাপ শুয়ে থাকুন। কাঁথাটা গায়ে দিয়ে দেব!

—আমি সব বুঝি। পদ্ম তোকে খুব ভালবাসে নারে!

নীলের বুকটা কেমন খচ করে কামড়ে ধরল।

—পদ্ম বড় ভাল মেয়ে। সারাজীবন মেয়েটা দুঃখ পাবে।

নীল বলল, দাদু আপনি চুপ করবেন না বই খাতা সব তুলে রাখব।

ছোট দাদু আর একটা কথা বললেন না। নীল কাঁথাটা ভাল করে শরীরে জড়িয়ে দিল। তারপর ঐকিক নিয়মের কিছু অংক পর পর করে গেল। একটা অংকের গড় হিসেব কিছুতেই মিলছে না। মেজ-দিদিমা মুখ বাড়িয়ে ভিজতে ভিজতে একবার বলে গেল, জ্বর দেখেছিস নীল!

—মনে হয় জ্বর আছে।

এ-ঘরে আজকাল কেউ বড় আসেই না। নীল ঘরটা পরিষ্কার করে রাখে। ছোট দাদু আর তার ঘর এটা হয়ে গেছে। মাসে দু-একবার দিদিমা ঘরটা লেপে দিয়ে যায়। পদ্ম মাঝে মাঝে চুপি চুপি ঢুকে পড়ে। নীলের বই খাতা পেনসিল সব ঠিকঠাক করে রেখে দেয়। মানুদা আজকাল আর আগের মত হঠাৎ উধাও হয়ে যায় না। আবার আগের মত মামীমার কথাবার্তা শুনছে। পদ্ম দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টি পড়া দেখছিল। চারপাশে সন্তর্পণে দেখছে। এই বৃষ্টির ভেতর নীলদার ঘরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে। সে বলল, মা দাদুর বার্লি হয়েছে?

বার্লিটুকু আর এক গ্লাস জল নিয়ে সে নীলদার ঘরে যাবার সুযোগ পাবে। সেই আশায় বসে আছে। নীলদা কি করছে। নীলদার কত কাজ, পড়াশোনা হয়ে গেলেই গরুগুলো ছাড়া বাড়িতে বেঁধে দিয়ে আসতে হবে, তারপর নীলদার হাতে কোনো কাজ না থাকলে মা একটা না একটা কাজ দিয়ে দেবে, যেমন গাছপালা থেকে বড় বড় ডাল কেটে ফেলা, ডালগুলো শুকোলে ছোট ছোট করে কাটা, আঁটি বাঁধা সব কাজই নীলদা করবে। দাদা সাক্ষী গোপালের মত সঙ্গে থাকবে শুধু।

এখন এই বর্ষায় মা নীলদাকে কি বলবে বুঝতে পারছে না। বার্লি নিয়ে যখন গেল, হয়তো দেখবে আসল মানুষটাই ঘরে নেই। ঘরে না থাকলেও সে যতটা পারে নীলদার বই খাতাপত্র, জামা প্যাণ্ট, সুটকেসের মধ্যে সময় কাটিয়ে দেয়। আর বার বারই কিছু লিখে রাখতে ইচ্ছে করে। মুখেতো সব কথা বলা যায় না। সে দুবার গোপনে ওর ইংরেজি খাতায় কিছু লিখেও ফেলেছিল। তারপর কেমন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। মার মুখ, বাবার রুষ্টতা, এবং ফুলুমাসির হুল ফোটানো কথাবার্তার কথা মনে হলেই কিছু আর পারে না। সে কেটে দেয়। মুছে দেয়। তারপর পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে কোথায় যে লুকিয়ে রাখবে বুঝতে পারে না।

নীলদার কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে টিনের চালে। দাদুর ক-দিন থেকে জ্বর। গতকাল থেকে প্রবল কাসি। কবিরাজ কাকা দেখে গেছে সকালে। তখন সবাই ঘরে গিয়েছিল একবার। দাদু হাঁ করে জিভ দেখিয়েছে। কবিরাজ কাকা চোখ টেনে দেখেছে। বয়স কত হল একবার জিজ্ঞেস করেছে। তারপর নীলদার দিকে তাকিয়ে বলেছে, আয়, ওষুধ দিচ্ছি। আর কিছু বলেনি।

নীল তখনই শুনল, দাদু আবার বলছে, কিরে চিঠিগুলো লিখলি?

—লিখব।

—লেখা এখনও হল না।

নীল বলল, আবার আপনি প্যাচাল পাড়ছেন।

—অঃ মনে থাকে না।

নীল বই খুলে মাত্র পড়বে, আকবর ওয়াজ এ গ্রেট এমপারার তখনই আবার দাদু বললেন, আমি না থাকলে, কোনোরকমে আর একটা বছর কাটিয়ে দিতে পারবি না!

নীল বলল, পারব।

—ওদের বলে যাব, তোর পড়ার খরচ দিতে। তুমি এখন মন দিয়ে পড়। আমার জন্য ভাবতে হবে না।

—পড়তে দিচ্ছেন কোথায়!

আবার ছোট দাদু চুপ মেরে গেলেন। দু তিনটে বড় আকারের মাছি মুখে বসেছে। দুর্বলতার জন্য হাত নাড়তে পারছেন না ভালভাবে। নীল লক্ষ্য রাখছে। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে মাছিগুলো। একটা মালসা আছে নীচে। ওটাতে কফ থুতু ফেলছেন। কাসি উঠলেই সে কাছে ওটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে।

—দাঁড়িয়ে থাকলে হবে, পড়বি না!

নীলের কেমন ভাল লাগছিল না। দাদু কেমন অবুঝ হয়ে উঠছে। সে বলল, কবিরাজ মামা এলে বলে দেব। আপনি কেবল কথা বলেন।

—নীল তুই আমার হয়ে চিঠিগুলো লিখে দেনা ভাই। তোর মাকে লিখে দে আগে। ও চলে আসুক। তুই ছেলেমানুষ পারবি না।

—কি লিখব।

—লিখবি, আমার সময় হয়ে গেছে। বুড়ো হয়েছি, শোক তাপ করতে বারণ করে দিবি। পত্র পাঠ যেন তোর মা চলে আসে। আর তোর মামাদের লিখবি, আমি তোর স্কুল খোলার আগেই চলে যাব। যদি দেখার ইচ্ছে হয় যেন আসে। ছেলেদের ওপর বড় অভিমান তাঁর। একবার এসে বুড়ো বাপকে দেখেও যায় না।

নীলের বুক বেয়ে কেমন একটা চাপা কান্না উঠে আসে। এই ঘরটায় সেই কবে থেকে সে, সুধন্য আর দাদু আছে। সুধন্য চলে যাওয়ায়, সে আর দাদু। দাদু চলে গেলে সে একা। এত বড় ঘরটায় সে একা থাকবে কি করে বুঝতে পারছে না। সে বলল, দাদু একা থাকব কি করে। আপনি যাবেন বললেই হল!

—সুধন্যকে লিখে দে চলে আসতে। ওদের কিছু বলবি না। একটা কথাও বলবি না। তোর রাঙা মামাকে আমার হয়ে লিখে দে, যা যা বলছি লিখে দে। কি লিখছিস। একবছরের মত তোর আর সুধন্যর খরচ...

নীল বলল, হ্যাঁ লিখছি।

—আজই পোস্ট করে দিস।

—দেব।

—কেউ জানবে না, বলবি না বল!

—না বলব না।

—সব স্বার্থপর। পদ্মকে ডাক না, পদ্মকে দেখি।

নীল মুখ বাড়িয়ে ডাকল, পদ্ম দাদু তোকে ডাকছে।

পদ্ম বলল, বার্লি নিয়ে যাচ্ছি।

পদ্ম এলে বুড়োমানুষটা বলল, কি দিদি কেমন মনে হচ্ছে!

পদ্ম বুঝতে না পেরে নীলের দিকে তাকাল। নীল সন্তর্পনে একটু ওদিকে ডেকে নিয়ে বলল, দাদু বলছে, আমার স্কুল খোলার আগেই মরে যাবে।

পদ্ম বলল, আপনি মরে যাবেন কে বলেছে?

—আমি টের পাইনা বুঝি। তোর ছোট ঠাকুমা কালতো দেখা করে গেল।

পদ্মর এই দোষ। দাদু মরে যাবে শুনেই টস টস করে চোখের জল পড়তে থাকল।

নীল বলল, আমরা আস্তানাসাবের দরগায় যাব। আবার মোমবাতি জ্বালব। আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।

—চিঠিগুলো পাঠালি!

পদ্ম আবার তাকাল। নীল সব খুলে বললে, পদ্ম বলল, উঠুন, বার্লি খান।

নীল এবং পদ্ম দু-জনে ধরাধরি করে বসাল। মানুষ বুড়ো হলে সবাই কেমন অবহেলায় ফেলে রাখে। দাদু যে এত দুর্বল হয়ে গেছে পদ্ম এই প্রথম টের পেল। কাল বিকেলেও দাদু বিছানা থেকে নেমে জলচৌকিতে বসেছিলেন, একটু তামাক সাজিয়ে দিয়েছিল নীলদা, খেয়েছিলেন, আজ কেমন সত্যি মনে হল চোখ ঘোলাটে, দুর্বল, মাছিগুলো বেশি জ্বালাতন করছে।

পদ্ম বলল, আমি আর নীলদা মিলে সব চিঠি লিখে ফেলছি।

বুড়োমানুষটা বলল, আর কাউকে বলিস না, তোরা চিঠি লিখে দে। পদ্ম তোর মা ভাল না। খুব স্বার্থপর।

নীল বলল, কি যা খুশি বকে যাচ্ছেন।

বুড়ো মানুষটা বলল, মরে যাবার আগেও তোরা দুটো একটা সত্যি কথা বলতে দিবি না নীল। এতদিন কিছু বলিনি। পদ্ম তোর মাকে কিছু বলছি বলে রাগ করছিসনা তো দিদি।

—রাগ করব না! বারে, আমার মাকে বলবেন, আমি বুঝি রাগ করব না?

—ঠিক আছে, তবে আর কোনো সত্যি কথা বলব না।

নীল কেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দাদু আবার শুনতে না পায় সে দরজার সামনে চলে গেল। ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে। পদ্মর আবার এক দোষ, নীলদাকে কাঁদতে দেখে সেও ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল। নীল বলল, দাদু সকাল থেকেই কি আজে বাজে বকছে।

পদ্ম বলল, এস চিঠিগুলো লিখে ফেলি।

নীল দাদুর বালিশের তলা থেকে কিছু রেজকি পয়সা বের করে চলে গেল খাম আনতে। গোপনে সে আর পদ্ম লিখে চলল এক এক করে সব চিঠি। দাদুর একটা খেরো খাতায় সব ঠিকানা লেখা। সেই ঠিকানায় সব চিঠিগুলো পাঠিয়ে দিতে থাকল। দাদু যা যা বলেছে সব লিখে দিল চিঠিতে।

দুপুরে এসে মিলির বাবা অনেকক্ষণ বসে দাদুকে ফের দেখল।

দাদু বললেন, কি বুজছ!

মিলির বাবা বলল, যাবেন না।

দাদু হেসে বললেন, আর আটকাতে পারবে না।

পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মেজমামী, দিদিমা, মানুদা সবাই। কেবল ফুলুমাসি দরজায় দাঁড়িয়ে। অসুস্থ শুনে বিকেলের দিকে কেউ কেউ এসেছে। ওরাও পাশে দাঁড়িয়েছিল।

মেজমামী কবিরাজ মামাকে উঠোনে ডেকে বলল, কেমন দেখলেন।

—বেশ দুর্বল। একবেলা দুধ বার্লি মিলিয়ে দিন।

—ভয় টয়ের কিছু নেই তো!

—না। ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে।

নীল বলে ফেলতে গেছিল, স্কুল খোলার আগেই দাদু বলেছে চলে যাবে। কিন্তু দাদু আবার বলেছে, কাউকে বলবি না। নীল বলতে পারল না। পদ্মও দাদুকে কথা দিয়েছে, সে বলতেই পারল না, সবাইকে চিঠি লেখা হয়ে গেছে, দাদু স্কুল খোলার আগেই চলে যাবে বলেছে।

সাদাখামে সব চিঠিগুলো লুকিয়ে পদ্ম ফেলে এল মিলিদের ডাকবাকসে। নীল-ডাকবাকসটা একজন মানুষের চলে যাওয়ার খবরগুলো কেমন গিলে ফেলল। পদ্ম চিঠিগুলো ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ ডাকবাকসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। সত্যি তবে দাদু চলে যাচ্ছে। এবং যখন চলে যাবেন তখন কাছে দাঁড়িয়ে ঠিক ঠিক কেমন দেখাবে যাওয়াটা চোখ বুজে টের পেতে চাইল। মিলি নেই। থাকলে সে ওর সঙ্গে আজকের দিনে কথা না বলে পারত না।

আর এ-ভাবেই কেমন এক প্রিয়জনের মুখ দেখে ফেলে। নীলদা বুড়ো হলে মুখটা না জানি কি রকম দেখাবে! অথবা শৈশবে দাদু দেখতে নীলদার মতই ছিল বুঝি। এবং একজন বুড়ো মানুষের মৃত্যু ভাবনায় সে কেমন মুষড়ে পড়ল। বাড়ি ফিরে নীলদাকে সে খুঁজল। নীলদা স্নান করতে গেছে। স্নান করে ঠাকুর ঘরে ঢুকবে। ঠাকুর পূজা হলে একটু চরণামৃত দাদুর কপালে ঠোঁটে ছুঁইয়ে দিতে হবে। এগুলো সংসারে খুব দামী ব্যাপার মনে হয় পদ্মর।

এবং নীল যখন নিবিষ্ট মনে পুজো করছিল, পদ্ম দরজায় হেলান দিয়ে দেখছে। নীলদাকে খুব ছেলেমানুষ মনে হয় না। সামান্য গোঁফের রেখা ক্রমে স্পষ্ট

হয়ে উঠছে। এমন সুন্দর নিবিষ্ট মুখ যেন জীবনেও দেখেনি। অপলক সে নীলকে কেবল দেখে যাচ্ছিল। পাশের ঘরেই দাদু লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। ঘণ্টা নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। পুজো শেষ হলে নীলদা শংখে ফুঁ দেবে জোরে। দাদুর তসরের কাপড় সে পরে নিয়েছে। যেন এ-ভাবেই বুড়ো মানুষটা শৈশবে মানুষের মঙ্গলের নিমিত্ত পুজো আর্চা করত। হুবহু দাদুর মতই নীলদা চোখের সামনে ধীরে ধীরে একটা বুড়ো মানুষ হয়ে যাচ্ছে।

পুজো হলে নীল বলেছিল, দিয়ে এলি পদ্ম।

পদ্ম বিমূঢ়। মলিন মুখ। চোখ বড় বড়। চুল এসে উড়ে কপালে পড়েছে। এক আশ্চর্য সৌন্দর্য খেলা করে বেড়াচ্ছিল পদ্মর মুখে।

নীল কোষা দিয়ে সামান্য চরণামৃত ছোট সাদা পাথরের বাটিতে রেখে দিল। কাঁসর বাজাল। প্রতিবেশীদের ছোট ছোট শিশুরা ছুটে এল। সে চাল কলা মেখে বিলিয়ে দিতে থাকল সব শিশুদের। এবং বিকেলেই দাদুর অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকে যেতে থাকল।

আর পাঁচ সাতদিনের ভেতরই বাড়িতে সব আত্মীয় কুটুমে ভরে যেতে থাকল। একজন বুড়োমানুষ চলে যাচ্ছেন খবর পেয়েই সবাই এসেছে। মেজমামী অবাক। ওরা এতটা ভাবেই নি। যেন সময় মত সবাই চলে এসেছে। গতকালও অবস্থা খারাপ ছিল না। বাড়িতে এত আত্মীয় কুটুম কতদিন আসেনি! সাগর, খুশি, বড় মামার বৌ, ছোট মামা, ন-মামা, রাঙা মামা এবং হামচাদী, গোপালদী থেকেও চলে এল সব আত্মীয় স্বজন। একজন বুড়ো মানুষ বোঝাই যাচ্ছিল সগৌরবে মারা যাচ্ছেন। তাদের থাকবার খাবার এবং শোবার বন্দোবস্ত করতেই মেজমামীর প্রাণান্ত। দাদুর ঘরে আসতেই পারছে না। মেজ-মামীকে নীলের আর এতটুকু খারাপ লাগছিল না। কিছুটা উৎসবের মতই ব্যাপার যেন।

ক'দিন কেবল বাড়িতে দাদুর জীবন গাথা নিয়ে আলোচনা হতে থাকল। এবং সব শুনে মনে হল, মানুষটা সারাজীবন তার দুঃখ কষ্টের ভেতর এই শেষ বয়সে এসে পৌঁছেছেন। কঠিন কঠিন শোক পেয়েছেন। ছোট দাদুর মেয়ে খুব অল্পবয়সে সান্নিপাতিক জ্বরে মারা গেছে। এক ছেলে দু-বছর বয়সে জলে ডুবে মরেছে। এক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে শ্বশুরালয়ে। স্ত্রী, সন্তান হবার সময় মারা যায়। এতগুলো মৃত্যু চোখের ওপর প্রত্যক্ষ করেছেন। অথচ নীল এতদিন একসঙ্গে থেকেও কোনো শোকের কিংবা দুঃখের খবর পায়নি। মানুষটা যত বিছানার সঙ্গে মিলে যেতে থাকল তত নীল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। একজন মানুষের জীবন পৃথিবীতে বুঝি এ-ভাবেই শেষ হয়ে যায়। তার দুঃখ শোক হতাশার খবর কেউ রাখে না।

স্কুল খোলার আগের দিন ছোট দাদু সবাইকে কাছে ডাকলেন। বললেন, আমাকে বসিয়ে দাও।

মা বড় বড় বালিশে হেলান দেবার ব্যবস্থা করে দিল।

মা আসাতক এ-ঘর থেকে বেরই হয়নি। মার মাথায় হাত দিয়ে মাঝে মাঝে দাদু কি সব বিড় বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। মাকে পেয়ে বুড়ো মানুষটা যেন বড় রকমের একটা অবলম্বন পেয়ে গেছিল। মাও ঘর ছেড়ে বের হয় না। মার খাবার এ-ঘরেই চলে আসে। দাদু সবাইকে ডেকে বললেন, খাওয়া নাওয়া সেরে নাও। তোমরা একটু সবাই তাড়াতাড়ি করবে। সময় কিছুতেই আর তিনি দিতে চাইছেন না। দাদুর কথামতো সবাই যে যার খাবার তাড়াতাড়ি দুটো খেয়ে চলে এল। কেবল মা কিছু খেল না। এবং সবাই যখন উপস্থিত, তিনি হাত দুটো বুকের কাছে নিয়ে এলেন। হাঁ করলেন। পাণ্ডুর শীর্ণ মুখে সামান্য চরণামৃত দিতেই চোখ বুজে ফেললেন। ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে আসা হল। এবং একটা সাদা চাদরে সবটা ঢেকে দেওয়া হল।

নীল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করল! আজন্ম এই মানুষটা অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রেখে গেছে তাদের সামনে।

খুব কান্নাকাটি কিছু হল না। পদ্ম কিছুক্ষণ পায়ের কাছে বসে কাঁদল। মা পায়ের কাছেই মাথা রেখে পড়ে থাকল। মামারা পাশের ছাড়াবাড়িতে দাহের ব্যবস্থায় খুবই ব্যস্ত। মানুষজন যে যেখানে ছিল গাঁয়ের চলে এসেছে। শেষ বারের মত গ্রামের বুড়ো ঠাকুরকে দেখতে এসেছে তারা।

এই প্রথম নীল একেবারেই কাঁদতে পারল না।

কেমন একটা শূন্যতা বুকের ওপর ভার হয়ে চেপে বসে থাকল। সে সারাবিকেল মামাদের সঙ্গে কাঠ বয়ে নিল ছাড়াবাড়িতে। আগুন দিল। এক ফোঁটা জল তবু চোখ থেকে পড়ল না।

বারো

বাড়িটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল। আত্মীয় কুটুম সবাই চলে গেছে। মেজমামা ক'দিন থেকে গেল। জমিজমা দেখাশোনার জন্য সুধন্য আবার দেশ থেকে চলে এসেছে। দাদুর ঘরটায় সে আর সুধন্য থাকে। ক'রাত বেশ ভয় ভয় করেছে। মনে হয়েছে দাদু জানালায় এসে দাঁড়াবে। কখনও নিশীথে এসে সহসা তাকে ডাকতেও পারে।

দাদুর চিতায় একটা তুলসী মঞ্চ করা হয়েছে। সন্ধ্যায় সে আর পদ্ম সেখানে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে আসে। নীল প্রণাম করার সময় বলেছে, দাদু আমি ভাল হয়ে থাকব। রাতে বিরোতে ভয় দেখিও না।

পদ্ম বলত, দাদু বাবার মতি গতি ঠিক করে দাও। বাবা বাসা করে ফিরে এসে নিয়ে যাবে বলেছে। রাতে পদ্ম, বাবা মার সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছে একদিন নীলকে বলল।

নীলের টেস্ট পরীক্ষার আগেই ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে গেল। মেজমামা বাবাকেও একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ভাল না। সময় থাকতে একটা কিছু করে ফেলা দরকার। তাতে দেশ ভাগটাগের কথাও লেখা আছে। বাবা নীলকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছে। ঢাকায় বড় রকমের দাঙ্গা লেগেছে। মিলির কাকীমা চলে এসেছে গাঁয়ে। কেমন একটা অরাজকতা সর্বত্র।

মেজমামা আবার ফিরে এসেছিলেন, পুজোর ছুটি শেষ হয় হয় সময়টাতে। এবারে তিনি নীলের জন্য কোনো উড-পেনসিল অথবা হাতিমার্কা কাগজ নিয়ে আসেননি। কেমন খালি হাতে চলে এসেছেন। সুধন্য আর সে নৌকায় আলিপুরা গিয়েছিল। মেজমামা গয়না নৌকায় হাটে শেষ বিকেলে এসে নেমেছেন। হাট থেকে বড় টাটকা মাছ কিনলেন। জলকচু চারটা। করলা ঝিঙে ঝুড়ি বোঝাই তোলা হল নৌকায়। দুটো বড়ো হলুদ রঙের আখ কিনে নিলেন। তারপর নৌকায় বসে আখ দিলেন নীলকে। বললেন, খা।

কেমন ছেলেমানুষের মত দাঁত দিয়ে মেজমামা আখ ছাড়াচ্ছিলেন। এদেশ ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে ভেবেই শৈশবের মত শেষবার বুঝি প্রকৃতির ভেতর পড়ে বালক হয়ে গেছেন। নীলের দাঁত খুব ভাল না। আখ ছিঁড়তে গিয়ে দাঁত দিয়ে রক্ত বের হতে থাকল। মেজমামা বললেন, কিরে আখ খেতে শিখিসনি। তারপর আখ ধরার এবং কামড় দেবার কায়দা থেকে ছিঁড়ে ফেলা পর্যন্ত সবটাই দেখিয়ে বললেন, খাতো দেখি, পারিস কি না?

নীল মেজমামার মত কায়দা করে আখে কামড় বসাল!

—ওঁহো হচ্ছে না। বলে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। গিটে কামড় দিচ্ছিস কেন! একটু উপড়ে দে। টান! এইতো। দেখলি কত সহজ। মুখটা রসে ভরে গিয়েছিল নীলের। মেজমামা তখন সুধন্যর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। সুধন্য লগি মেরে নৌকা এগিয়ে নিচ্ছে। পাড়ার কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বলছেন, আরে মজিদ ভাই না। ও ইদ্রিশ তোমার বাজানের খবর কি!

ওরা সবাই খুবই মান্য করে কথা বলছিল মেজমামাকে। কলকাতায় থাকলেই মানুষ এদেশে মান্যগণ্য হয়ে যায়। তা ছাড়া ঠাকুরবাড়ির মেজকর্তা। সুতরাং সবাই যে যার মত বলল, আছেনতো ক' দিন।

—না, নেই। বেশিদিন নেই।

পরদিন সকালবেলা নীল দেখল পদ্ম আর পড়তে বসেনি তক্তপোশে। কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টেস্ট পরীক্ষা কাছে অথচ মেজমামার কত কাজ এবারে। সুধন্য একা পেরে উঠছে না। একে ওকে ডেকে আনা হচ্ছে। কবিরাজ মামা এসে সকালে খানিকক্ষণ গল্প করে গেল। খুবই চিন্তান্বিত মনে হচ্ছে সবাইকে। কোথায় কীভাবে শেষপর্যন্ত সব সামলানো যাবে

বোঝা যাচ্ছে না। যদি সত্যি শেষপর্যন্ত গান্ধীজী মেনে নেন। একমাত্র তিনি দেশভাগের বিরুদ্ধে আছেন। কিন্তু এক এক করে যে-ভাবে দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়ছে তাতে করে কলকাতাও খুব একটা নিরাপদ জায়গা বলে মনে হচ্ছে না। তবু মানে মানে সরে পড়াই ভাল। কবিরাজ মামা বলে গেল, দেখবেনতো ওদিকে কিছু জমিজমা সহ বাড়ি টাড়ি পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু খুলে বললেও মনে মনে বেশ দোটানায় পড়ে গেছে মানুষটা, নীল কবিরাজমামাকে দেখেই এটা বুঝতে পারল।

নীল বড় মিঞা আবদুল রউফকে ডাকতে গিয়েছিল সনকান্দায়। রউফ এসে পড়লে বাইরের উঠোনে বসতে দেওয়া হল। মেজমামা তখন স্নান করতে যাবেন। রউফকে দেখেই বলল, তা বড় মিঞা আমিতো ছেলেপুলে নিয়ে চলে যাচ্ছি কলকাতায়। ভাগের জমি আর রাখব না। বিক্রিবাট্টার ব্যবস্থা দেখ।

—সবাই চলে যাচ্ছেন!

—সবাই যাচ্ছে না। মা আর ফুলু থাকছে। সুধন্য আছে। নীলের পরীক্ষা হয়ে গেলেই বাড়ি চলে যাবে। তারপর আবার ফিরে এসে কি করা যায় দেখব। টাকার খুব দরকার।

নীল তার ঘরে বসে সবই শুনতে পাচ্ছিল। ছোট দাদু কত কষ্ট করে এই বাড়িটা ফলে ফুলে ভরে রেখে গেছেন। কেমন শনির কোপে পড়ে গেছে মত বাড়িটা। ছোট দাদু নেই, ফাঁকা ফাঁকা, যদি সত্যি পদ্ম চলে যায় তবে তার কি হবে! বুকে কেমন একটা ব্যথা গুড় গুড় করে বাজছে। পদ্মর মুখোমুখি হতেও ভয় পাচ্ছে। কাল বিকেল থেকেই পদ্মকে আর তেমন দেখা যাচ্ছে না। ঘরের ভেতর খুট খাট এত কি যে করছে! পদ্ম কি তার সঙ্গে আর একটা কথাও বলবে না। কেবল মেজমামী এ-বাড়িতে এখন সবচেয়ে ভাল মানুষ হয়ে গেছে।

মেজমামার জন্য দুধের পায়েশ হয়েছে। পুলিপিঠা হয়েছে। সবার হাতে দেবার সময় মেজ-মামী নীলকেও ডেকে দিয়েছে। মেজমামী কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছে। আলতা পরেছে পায়ে। বিকেলেই মেজমামী কাচা শাড়ি পরেছে। মুখে গোপনে বোধ হয় পাউডারও মেখেছিল। কেমন একটা সুন্দর গন্ধ মেজমামীর গায়। এবং দিদিমা খুব যেন ভরসা পাচ্ছে না। বার বারই বলছে, তুই কবে আবার আসবি নবীন। ওদের সঙ্গে ফুলুটাকেও নিয়ে যা। আমার কপালে যা আছে হবে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ফুলুমাসিও সঙ্গে যাবে।

সাঁঝ লেগে যাচ্ছিল। নীল আর সুধন্য মিলে শুকনো কাঠ ঘরে তুলছে। মানুদা গেছে হাটে। দেশের যা কিছু ভাল, কলকাতায় যা পাওয়া যায় না, মানুদা বেছে বেছে সে-সব নিয়ে আসছে। যেমন আজ সকালে কাচ্কি মাছ এনেছে পুবপাড়ার বাজার থেকে। মেজমামা আগের মত আর মানুদার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছেন না। বরং দুটো একটা ব্যাপারে পরামর্শ চাইছেন। ছেলেটার পড়াশোনা হল না

শেষ পর্যন্ত। মেজমামা বললেন, আমাদের কোম্পানির বড়বাবুকে বলে রেখেছি। বার্ডস কোম্পানিতে তোকে বলেছে ঢুকিয়ে দেবে। মাইনে পত্র ভালই। তেতাল্লিশ টাকা দশ আনা। কম না টাকাটা।

নীলের খুব শ্রদ্ধা বেড়ে গেল মানুষটার ওপর। সে বলল, মানুদা চাকরি হলে আমাকে একটা কিন্তু কলম কিনে দেবে।

বিশ্বাসী মানুষ এই নীলটা। তাকে সে যেন এখন সব কিছুই দিতে পারে। কলকাতার ছেলে আবার কলকাতায় চলে যাচ্ছে কত বড় কথা! মানুদার সঙ্গে সে এখন আরও বেশি সমীহ করে কথা বলছে। ডলিদি এলে বলে দেবে, মানুদা আর তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মত মানুষ না। মাইনে তেতাল্লিশ টাকা দশআনা। তবু থেকে থেকে কেমন একটা আশংকা, পদ্ম চলে যাবে, চলে গেলে এই বাড়িটাতে সে থাকবে কি করে! তার তো কেউ থাকবে না। ছোট দাদু না, পদ্ম না, তার ভেতরটা মাঝে মাঝে বড় আঁকু পাঁকু করছে। সে তখনই দেখল পদ্ম রান্নাঘরে যাচ্ছে বড় একটা থালা গ্লাস নিয়ে। মেজমামী ডাকছে, পদ্মরে মা আয়। বেসনটা ফেটে দে মা। তোর পিসিকে বল, সুধন্যকে দিয়ে কেরোসিন তেল নিয়ে আসতে। ঘরে আলো জ্বেলে দিতে বল। অন্ধকারে ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

কেবল কী খেতে ভালবাসে মানুষটা এই নিয়ে দিদিমা আর মেজমামীর ভেতর প্রতিযোগিতা চলছে। দিদিমা বলল, নবীন আমার সিমের বিচি দিয়ে শুকতোনি খেতে ভালবাসে, বাড়িতে সিমের বিচি নেই, ফুলু মাসিকে পাঠিয়ে পালের মার কাছ থেকে একমুঠো সিমের বিচি চেয়ে এনেছে। নবীন আমার চিড়ের মুড়িঘণ্ট খেতে ভালবাসে। দারচিনি এলাচ ছিল না, টোফা থেকে পয়সা বের করে দিয়ে বলছে, যাতো নীল, সরকারের দোকান থেকে গরম মশলা নিয়ে আয়। নবীন আমার খেতে ভালবাসে বকফুলের বড়া। এক একদিন এক একরকম ভাবে সব এখন আমিষ নিরামিষে পাল্লা চলেছে। নবীন আর একটু দেব। নবীন যদি বলে, না, তখন মনটা কেমন দমে যায় দিদিমার। মামা অগত্যা বলেন তখন, দাও একটু। খুব সুন্দর হয়েছে খেতে। তুমি মাছ খেলে না! নীলের মনে হচ্ছিল মেজমামা বড়ই বিপাকে পড়ে গেছেন খেতে বসে। শাশুড়ি বউতে বড্ড বেশি মারামারি কাটাকাটি চলছে। মেজমামা মাঝে মাঝে নীলের পাতে, মানু এবং পদ্মর পাতে তুলে দিচ্ছে। এবং নীল বুঝতে পারছে মামার এখন সেই সব চেয়ে উপকারী মানুষ। পরদিন সকালে কৃতজ্ঞতা স্বীকার হেতু আস্ত একটা রুপোর টাকা দিয়ে বলেছেন, তোর খুশি মত খরচ করবি নীল।

মেজমামা টাকাটা দিয়েই বের হয়ে গেলেন। বাড়ি এলে গাঁয়ের সবার সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখা করেন। কথা বলেন গল্প করেন। কলকাতার গল্প গ্রামদেশের মানুষেরা শুনতে বড় ভালবাসে। নীল ইতিহাস পড়ছিল। পদ্ম আজও পড়তে বসেনি। মেজমামী পদ্ম পড়ছে না বলে কোনো অশান্তি করছে না। পদ্ম যে কি

করছে! পদ্মকে সে একবার হাসতেও দেখেনি। মেজমামা একবার বলেছিল, কিরে পদ্ম কি হয়েছে! কেউ তোকে বকেছে!

পদ্ম মেজমামার পাশ থেকে ইচ্ছে করেই চলে গেছিল। মিলি গতকাল বিকালে এসেছিল। ওরা দুজনে কুয়োতলায় কত কথা বলেছে! মিলিই বেশি বলেছে মনে হয়। কারণ সে মিলিকে খুব হাসতে দেখেছিল। যাবার সময় মিলি একবার সতর্ক চোখে কি দেখে গেল! পদ্ম অন্যদিন মিলিকে পুকুরপাড় এগিয়ে দিয়ে আসে। গতকাল সে মিলির সঙ্গে পেয়ারা গাছটা পর্যন্তও যায়নি। কুয়োতলায় সেই থেকে দাঁড়িয়েছিল। জলে সারাক্ষণ মুখ দেখেছে। সে যে এতবার পাশ কাটিয়ে গেল পদ্ম বলল না, নীলদা তোমার খারাপ লাগছে না! আমি চলে গেলে তুমি কষ্ট পাবে না।

নীলের মনে হয়েছিল, কলকাতা এতবড় শহর, সেখানে সামান্য নীলের অভাব যেতে না যেতেই মুছে যাবে মন থেকে।

গোপন অপমানে, সেও কিছু তাকে বলতে পারেনি। গোপন অভিমান, না প্রকৃতির কূট খেলা কে জানে!

সন্ধ্যায় ছোটদাদুর শ্মশানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ছম ছম করে। পদ্ম আগে যাচ্ছে। পেছনে নীল। চারপাশে সব গাছ, গাছের নিচে সরু পথ। মাথা নুয়ে এখানটায় ঢুকতে হয়। ভেতরে ঢুকে গেলে ছাড়াবাড়িটা বেশ গোপন একটা জায়গার মত। মেজমামা আসার পর সে এখানটায় পদ্মর সঙ্গে একদিনও আসতে পারেনি। কখনও ফুলু মাসি, কখনও সুধন্যদা অথবা দিদিমা নিজেই থেকেছেন। আজ সবাই কিছু না কিছু করছে। সুধন্যদা বাড়ি নেই। মেজমামার সঙ্গে গোপের বাগ গেছে। দিদিমা নাড়ু বানাচ্ছে ফুলু মাসিকে নিয়ে। এবং পদ্মই একমাত্র আছে, তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেজমামী সদয় হয়ে গেছিলেন। একা ছাড়াবাড়িতে তুলসিমঞ্চের নিচে যাওয়া সন্ধ্যায় খুব সমীচীন না। পদ্মকে বলেছিল, যা মা পদ্ম, নীলের সঙ্গে যা। এবং পদ্ম কিছুটা পেছনে পেছনে এসেছে। দত্তদের বাড়ি পার হয়ে রাস্তা নিচে নেমে গেছে। মিলিদের অর্জুন গাছটা পর্যন্ত যেতে হয় না তার আগেই ছাড়াবাড়ি। যাবার সময় দেখেছে, অর্জুন গাছের নিচে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকলেও কখনও কখনও খুব ভুতুড়ে মনে হয়ে যেতে পারে। আসল না নকল কে জানে। ছোট দাদুর মৃত্যুর পর এই শ্মশানে যখনই এসেছে, কাকপক্ষি কুকুর বেড়াল দেখলে কেমন গুটিয়ে গেছে নীল। আসল কাক না নকল কাক। সঙ্গে কেউ থাকলেও মনে হয়েছে, দাদুরই আত্মা কাক বেড়াল সেজে এসেছে। সে কখনও মনে করতে পারে না, এরা সত্যিকারের কাকপক্ষি। এমন কী প্রথম প্রথম পদ্মকেও নকল পদ্ম ভেবে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রদীপ দিয়ে বাড়ির দিকে ছুটেছে।

আজ কিন্তু অন্যরকম। ভয় ডর কম। পদ্ম, মেজমামা বাড়ি আসার পর

রোজই শাড়ি পরছে। এবং পদ্ম বোধ হয় আর ফ্রক পরবে না। পদ্ম শাড়ি পরলে খুব বড় হয়ে যায়। খুব একটা সাহস থাকে না বুকে। সে পদ্মর দিকে তাকিয়ে ভালভাবে তখন কথা বলতেও পারে না। শাড়িটা কেমন দুজনের ভেতর একটা বড় হওয়ার কথা বলে দিচ্ছে। মেজমামা আসার পর পদ্মর এই শাড়ি পরাই বোধ হয় যত অনিষ্টের কারণ। সে. পদ্মর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল বুঝি।

পদ্ম কতদিন পরে ডাকল, নীলদা।

নীল হাঁটতে হাঁটতে বলল. দেশালাই এনেছিসতো!

—এনেছি।

সামান্য জ্যোৎস্না উঠল। বড় তেঁতুল গাছটায় ডাল এখনও পোড়া পোড়া। চিতার আগুন অনেকটা ওপরে উঠে ডালপালা পুড়িয়ে দিয়েছে।

এই পোড়াভাবটুকু চিতায় একজন মানুষের ছাই হয়ে যাওয়ার এখনও সাক্ষী। নীল রোজ এসে একবার ওদিকটায় তাকাবেই। কতবার ভেবেছে তাকাবে না, কতবার ভেবেছে, চোখ বুজে চলে আসবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি যে হয়, কেমন একটা খারাপ ধরনের ইচ্ছে, সে না তাকিয়ে পারে না। আজ এখানে এসে ওটার কথাও ভুলে গেল। ইঁটের চাতাল। ওপরে তুলসী মঞ্চ। সামান্য তেল ঢেলে দেওয়া হল। সলতে তেলে ভিজিয়ে ভারী রহস্যময়ী নারীর মত পদ্ম দেশলাই জ্বেলে দিল। কিন্তু বাতাসে নিভে যাচ্ছে বার বার নীল পাজামা গুটিয়ে নিল। দেশালাইর ওপর দু-হাতে আড়াল দিল। পদ্ম, মামীমার মত আজ আলতা পরেছে দেখতে পেল। আলোতে রাঙা পা, সুন্দর বড় বেশি প্রতিমার মত পা, সে দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে গেল। হাতের ওপরই দেশালাইর কাঠি জ্বলছে।

পদ্মই যেন মনে করিয়ে দিল, হাতটা পুড়ছে।

নীল কাঠিটা ফেলে দিল।

তারপর পদ্ম বলল. আমাকে দাও।

নীল বলল, তুই পারবি না। তিনবারের বার সে সলতেটা ধরাতে পারল।

পদ্ম ঝুঁকে সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিল। কিন্তু নীল বুঝতে পারছে না, পদ্ম মুখ এত নীচু করে রেখেছে কেন!

নীল বলল. পদ্ম ওঠ। যাব।

পদ্ম তবু মাথা তুলছে না।

নীল চিৎকার করে উঠল, পদ্ম আগুন ধরে যাবে! কি করছিস! তুই পুড়ে মরবি।

পদ্ম বলল, পুড়ে মরলে কি হয় নীলদা!

নীল আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়ে গেল। —তুই ছেলেমানুষী করিস না পদ্ম। ওঠ বলছি। এ-ভাবে ঝুঁকে আছিস কেন। পদ্ম শাড়িতে আগুন ধরে যাবে।

পদ্ম বলল, বল আমার কথা রাখবে!

—রাখব পদ্ম, তবু তুই উঠে দাঁড়া।

—বল, তুমি আর কখনও মিলির সঙ্গে কথা বলবে না।

—না, বলব না।

—আগুন ছুঁয়ে বল।

নীল বলল, আগুন ছুঁয়ে বলছি।

—সবটা বল।

—আগুন ছুঁয়ে বলছি, মিলির সঙ্গে কথা বলব না।

—জীবনেও বলবে না।

—জীবনেও বলব না।

তবু পদ্ম কেমন বিশ্বাস করতে পারছে না। নীলদা যা একখানা মানুষ। এবং মিলিকে একটা ডাইনি ছাড়া সে কিছুই আর ভাবতে পারছে না। পদ্ম বলল, নীলদা যদি শুনি কিছু করেছ, আমি ঠিক আগুনে পুড়ে মরব একদিন দেখবে।

নীল বুঝে পায় না মেয়েটাকে। সেই কবে থেকে পদ্ম যেন সংসার থেকে মা বাবার কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। যেন বলছে, আমিই সব। পিসেমসাই, পিসিমা কেউ না। এবং ছোট দাদু মরে গিয়েও তেমন কিছু ক্ষতিকর হয়নি, কিন্তু পদ্ম চলে গেলে, এই গাছপালা, বাড়িঘর, বেঁচে থাকা সবই ভারি অর্থহীন মনে হবে। ফাঁকা, মনে হবে পৃথিবীটা তার। পদ্ম, একজন পদ্ম তার জগত এত ধরে রেখেছিল, এই প্রথম টের পেল।

পদ্ম তখন উবু হয়ে কাঁদছে।

এবং এক সন্ধ্যায় নীল আর সুধন্যদা নৌকায় করে পদ্মকে দামোদরদির স্টিমারস্টেশনে রেখে আসতে গেল। নৌকায় লটবহর চাকি বেলুন থেকে আরম্ভ করে থালাবাসন, যা কিছু ছিল সংসারে প্রায় সব উজাড় করে মেজমামী নিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে পদ্মকেও নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সে স্টিমার ঘাটে বসেছিল। দূরে নদীর জল। মেজমামা মাঝে মাঝে ডেকে কথা বলছেন। মেজমামী তাকে বলেছে এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম মেজমামী বলছে, ভাল করে লেখাপড়া করিস। ভাল পাস করতে হবে। তোর বাপের নাম রাখিস।

শুনতে শুনতে নীলের চোখ সজল হয়ে উঠেছিল। পদ্ম বলল শুধু, বড় হলে কলকাতায় এস।

তারপর কী একটা ধনদের ভেতর পড়ে গেছিল নীল। কখন সাদা একটা স্টিমার এসে পদ্মকে সুদূরে তুলে নিয়ে গেল! যতদূর চোখ যায়, যতক্ষণ আলো দেখা যায় দূরে, নীল স্টিমার ঘাটে বসেছিল চুপচাপ। একসময় সুধন্য বলেছিল, চলেন নীল কর্তা। স্টিমার আর দেখা যাচ্ছে না। চলেন।

●